৪

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

[চতুর্থ খণ্ড]

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭১৬৬৭১৪২৪
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : bic@accesstel.net

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৮
চতুর্থ প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৮

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত সত্তর টাকা মাত্র

Ashabe Rasuler Jiban Katha (Vol. IV) Written by Dr Muhammad Abdul Mabud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition March 1998 Fourth Edition April 2008 Price Taka 170.00 only.

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা' (৪র্থ খণ্ড) প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বে যখন আমরা এই বিশাল কাজে হাত দিয়েছিলাম তখন এতদূর এগুতে পারবো এমন আশা ছিল না। আমার মত একজন অলস মানুষের জন্য কাজটি যে ভীষণ কঠিন তা আমি পরে উপলব্ধি করেছি। আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং বন্ধু-বান্ধব ও পাঠকবর্গের উৎসাহ আমাকে এ কাজ এগিয়ে নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। আর বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমাদ-এর পরামর্শ ও সহযোগিতা না পেলে অনেক আগেই এ কাজ বন্ধ হয়ে যেত। এ কাজে যাঁরা যেভাবে সাহায্য করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁদের সকলকে প্রতিদান দিন, এই কামনা করি।

চতুর্থ খণ্ডে যে সকল মহান সাহাবীর জীবনের আলোচনা এসেছে তাঁরা সকলেই মদীনার আনসার সম্প্রদায়ের। তথ্যসমূহ যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ থেকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। সূত্রের নামও উল্লেখ করেছি। সাহাবায়ে কিরামের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে শব্দ ব্যবহারের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্বেও কোথাও যদি কোন প্রকার তথ্য ও ভাষাগত অসংগতি পাঠকবর্গের নিকট ধরা পড়ে তাহলে তা আমাকে জানালে সংশোধনের চেষ্টা করবো। বাংলার ঘরে ঘরে সাহাবায়ে কিরামের বিশ্বাস ও কর্মের ছাপ পড়বে—এই আশা নিয়ে আমরা আমাদের কাজ করে যাব। আল্লাহ পাক আমার এই সামান্য শ্রম কবুল করুন! আমীন ॥

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

১ জানুয়ারী ১৯৯৮
১ রমজান ১৪১৮

সূচীপত্র

আনাস ইবন নাদার (রা)

নাম 'আনাস', পিতা 'নাদর ইবন দামদাম'। রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের সম্মানিত চাচা।[১] হযরত আনাস ইবনে মালিক বলতেন ঃ 'আমার চাচা আনাসের নামে আমার নাম রাখা হয়েছে।'[২] রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতু 'আমর ছিলেন এই আনাসের খান্দান বনু নাজ্জারের মেয়ে। সম্পর্কে তিনি আনাস ইবন নাদরের ফুফু। আনাস ইবন নাদর ছিলেন তাঁর খান্দানের রয়িস বা নেতা। মহিলা সাহাবী হযরত রুবাইয়্যা' বিনতু নাদর ছিলেন তাঁর বোন। তাঁদের মাও ছিলেন একজন সাহাবিয়্যা।[৩] তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

হযরত আনাস ইবন নাদর (রা) শেষ 'আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন ঃ কোন অজ্ঞাত কারণে আমার চাচা আনাস ইবন নাদর বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ফিরে এলে তিনি তাঁর সামনে হাজির হয়ে অনুতাপের সুরে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৌত্তলিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত আপনার প্রথম অভিযানে আমি অনুপস্থিত থেকে গেছি। আল্লাহর কসম, আগামীতে আল্লাহ যদি আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন সুযোগ দান করেন তাহলে আমি কি করি তা অবশ্যই আল্লাহ দেখাবেন।

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী তৃতীয় সনে। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে ময়দান ত্যাগ করছিল তখন তিনি আপন মনে বলে উঠলেন ঃ 'হে আল্লাহ! এই মুসলমানরা যা করছে তার জন্য আমি আপনার নিকট মাগফিরাত কামনা করছি। আর এই পৌত্তলিকরা যা করেছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' এই বলে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। পথে সা'দ ইবন মু'য়াজের (রা) সাথে দেখা। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আনাস কোথায় যাচ্ছো?

আনাস ঃ সা'দ জান্নাত তো ঐখানে-উহুদে। আল্লাহর কসম! আমি উহুদের দিক থেকে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি।

একথা বলতে বলতে আনাস (রা) উহুদের ময়দানের দিকে ছুটে যান এবং অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। সা'দ বলেন ঃ সেদিন তিনি যা করলেন, আমি তা করতে পারিনি। বালাজুরী বলেন ঃ সুফইয়ান ইবন 'উয়াইফ তাঁকে হত্যা করে।[৪]

উহুদ যুদ্ধে হযরত আনাসের (রা) ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবন ইসহাক বলেন ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব ও তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহ মুহাজির ও আনসারদের সাথে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। আনাস সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আপনারা এভাবে বসে কেন?

তারা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হয়েছেন।

আনাস বললেন ঃ তিনি যদি মারাই গিয়ে থাকেন, আপনারা বেঁচে থেকে কী করবেন? উঠুন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে পথে জীবন দিয়েছেন আপনারাও সে পথে জীবন দিন। একথা

বলে তিনি শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাত বরণ করেন।[৫]

হযরত আনাস ইবন মালিক বলেছেন ঃ তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাতে আনাস ইবন নাদরের সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। গুণে দেখা যায় তাঁর দেহে সত্তর মতান্তরে আশিটির অধিক আঘাত করা হয়েছে। কাফিরেরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর বোন রুবাইয়্যা বিনতু নাদর ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। তিনিও তা করতে সক্ষম হন তাঁর হাতের আঙ্গুল দেখে।[৬]

হযরত আনাস ইবন নাদরের (রা) ঈমান যে কত মজবুত ছিল তা তাঁর শাহাদাতের ঘটনা থেকে বুঝা যায়। উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে তাঁর মত মহান ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করা হয়েছে। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন ঃ সূরা আল আহযাবের ২৩ নম্বর আয়াত– 'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে'– আমার চাচা আনাস ইবন নাদরের শানে নাযিল হয়েছে।[৭]

সহীহ বুখারীতে আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। রুবাইয়্যা বিনতু নাদর একবার এক আনসারী মহিলার মুখে চপেটাঘাত করে বসেন। তাতে তার একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। রুবাইয়্যার পক্ষ থেকে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়; কিন্তু তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করে। তাদেরকে দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তারা তাও প্রত্যাখ্যান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এখন কিসাস বা বদলা অপরিহার্য'। একথা শুনে আনাস ইবন নাদর বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রুবাইয়্যার দাঁত ভাঙ্গা হবে? যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার নামে শপথ! না, না কক্ষণো তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।

এরপর আকস্মিকভাবে বাদী পক্ষ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহর এমন অনেক বান্দা আছে যারা তাঁর নামে কসম খেলে তিনি নিজেই তাদের কসম পূরণ করে দেন। তাদেরই একজন আনাস ইবন নাদর। সহীহ মুসলিমেও ঘটনাটি ভিন্ন সনদে ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৮]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আনসাবুল আশরাফ–১/৩৩৩
২. হায়াতুস সাহাবা– ১/৫০২
৩. আল-ইসাবা– ৪/৩১০
৪. দ্রঃ উসুদুল গাবা–১/১৩২; আনসাবুল আশরাফ–১/৩৩; আল ইসাবা–১/৭৪; আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা–১/৭০
৫. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৮৪; ১২৪; ১২৫; হায়াতুস সাহাবা–১/৫১৬; আল বিদায়া–৪/৩৪;
৬. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৮৩; উসুদুল গাবা–১/৫০৪; আল-ইসতী'য়াব–১/৭১;
৭. উসুদুল গাবা–১/১৩২; হায়াতুস সাহাবা–১/৫০৪; আল-ইসতীয়াব–১/৭০
৮. আল-ইসাবা–৪/৩০১; উসুদুল গাবা–১/১৩২।

আল–বারা' ইবন মালিক (রা)

আল-বারা' ইবন মালিক ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহের খাদেম হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) বৈমাত্রেয় ভাই। একথা বলেছেন আবু হাতেম। সা'দের মতে তিনি আনাসের সহোদর। তাঁদের উভয়ের মা প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা হযরত উম্মু সুলাইম।[১] ইবনুল আছীরের মতও তাই।[২] তবে ইবন হাজার এমত সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, শুরাইক ইবন সামহার জীবনীতে দেখা যায়, তিনি আল–বারা' ইবন মালিকের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের উভয়ের মা সামহা। পক্ষান্তরে আনাস ইবন মালিকের মা যে উম্মু সুলাইম, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।[৩] এছাড়া উম্মু সুলাইমের সন্তানদের যে পরিচয় বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় তার মধ্যে আল-বারা'র নামটি কোথাও নেই।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বেই মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে যায়। দলে দলে লোক মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার অনেকে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ দূত হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের (রা) দা'ওয়াতে মুসলমান হন। মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের এধারা রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পরও অব্যাহত থাকে। হযরত বারা' এর কোন এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া উহুদ, খন্দকসহ বাকী সকল অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।[৪] হুদায়বিয়ার 'বায়'য়াতে রিদওয়ানে'ও তিনি শরীক ছিলেন।[৫]

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে গোটা আরবে ভণ্ড নবীদের উৎপাত শুরু হয়। এসময় ভণ্ডনবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় তাতে আল-বারা' বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ ছিলেন সেনাপতি। এক পর্যায়ে তিনি সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'আপনি উঠে আদেশ করুন।' তারপর নিজে ঘোড়ার ওপর সাওয়ার হয়ে আল্লাহর কিছু গুণগান পাঠ করে মুসলিম বাহিনীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'ওহে মদীনার অধিবাসীগণ! আজ তোমরা অন্তর থেকে মদীনার চিন্তা মুছে ফেল। আজ তোমাদের অন্তরে শুধু আল্লাহ ও জান্নাতের স্মরণ বিদ্যমান থাকাই বাঞ্ছনীয়।'[৬] তাঁর এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পর গোটা বাহিনীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার আসে। সৈন্যরা নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করে তাঁর সাথে এসে যোগ দেয়।

এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এক নেতার সাথে হযরত বারা'র হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। লোকটি ছিল তাগড়া জোয়ান। বারা' প্রথমে তার পা লক্ষ্য করে তরবারির এক আঘাত হানেন। আঘাতটি লক্ষ্যভেদী ছিল না। তবুও লোকটি ভয়ে গড়াগড়ি যেতে থাকে। এই সুযোগে হযরত বারা' মুহূর্তের মধ্যে নিজের তরবারি কোষবদ্ধ করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন

এবং তার তরবারিটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে এমন একটি ঘা বসিয়ে দেন যে তার দেহটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।[৭]

তারপর বিদ্যুৎ গতিতে ধর্মত্যাগীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। বাগানের মধ্যে মুসায়লামা অবস্থান করছিল। মুসায়লামার অনুসারী সৈন্যরা উদ্যানে ঢুকে পড়ে এবং তার পাশে সমবেত হয়ে উদ্যানের ফটক বন্ধ করে দেয়। বারা' ইবন মালিক তাদের পিছু ধাওয়া করে প্রাচীরের নিকট পৌঁছে রুদ্ধ ফটকের সামনে থমকে দাঁড়ান। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সিংহের মত গর্জে ওঠেন এবং হুংকার ছেড়ে বলেন ঃ 'ওহে জনমণ্ডলী! আমি বারা' ইবন মালিক। তোমরা আমার দিকে এসো, তোমরা আমার দিকে এসো।' সহযোদ্ধারা এগিয়ে এলে তিনি তাদের আরো বলেন ঃ 'ওহে মুসলিম জনমণ্ডলী! তোমরা আমাকে উদ্যানের অভ্যন্তরে তাদের মাঝে ছুড়ে মার।' লোকেরা বললো ঃ 'না, তা কেমন করে হয়।' তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই আমাকে তাদের নিকট ছুড়ে মারবে।' অতঃপর তাঁকে উঁচু করে তুলে ধরা হয়। তিনি প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফটকের মুখেই প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং তিনি বাইরে অপেক্ষমান মুসলিম সৈন্যদের জন্য দরজা খুলে দেন। বিদ্যুৎবেগে মুসলিম সৈন্যরা একযোগে ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহত হয়। অভিশপ্ত মুসায়লামা এখানে নিহত হয় এবং তার বাহিনী পরাজয়বরণ করে।[৮]

এই ইয়ামামার উদ্যান-ফটকে হযরত বারা' ইবন মালিকের সাথে অন্য যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে হযরত 'আব্বাদ ইবন বিশ্‌র শাহাদাত বরণ করে।[৯] আর এখানেই হযরত বারা' একাই দশজন প্রতিপক্ষ সৈনিককে হত্যা করেন।[১০]

এই দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁর সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তীর, বর্শা ও বল্লমের আশিটিরও বেশী আঘাত লাগে। বাহনের পিঠে উঠিয়ে তাঁকে শিবিরে আনা হয় এবং মাসাধিককাল চিকিৎসার পর আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ নিজ হাতে তাঁর ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ লাগান এবং সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা করান।[১১]

হিজরী ১৭ সনে খলীফা হযরত 'উমার (রা) বসরার ওয়ালী হযরত মুগীরা ইবন শু'বাকে (রা) অপসরণ করে সেখানে হযরত আবু মূসা আল আশয়ারীকে (রা) নিয়োগ করেন। মদীনা থেকে যাত্রাকালে আবু মূসা যে ২৯ ব্যক্তিকে সংগে করে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে আল-বারা' ইবন মালিক একজন।[১২]

হযরত আল-বারা' ইবন মালিক 'ইরাকের হীরক' যুদ্ধেও দারুণ সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দেন। নগরের একটি দুর্গ মুসলিম বাহিনী অবরোধ করে রেখেছে। শত্রু বাহিনী ভিতর থেকে আগুনে পোড়ানো প্রচণ্ড গরম কাঁটাওয়ালা শিকল দুর্গ প্রাচীরের ওপর বিছিয়ে রেখেছে যাতে কোন মুসলিম সৈনিক প্রাচীরের কাছেই ঘেঁষতে সাহস না পায়। হযরত আনাস (রা) প্রাচীর টপকানোর জন্য সাহস করে অগ্রসর হলেন। দুর্গবাসীরা কৌশলে

তাঁকে শিকলে জড়িয়ে ওপরের দিকে টেনে তুলতে থাকে। শিকল উপরে উঠছে, এমন সময় হযরত আল-বারা তা দেখে ফেলেন। ত্বরিৎ গতিতে তিনি ছুটে গিয়ে শিকল ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মারেন যে তা ছিঁড়ে আনাস (রা) সহ নীচে পড়ে যায়। শিকল ধরে টানার কারণে তাঁর হাতের মাংস উঠে গিয়ে হাঁড় বেরিয়ে যায়। তবে হযরত আনাস (রা) বেঁচে যান।[১৩]

হিজরী ১৭ থেকে ২০ সনে পারস্যের রামহুরমুয, তুসতার ও সোস বিজিত হয়। পারস্য বাহিনী যখন রামহুরমুযে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আবার সম্মিলিত হয় তখন রণক্ষেত্র থেকে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সা'দ ইবন 'উবাদাকে লেখা হলো প্রচুর সৈন্য পাঠান এবং তাদের মধ্যে যেন সাহল ইবন 'আদী, আল-বারা' ইবন মালিক, মাজ'যা ইবন সাওর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ থাকেন।[১৪]

পারস্যের 'তুসতার' অভিযানে তিনি হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারীর (রা) বাহিনীর দক্ষিণভাগের অধিনায়ক ছিলেন।[১৫] এই যুদ্ধে তিনি একাই এক শো সৈন্য নিধন করেন।[১৬]

'তুসতারে' যুদ্ধ চলছে। শত্রু বাহিনী সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়েছে। এলোপাথাড়ি হামলা চালিয়ে তারা মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করছে। ইবনুল আছীর বলেন, এ সময় তারা মুসলিম বাহিনীর ওপর ৮০টি হামলা চালায়।[১৭] এমন অবস্থায় একদিন হযরত আনাস (রা) তাঁর কাছে যেয়ে শোনেন, তিনি সুর করে একটি কবিতা আবৃত্তি করছেন। আনাস (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস আল-কুরআন দান করেছেন। তাই সুর করে পাঠ করুন। আল-বারা' বললেন, সম্ভবত ঃ আপনার আশঙ্কা হচ্ছে, না জানি আমি কখন মারা যাই। আল্লাহর কাছে আমার কামনা, তিনি যেন এমনটি না করেন। মরলে আমি ময়দানেই মরবো।[১৮] হযরত রাসূলে কারীম (সা) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বিক্ষিপ্ত ও ধুলিমলিন কেশ বিশিষ্ট এমন অনেক ব্যক্তি, মানুষ হিসেবে যাদের কোন গুরুত্ব নেই; কিন্তু তাঁরা আল্লাহর নামে কসম খায়, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। আল-বারা' ইবন মালিক তাদের অন্যতম।' তুস্তারে যখন মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীর দুর্গের পতন ঘটাতে অক্ষম হয়ে পঁড়ে তখন তাঁদের হযরত রাসূলে কারীমের (সা) উপরোক্ত বাণী স্মরণ হয়। তাঁরা হযরত আল-বারা'র (রা) নিকট এসে আবদার করেন, আপনি আল্লাহর নামে একটু কসম খান। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনার নামে কসম খেয়ে বলছি, আজ আপনি মুসলমানদের একটু বিজয় দান করুন এবং আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন দান করে সম্মানিত করুন।[১৯]

এ সময় মুসলিম সৈন্যরা দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশের একটি সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান পায়। হযরত আল-বারা' হযরত মাজযা'কে (রা) সংগে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সুড়ঙ্গ থেকে বের হতেই হযরত মাজযা' শত্রুদের নিক্ষিপ্ত একটি বড় পাথরে শাহাদাত বরণ করেন।[২০] হযরত আল-বারা'ও মুরযাবান আযা'রা নামক এক পারসিক সৈনিকের সামনাসামনি পড়ে যান। সে হযরত আল-বারা'র (রা) পথ রোধ

করে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি মুরযাবানকে হত্যা করে বীর বিক্রমে শত্রু বাহিনীর সকল প্রতিরোধ তছনছ করে দুর্গের দ্বার পর্যন্ত পৌছে যান। সেখানে খোদ হরমুযানের মুখোমুখি হন। দুই জনের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়। অবশেষে হরমুযানের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হরমুযান তাঁকে হত্যা করে তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ হাতিয়ে নেয় এবং তা ত্রিশ হাজারেরও বেশী মুদ্রায় বিক্রি করে। তবে তাঁর এ সাহসিকতায় রণক্ষেত্রে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে এটা হিজরী ২০ সনের ঘটনা। মতান্তরে হিজরী ১৯ অথবা ২৩ সনের ঘটনা।[২১] আল্লামা যিরিক্‌লী বলেন ঃ তিনি তুস্‌তারের পূর্ব ফটকে শাহাদাত বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁর কবর।[২২]

হযরত আল-বারা' ইবন মালিক ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্গত। অনেক বছর যাবত তিনি রাসূলে পাকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ নিঃসৃত অসংখ্য হাদীস নিশ্চয় তিনি শুনে থাকবেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাঁর বর্ণিত হাদীস তেমন দেখা যায়না। সম্ভবতঃ জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে এদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ 'আল বারা' ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্গত।'[২৩] আল্লামা জাহাবী বলেছেন ঃ 'তিনি ছিলেন মহান নেতাদের একজন। চরম সাহসী বীর, অশ্বারোহণ ও কঠিন বিপদের মুকাবিলায় ছিলেন একজন প্রবাদপুরুষ।'[২৪] এ কারণে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে কখনো কোন বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেননি। অন্য সামরিক অফিসারদের একবার তিনি লেখেন ঃ 'বারা'কে তোমরা কোন মুসলিম বাহিনীর আমীর নিয়োগ করবে না। সে একজন মানুষ, সে একটি বালা বা বিপদ। সামনেই যাবে, পিছনে ফিরতে জানে না। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ'সে একটি ধ্বংস।' তবে বাহ্যতঃ তিনি দেখতে দুর্বল ছিলেন।[২৫] 'রিজালুন হাওলার রাসূল' এর গ্রন্থকার খালিদ মুহাম্মদ বলেন ঃ 'তাঁর ঐকান্তিক বাসনা ছিল শহীদ হয়ে মরার।' আল্লাহ পাক তাঁর সে বাসনা পূরণ করেন।

আল-মুসতাদরিক, ইবন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবন মালিক বলতেন, আল-বারা' ইবন মালিক সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। গান গাওয়ার সখও তাঁর ছিল। হযরত আনাস বলতেন ঃ বারা' পুরুষদেরকে উট চরানোর গান গেয়ে শোনাতেন।[২৬] একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এক সফরে তিনি একটি গান গাচ্ছেন। রাসূল (সা) তা শুনে আল-বারা'কে বলেন ঃ মহিলাদের কথা একটু মনে রেখ। একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে যান।[২৭]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা–১/১৪৩; আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার টীকা–১/১৩৭; দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা (উর্দু)-৪/২৫৪;

২. উসুদুল গাবা–১/১৭২

৩. আল-ইসাবা–১/১৪৩

৪. উসুদুল গাবা–১/১৭২; আল-ইসাবা-১/১৪৭; আল-আ'লাম-২/১৫; তারিখুল ইসলাম ও তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/৩৪;
৫. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা (উর্দু)-৪/২৫৪;
৬. সীয়ারে আনসার-১/২৭৩
৭. প্রাগুক্ত–১/২৭৪; আল ইসাবা-১/১৪৩
৮. আল-কামিল ফিত তারিখ-২/৩৬৪; আল আ'লাম-২/১৫; তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/৩৬; সিফাতু সাফওয়াহ্-১/২৫৬;
৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৬; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৭
১০. আল-আ'লাম-২/১৫
১১. হায়াতুস সাহাবা-১/৫০৭; উসুদুল গাবা-১/১৭২
১২. আল-কামিল ফিত্ তারিখ-২/৫৪০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৯১
১৩. সীয়ারে আনসার-১/২৭৪; হায়াতুস সাহাবা-১/৫০৭; আল-ইসাবা-১/১৪৩
১৪. আল-কামিল ফিত তারিখ-২/৫৪০
১৫. আল-আ'লাম-২/১৫; মু'জামুল বুলদান-১/২৫৬
১৬. উসুদুল গাবা-১/১৭২; আল-কামিল ফিত্ তারিখ-২/৫৪৬;
১৭. আল-কামিল ফিত তারিখ-২/৫৪৭
১৮. তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/৩৪
১৯. উসুদুল গাবা-১/১৭২; কানযুল 'উম্মাল-৭/১১; হায়াতুস সাহাবা-১/৫১০-৫১১; আল-কামিল ফিত-তারিখ-২/৫৪৭;
২০. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই- ইসলামিয়্যা (উর্দু)-৪/২৫৫;
২১. উসুদুল গাবা-১/১৭৩;
২২. আল-আ'লাম-২/১৫; তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/৩৪
২৩. আল-ইসতী'য়াব; আল-ইসাবার টীকা-১/১৩৭
২৪. তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/৩৪
২৫. আল-আ'লাম-২/১৫; তারিখুল ইসলাম-২/৩৪; উসুদুল গাবা-১/১৭২
২৬. আল-ইসাবা-১/১৪৩
২৭. উসুদুল গাবা-১/১৭৩; আল-ইসাবা-১/১৪৩

আল-বারা' ইবন মা'রূর (রা)

নাম আল-বারা' এবং ডাকনাম আবু বিশ্‌র। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার সন্তান। পিতা মা'রূর ইবন সাখার এবং মাতা আর-রুবাব বিনতুন নু'মান। মা আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজের ফুফু।[১] হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর ছিলেন স্বীয় গোত্রের রয়িস বা নেতা। মদীনার বেশ কয়েকটি দুর্গ ও উদ্যান ছিল তাঁর মালিকানাধীন। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[২]

হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর যে 'আকাবার সর্বশেষ বাই'য়াতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। অনেকের মতে তিনি 'আকাবার প্রথম বাই'য়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতও করেন। মুসা ইবন 'উকবা ইমাম যুহ্‌রীর সূত্রে আল-বারা' ইবন মা'রূরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'তিনি ঐ মুষ্টিমেয় লোকদের একজন যাঁরা 'আকাবার প্রথম বাই'য়াতে অংশ নিয়েছিলেন।'[৩] ইবনুল আসীরও বর্ণনাটি নকল করেছেন।[৪] অনেকের মতে এই বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই। একমাত্র মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ব্যতিত আর কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ এটি নকল করেননি।[৫]

হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন তখন 'বাইতুল মাকদাস' মুসলমানদের কিবলা। মুসলমানরা সে দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। কিন্তু তিনি মক্কার কা'বাকে পিছনে রেখে শামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। একারণে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় শুরু করলেন। ইমাম যুহ্‌রী বলেছেন ঃ আল-বারা' ইবন মা'রূর প্রথম ব্যক্তি, যিনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ করেছেন।[৬] হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন, সে সময়ও তিনি কা'বামুখী হয়ে নামায আদায় করেছেন। রাসূল (সা) একথা জানতে পেরে তাঁকে বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করতে নির্দেশ দেন। তিনি সে নির্দেশ পালন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে, পরিবারের লোকদের তিনি বলেন, আমাকে তোমরা কা'বামুখী করে দাও।[৭]

হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর 'আকাবার শেষ বাই'য়াতের একজন সদস্য। এ বাই'য়াতের অন্যতম সদস্য হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ হজ্জের মওসুমে, যে বার আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেছিলাম- আমাদের কাওমের পৌত্তলিকদের সাথে আমরাও মদীনা থেকে বের হলাম। আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের বয়োঃজ্যেষ্ঠ নেতা আল-বারা' ইবন মা'রূর। যখন আমরা আল-বায়দা'র উপকণ্ঠে, তিনি আমাদের বললেন ঃ এই, তোমরা শোন! আমি একটি

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। জানিনে তোমরা আমার সাথে একমত হবে কিনা। আমরা বললামঃ আবু বিশ্‌র! বলুন তো আপনার সিদ্ধান্তটি কি? বললেন ঃ আমি এই গৃহের (কা'বা) দিকে মুখ করে নামায আদায় করবো এবং তা আর কক্ষনো আমার পিছনে রাখবো না। আমরা বললাম ঃ আল্লাহর কসম! আপনি এমনটি করবেন না। কারণ, আমরা জানি, রাসূল (সা) কেবল শামের দিকেই মুখ করে নামায আদায় করেন। আমাদের এ অনুরোধের পরও তিনি বললেন ঃ কসম আল্লাহর! আমি ঐদিকেই মুখ করে নামায আদায় করবো! যখন নামাযের সময় হলো, তিনি কা'বা মুখী হয়ে দাঁড়ালেন, আর আমরা দাঁড়ালাম শামের দিকে মুখ করে! এভাবে আমরা মক্কায় পৌঁছলাম।

মক্কায় পৌঁছে তিনি আমাকে বললেনঃ ভাতিজা! আমাকে একটু রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে চলো। আমি যা করেছি, সে বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাই। কারণ, তোমাদের বিরোধিতা করে আমি অন্তরে একটু অস্বস্তি বোধ করছি। কা'ব বলেন ঃ আমরা রাসূলের (সা) খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। আবতাহ উপত্যকায় এক ব্যক্তির দেখা পেলাম। তাকে বললাম ঃ আমাদেরকে একটু মুহাম্মাদের সন্ধান দিতে পারেন? সে পাল্টা প্রশ্ন করলো ঃ তোমরা তাঁকে দেখে চিনতে পারবে? আমরা বললাম ঃ আল্লাহর কসম! মোটেই না। সে প্রশ্ন করলো ঃ তোমরা কি 'আব্বাসকে চেন? বললাম ঃ হাঁ, তা চিনি। তিনি মাঝে মাঝে তিজারাতের উদ্দেশ্যে আমাদের ওখানে যান তো। সে বললো ঃ মসজিদে ঢুকতেই তোমরা 'আব্বাসকে দেখতে পাবে। তাঁর সাথে যে লোকটি বসা, তিনিই মুহাম্মাদ।

কা'ব বলেন ঃ আমরা মসজিদে ঢুকে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আব্বাস এক কোণে বসে আছেন। আমরা কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বসে পড়লাম। রাসূল (সা) 'আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আবুল ফাদল! এ দু'জনকে আপনি চেনেন? আব্বাস বললেন ঃ হাঁ, চিনি। ইনি আল-বারা' ইবন মারূর- তাঁর গোত্রের নেতা। আর ইনি কা'ব ইবন মালিক। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই কবি কা'ব? আব্বাস বললেন ঃ হাঁ।

এবার আল-বারা' বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মদীনা থেকে আসার পথে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমার ইচ্ছা, সে বিষয়ে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন ঃ তা বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বল। আল-বারা' বললেন ঃ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই গৃহকে (কা'বা) আর কক্ষনো পেছনে রাখবো না। এ দিকে মুখ করেই নামায আদায় করবো। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ তুমি যে কিবলার ওপর ছিলে তার ওপর যদি একটু ধৈর্য ধরে থাকতে। এরপর আল-বারা' রাসূলের (সা) কিবলার দিকে ফিরে যান এবং আমাদের সাথে শামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা বলতো তিনি তাঁর কিবলার ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।

কা'ব বলেন ঃ আমরা জানি তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং আমাদের সাথে শামের দিকে মুখ করে নামাযও পড়েছিলেন। তারপর আমরা

আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কথা দিলাম। আমাদের সাথে যে সকল মুশরিক (পৌত্তলিক) ছিল তাদের কাছে বিষয়টি গোপন রাখলাম। আমাদের সাথে জাবিরের বয়োবৃদ্ধ পিতা আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম ছিলেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে তাঁর অল্পবয়স্ক ছেলে জাবির ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই কাফিলায় ছিলেন।

কা'ব বলেন ঃ আমরা সবাই মিলে আবদুল্লাহকে ঘিরে ধরে বললাম ঃ জাবিরের আব্বা, আপনার জন্য আমাদের দুঃখ হয়। আপনি যে বিশ্বাসের ওপর আছেন, তার ওপর যদি মারা যান তাহলে কালই এই আগুনের ইন্ধনে পরিণত হবেন। অথচ আল্লাহ একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত ও 'ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহবান জানাচ্ছেন। আপনার সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে। আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আমাদের একথার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাই'য়াতে শরীক হন।

অবশেষে মিনার সেই প্রতিশ্রুত রাতটি এসে গেলে। মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন, আমরা মরুভূমির কাতা পাখির ন্যায় শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং এক সময় 'আকাবায় সমবেত হলাম। রাসূল (সা) চাচা 'আব্বাসকে সংগে নিয়ে আসলেন। 'আব্বাসই সর্ব প্রথম কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! মুহাম্মাদ আমাদের মধ্যে কেমন আছেন, তা তোমরা জান। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে আছেন। আমরা তাঁকে রক্ষা করেছি। কিন্তু তিনি তোমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে তোমাদের কাছেই যেতে চান। যদি তোমরা প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার পালন করতে পারবে বলে মনে কর তাহলে তাঁকে নিয়ে যাও। আর যদি অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় কর তাহলে তাঁকে নিজ কাওমে থাকতে দাও। তিনি তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের কাছে সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে আছেন।

আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এবার আপনি কিছু বলুন। রাসূল (সা) বক্তব্য রাখলেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন এবং কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করলেন। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললাম ঃ আপনার নিজের ও আপনার রবের জন্য আমাদের নিকট থেকে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি আপনাদের নিকট থেকে এই কথার ওপর বাই'য়াত গ্রহণ করছি যে, যা থেকে আপনারা আপনাদের সন্তান ও নারীদের রক্ষা করে থাকেন তা থেকে আমাকেও রক্ষা করবেন।

জবাবে আল-বারা' ইবন মা'রূর বললেনঃ হাঁ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, সেই সত্তার নামে শপথ, যা থেকে আমরা আমাদের জীবন ও নারীদের রক্ষা করি তা থেকে আপনাকেও আমরা রক্ষা করবো। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করলাম। আল-বারা' ইবন মা'রূর আবেদন জানালেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন, আমরা বাই'য়াত করি। রাসূল (সা) হাত বাড়িয়ে

দিলে তিনি হাতে হাত রাখেন এবং আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাই'য়াতকারী তিনি। তারপর অন্যরা একের পর এক বাই'য়াত করতে থাকে।[৮]

'আকাবার শেষ বাই'য়াতে কে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে বাই'য়াত করেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। বনু নাজ্জারের লোকেরা দাবী করেছেন, এ গৌরবের অধিকারী আস'য়াদ ইবন যুরারা, আর বনু আবদিল আশহালের লোকেরা দাবী করেছেন, আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়্যিহান। তবে কা'ব ইবন মালিকের সূত্রে ইমাম যুহরী বলেছেন, এ অনন্য গৌরবের অধিকারী আল-বারা' ইবন মা'রূর। এটিই ছিল বনু সালামার লোকদের বিশ্বাস।[৯] ইবন ইসহাকও একথা বলেছেন।[১০] 'আল্লামা যিরিক্‌লী বলেন ঃ যে বার আনসারদের সত্তর জন 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে বাই'য়াত করেন, সেই বার সর্ব প্রথম আল-বারা' ইবন মা'রূর আনসারদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন।[১১] বাই'য়াতের পর রাসূল (সা) তাঁকে ও জাবিরের পিতা আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারামকে বনু সালামার নাকীব ঘোষণা করেন।[১২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই শেষ 'আকাবায় প্রখ্যাত সাহাবী জাবির ইবন আবদিল্লাহর পিতা আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আল-বারা' তাঁকে দুই প্রস্থ পরিচ্ছন্ন কাপড় দেন এবং তিনি তাই পরে কালেমা পাঠ করেন।[১৩]

শেষ 'আকাবার বাই'য়াতে যে সকল নেতার সাথে তাঁদের ছেলেও অংশগ্রহণ করেছিল, আল-বারা' তাঁদের একজন। তাঁর ছেলে বিশ্‌র ইবন আল-বারা'ও সেদিন বাই'য়াত করেছিলেন।[১৪]

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরের জ্বিলহাজ্জ মাসে 'আকাবায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। এর মাত্র দুই মাস পরে সফর মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় অসীয়াত করে যান, আমাকে কা'বার দিকে মুখ করে কবরে রাখবে, আর আমার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নির্ধারিত থাকবে। তিনি যেখানে ভালো মনে করেন সেখানে খরচ করবেন। ইবন ইসহাকের মতে এটা রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের একমাস পূর্বের ঘটনা।[১৫] ইবনুল আসীর বলেন ঃ তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুসলমান।[১৬] ইবনুল আসীরের এই মত সঠিব বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর পূর্বে আরও দুই একজন মুসলমানের মদীনায় মৃত্যুর কথা জানা যায়। তবে নাকীবদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি ইনতিকাল করেন বলে আল্লামা যিরিকলী যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক।[১৭]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হিজরাত করে মদীনায় আসলেন। সাহাবীদের সংগে নিয়ে তিনি আল-বারা'র কবরে যান এবং চার তাকবীরের সাথে তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। আর যে সম্পদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকূলে অসীয়াত করে গিয়েছিলেন, তা তিনি গ্রহণ করে পুনরায় আল-বারা'র ছেলেকে দান করেন।[১৮]

আবদুল্লাহ ইবন আবী কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ মদীনায় আসার পর রাসূল (সা) সর্ব প্রথম আল-বারা' ইবন মা'রূরের জানাযার নামায পড়েন। সংগীদের নিয়ে তিনি তাঁর কবরের কাছে যান এবং কাতারবন্দী হয়ে তাঁর জন্য দু'আ করেন ঃ

(হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁর জন্য এই বলে দু'আ করেন ঃ[১৯]

(হে আল্লাহ, আপনি আল-বারা' ইবন মা'রূরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। কিয়ামতের দিন আপনার ও তার মাঝে আড়াল না রাখুন এবং তাকে জান্নাতবাসী করুন।)

হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূরের (রা) সন্তানাদির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। সীরাতের গ্রন্থসমূহে শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে, বিশ্র নামে তাঁর এক ছেলে ছিল এবং তিনি 'আকাবার শেষ বাই'য়াতে শরীক হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেছিলেন।[২০] হযরত আল-বারা'র মৃত্যুর পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বনু সালামার নেতা মনোনীত করেন। খাইবার যুদ্ধের সময় যয়নাব বিনতুল হারিস নাম্নী এক ইয়াহুদী মহিলা ছাগলের গোশ্তের সাথে বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) খাওয়ায়। হযরত বিশ্রও সেই বিষ মিশ্রিত গোশ্ত খেয়েছিলেন এবং তারই ক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[২১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর (রা) ইসলাম গ্রহণের পরই মক্কার কা'বাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মরণকালেও সেই দিকে মুখ করে কবর দেওয়ার জন্য অসীয়াত করে যান। তখনও কিন্তু ইসলাম কা'বাকে কিবলা বলে ঘোষণা দেয়নি। কেন তিনি এমনটি করেন? তিনি কি বুঝেছিলেন, ভবিষ্যতে কা'বাই হবে ইসলামের কিবলা? তাঁর কী সৌভাগ্য যে, পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁরই গৃহে রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থানের সময় আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে কা'বাকে কিবলা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং রাসূল (সা) তাঁরই গৃহে সর্বপ্রথম মক্কার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। ঘটনাটি এই রকম ঃ আল-বারা' ইবন মা'রূরের স্ত্রী হযরত উম্মু বিশ্র (রা) আল-বারা'র বাড়ীতে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জন্য একবার খাবার তৈরী করলেন। তিনি সেই খাবার খেয়ে সাহাবীদের নিয়ে জুহরের নামাযে দাঁড়িয়েছেন। দুই রাকা'য়াত শেষ হতেই কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে। বাকী নামায তিনি কা'বার দিকে ফিরে আদায় করেন। এটা দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মতান্তরে রজব মাসের মাঝামাঝি মঙ্গলবারের ঘটনা।[২২]

আনসারী কবি 'আওন ইবন আইউব তাঁর একটি কাসীদায় আনসারদের গৌরবময় কীর্তি-কান্ড তুলে ধরেছেন। তারই একটি পংক্তিতে তিনি আল-বারা' ইবন মা'রূরের সর্বপ্রথম কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়ের কথা গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। ইবন হিশাম পংক্তিটি তাঁর সীরাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৩]

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ আল-বারা' ইবন মা'রূরের (রা) নিম্নের পাঁচটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ[২৪]

১. সর্ব প্রথম কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়কারী।
২. শেষ 'আকাবায় সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহর হাতে হাত রেখে বাই'য়াত গ্রহণকারী।
৩. সর্ব প্রথম সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অসীয়াতকারী।
৪. রাসূল (সা) মনোনীত বারো নাকীবের একজন।
৫. নাকীবদের মধ্যে প্রথম মৃত্যুবরণকারী।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার টীকা-১/১৩৬; উসুদুল গাবা-১/১৭৩
২. সীয়ারে আনসার-১/২৮৩
৩. আল-ইসাবা-১/১৪৪
৪. উসুদুল গাবা-১/১৭৩
৫. সীয়ারে আনসার-১/১৮৩
৬. আল-ইসাবা-১/১৪৪; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৭;
৭. আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৭
৮. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্ লি-ইবন কাসীর-১/৩৪৩-৩৪৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৩৯-৪৪৩; হায়াতুস সাহাবা-১/২৪৭; উসুদুল গাবা-১/১৭৩
৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪৭, ৪৬১
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৩
১১. আল-আ'লাম-২/১৫
১২. তারীখুল ইসলাম ওয়াতাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৮১
১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮
১৪. প্রাগুক্ত-১/২৫৪
১৫. আল-ইসাবা-১/১৪৫; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৬; সিফাতুস সাফওয়াহ্-১/২০৩
১৬. উসুদুল গাবা-১/১৭৩
১৭. আল-আ'লাম-২/১৫
১৮. উসুদুল গাবা-১/১৭৩; আল-ইসাবা-১/১৪৫; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৬; সীয়ারে আনসার-১/২৮৭
১৯. হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৬
২০. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৮৩
২১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৮; সীয়ারে আনসার-১/২৮৫
২২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৬, ২৭১
২৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪০
২৪. আল-ইসাবা-১/১৪৪; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩-২৫৪; আল-আ'লাম-২/১৫

আল-বারা' ইবন 'আযিব (রা)

মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের বনু হারেসা শাখার সন্তান আল-বারা'। আনসারী সাহাবী। কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু 'উমার, মতান্তরে আবু 'আমর বা আবুত্ তুফাইল।[১] ইবনুল আসীরের মতে আবু 'আমর সর্বাধিক সঠিক।[২] পিতা 'আযিব ইবনুল হারেস সাহাবী ছিলেন।[৩] মাতা হাবীবা বিন্তু আবী হাবীবা ইবনুল হুবাব, মতান্তরে উম্মুল খালিদ বিন্তু সাবিত। মায়ের নাম যাই হোক না কেন, তিনি বদরী সাহাবী আবু বুরদাহ্ নিয়ার-এর আপন বোন এবং প্রখ্যাত সাহাবী আবু সা'ঈদ আল খুদরীর (রা) চাচাত বোন।[৪]

সাহীহাইন ও বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে আল-বারা'র সম্মানিত পিতা 'আসির সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল-বারা' বলেন ঃ একবার আবু বকর (রা) 'আযিবের নিকট থেকে দশ দিরহাম দিয়ে একটি জিন কেনেন। তারপর তিনি 'আযিবকে বলেন, আপনি আল-বারা'কে একটু বলুন, সে যেন জিনটি আমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসে। 'আযিব বললেন ঃ না, তা আমি বলছিনা, যতক্ষণ না আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আপনার হিজরাতের সফরকাহিনী শুনাচ্ছেন। অগত্যা আবু বকর (রা) বলতে শুরু করলেন।[৫]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মদীনা হিজরাত করেন তখন আল-বারা' নয় দশ বছরের কিশোর। মদীনায় তখন ইসলামের দা'ওয়াত জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর মামা 'আকাবায় বাই'য়াত করেছেন এবং পিতাও তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনই দুইটি পরিবারে আল-বারা বেড়ে ওঠেন। তাই যিরিক্লী বলেছেন ঃ তিনি ছোট্ট বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬]

সেই কৈশোরে তিনি ইসলামের হুকুম-আহকাম ও মাসলা-মাসায়িল শেখার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। মদীনায় তখন হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুমের (রা) মজলিস কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মূলতঃ তিনি শৈশবের শিক্ষা সেখানেই লাভ করেন। প্রথমে পবিত্র কুরআন পড়তে শুরু করেন। পরবর্তীকালে আল-বারা' রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মদীনায় আসেন মুস'য়াব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মে মাকুতম। তাঁরা দু'জন আমাদের কুরআন শেখাতেন। তারপর আসেন 'আম্মার, বিলাল ও সা'দ। তারপর বিশজনকে সংগে নিয়ে আসেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব। তাদের পর আবু বকরকে সংগে নিয়ে আসেন রাসূলুল্লাহ (সা)। রাসূলের (সা) আগমনে আমি মদীনাবাসীদের যতখানি উৎফুল্ল হতে দেখেছি ততখানি উৎফুল হতে আর কোন ব্যাপারে দেখিনি। তিনি যখন আসেন তখন আমি 'সাব্বিহ ইসমা রব্বিকাল আ'লা'-এর মত মুফাস্সাল সূরা মাত্র পড়েছি।[৭]

বদর যুদ্ধ যখন হয় তখন আল-বারা' কৈশোর অতিক্রম করেননি। তবে তাঁর ঈমানী

আবেগ ছিল যৌবনে ভরপুর। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির হলেন; কিন্তু যুদ্ধের বয়স না হওয়ায় তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত আল-বারা'র একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন ঃ আমরা বলাবলি করতাম, বদরের যোদ্ধা ছিল তিন শো দশজনের কিছু বেশী- তালুতের সাথে যারা নদী অতিক্রম করেছিল তাদের সমসংখ্যক। আর তালুতের সাথে নদী অতিক্রম করেছিল কেবল ঈমানদার ব্যক্তিরাই। তিনি আরও বলেন ঃ বদরে আমি ও ইবন 'উমার যুদ্ধের উপযোগী বয়স থেকে ছোট হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। বদরের দিন মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ষাটের কিছু বেশী, আর আনসারদের সংখ্যা ছিল দুই শো চল্লিশের কিছু বেশী।[৮]

হযরত আল-বারা' সর্বপ্রথম কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তার যুদ্ধের সংখ্যা মোট কত, সে সম্পর্কে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। ইবনুল আসীর, ইবন আবদিল বার ইমাম নাবাবী প্রমুখের মতে তিনি সর্বপ্রথম উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে ইবন হিশাম, ওয়াকিদী, ইবন সা'দ, আল-'আসকারীর মত সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি সর্ব প্রথম খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন। ইবন হিশাম বলেন ঃ রাসূল (সা) তাঁকে বদরে ফিরিয়ে দেন এবং খন্দকে অনুমতি দান করেন। তখন তাঁর বয়স পনোরো বছর।[৯] ওয়াকিদী বলেন ঃ ইবন 'উমার, আল-বারা 'ইবন 'আযিব, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী ও যায়িদ ইবন আরকাম—এ চারজন সর্ব প্রথম খন্দক যুদ্ধে যোগ দেন। নাফে'র বর্ণনামতে এটাই সর্বাধিক সঠিক।[১০] ইবন সা'দ মুহাম্মদ ইবন 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের দিনে আল-বারা 'ইবন আযিবকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। তখন তার বয়স পনেরো বছর। এর পূর্বে তিনি অনুমতি দেননি।[১১]

উপরোক্ত মতপার্থক্যের কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তিনি মোট কতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন সে সম্পর্কেও মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। যাঁরা তাঁর উহুদে শরীক হওয়ার কথা বলেছেন, তাঁদের হিসাবে পনেরোটি; আর যাঁরা উহুদ বাদ দিয়েছেন তাঁদের হিসেবে চৌদ্দটি।[১২] আর এই যুদ্ধের সাথে যদি অন্য সফর যোগ করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সর্বমোট সফরের সংখ্যা হবে আঠারোটি। আল-বারা' নিজেই বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মোট পনেরোটি যুদ্ধ করেছি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) আঠারোটি সফরের সঙ্গী হয়েছি।[১৩]

খন্দক থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার বাই'য়াতে অংশ গ্রহণ করেন। এ বছর রাসূল (সা) ১৪০০ সঙ্গী নিয়ে 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছিলেন। এই কাফেলায় আল-বারা'ও ছিলেন। পথিমধ্যে কুরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রাসূল (সা) হুদাইবিয়া উপত্যকায় শিবির স্থাপন করেন। সঙ্গীরা বললেন, এখানে তো পানি নেই। তবে সেখানে একটি মরা কূপ ছিল। রাসূল (সা) নিজের বান্ডিল থেকে একটি তীর বের করে একজনের

হাতে দিয়ে বললেন, যাও ঐ কূপের মধ্যে গেড়ে দিয়ে এসো। সে তীরটি হাতে নিয়ে কূপের মধ্যে নেমে গেঁড়ে দিয়ে আসতেই পানি উথলে উঠতে শুরু করলো।[১৪] ইবন ইসহাক বলেছেন, আল-বারা' দাবী করতেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যে হুদাইবিয়ার কূপে রাসূলের (সা) তীর গেড়ে ছিল।[১৫] তবে ইবন হাজার 'আসকিলানী বলেন, প্রসিদ্ধ মতে তীর গেড়ে ছিলেন নাজিয়াহ্ ইবন জুনদুব।[১৬]

এই হুদাইবিয়ার বাই'য়াত সম্পর্কে ইবন আযিবের একটি মন্তব্য বুখারী সহ সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আল-বারা' বলতেন, লোকেরা মক্কা বিজয়কে আল-ফাত্‌হ বা মহা বিজয় বলে মনে করে। হাঁ, মককা বিজয়ও একটি বিজয়। তবে হুদাইবিয়ার দিনের বাই'য়াতে রিদওয়ানকে আমরা প্রকৃত বিজয় বলে মনে করি। সে দিন আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ১৪০০ লোক ছিলাম।[১৭]

তিনি হুনাইন যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং খুব সাহসের সাথে শত্রুর মুকাবিলা করেছিলেন। বুখারী আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বনু কায়েসের এক ব্যক্তিকে আল-বারা' ইবন 'আযিবের নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছেন। প্রশ্নটি এই রকম ঃ আচ্ছা, হুনাইনের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহকে (সা) ছেড়ে পালিয়েছিলেন? তিনি বললেন ঃ তবে রাসূলুল্লাহ (সা) কিন্তু পালাননি। হাওয়াযিন গোত্র তীর চালনায় পারদর্শী। আমরা হামলা চালালে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন আমরা গনীমাত সংগ্রহের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি। বনু হাওয়াযিন আবার তীর দিয়ে আক্রমণ শুরু করে। আমি তখন রাসূলকে (সা) তাঁর সাদা খচ্চরের ওপর বসে থাকতে এবং আবু সুফিয়ানকে তার লাগাম ধরে রাখতে দেখেছি। খচ্চরের ওপর বসে তিনি এই কথাগুলি উচ্চারণ করছিলেন ঃ

'আমি নবী, একথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। হে আল্লাহ, আপনার সাহায্য পাঠান।'

আল-বারা' বলেন, যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো তখন আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে আড়াল করে দাঁড়ালাম।[১৮]

তায়িফ যুদ্ধের পর এবং বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) ইয়ামানবাসীদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একদল লোক সেখানে পাঠান। হযরত আল-বারা' ইবন 'আযিবও সেই দলে ছিলেন। বায়হাকী বর্ণনা করেন, আল-বারা' ইবন 'আযিব বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়ামনবাসীদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে খালিদ ইবন ওয়ালীদকে সেখানে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ছয়মাস ধরে আমরা মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলাম কিন্তু তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর রাসূল (সা) 'আলী ইবন আবী তালিবকে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন, খালিদের সাথে যারা আছে তাদের কেউ ইচ্ছা করলে আলীর সাথে থেকে যেতে পারে। আল-বারা' বলেন ঃ আমি আলীর সাথে থেকে গেলাম। যখন আমরা হামাদান গোত্রে গেলাম, তারা আমাদের কাছে আসলো। আলী সামনে এগিয়ে

যেয়ে আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে আমরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। আলী আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ইয়ামনবাসীদের প্রতি লেখা রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রখানি পাঠ করে শোনালেন। হামাদান গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। আলী তাদের ইসলাম গ্রহণের খবর জানিয়ে রাসূলকে (সা) পত্র লিখলেন। পত্র পাঠ করে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে দুইবার বললেন ঃ 'আস্‌সালামু 'আলা-হামাদান, 'আস্‌সালামু 'আলা-হামাদান।'[১৯]

খলীফা হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে পারস্যের তুসতার বিজয়ে তিনি আবূ মুসা আল-আশ'য়ারীর বাহিনীতে ছিলেন।[২০] আবু আমর আশ্‌-শায়বানী বলেন, আল-বারা' ইবন 'আযিব হিজরী ২৪ সনে পারস্যের রায় জয় করেন।[২১] ইমাম নাবাবী বলেন ঃ আল-বারা' ইবন আযিব ও তাঁর ভাই 'উবাইদ ইবন 'আযিব উট, সিফ্‌ফীন ও নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধগুলিতে আলীর পক্ষে যুদ্ধ করেন।[২২]

শেষ জীবনে তিনি কুফায় একটি বাড়ী তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় অন্ধ হয়ে যান।[২৩]

হিজরী ৭২ মতান্তরে ৭১ সনে হযরত মুসয়া'ব ইবন যুবাইর যখন কুফার আমীর তখন আল-বারা' সেখানে ইনতিকাল করেন।[২৪] ইতিহাসে তাঁর এই সন্তানগুলির নাম পাওয়া যায় ঃ আর-রাবী', 'উবাইদ, লুত, সুওয়াইদ ও ইযায়ীদ। তবে ইমাম নাবাবী বলেছেন ঃ তিনি ইযায়ীদ ও সুওয়াইদ নামে দুই ছেলে রেখে যান।[২৫] ইমাম নাবাবীর এই মত সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ 'তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল'গ্রন্থকার বলেছেন, তাঁর চার ছেলে- আর-রাবী', 'উবাইদ, লুত ও ইযায়ীদ তাঁদের পিতার নিকট থেকে হাদীস শুনেছে এবং বর্ণনাও করেছেন।[২৬] ইযায়ীদ এক সময় আম্মানের আমীরও হয়েছিলেন।[২৭] সুওয়াইদের জীবনীতে ইবন সা'দ লিখেছেন যে, সুওয়াইদ আম্মানের সর্বোত্তম আমীর হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।[২৮] সম্ভবতঃ ইযায়ীদ ও সুওয়াইদ দুই জনই আম্মানের আমীর হয়েছিলেন।

হযরত আল-বারা' ইবন 'আযিব সব সময় হাতে একটি সোনার আংটি পরতেন। লোকে বললো ঃ সোনা তো পুরুষের জন্য হারাম। তিনি বললেন ঃ শোন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) গনীমাতের মাল বণ্টন করলেন। শুধু একটি আংটি থেকে গেল। তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর আমাকে ডেকে বললেন ঃ ধর, এটা পরো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাকে পরাচ্ছেন। এখন তোমরাই বল, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাকে পরিয়েছেন, আমি তা কেমন করে খুলি?[২৯]

হযরত আল-বারা' ইবন 'আযিব ছিলেন একজন অতি মর্যাদাবান সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসের প্রচার ও প্রসারে ছিলেন বিশেষ মনোযোগী। তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৩০৫ টি। তারমধ্যে ২২টি মুত্তাফাক আলাইহি। ১৫টি বুখারী এবং ৬টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩০]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন খোদ রাসূলে পাকের (সা) নিকট থেকে। একবার রাসূল (সা) তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দেন। তিনি আবার তা আল-বারা'র মুখ থেকে শুনতে চান। আল-বারা' 'বিনাবিয়্যিকা'-এর স্থলে 'বিরাসুলিকা' পাঠ করেন। রাসূল (সা) শব্দটি তাঁকে শুধরে দেন।[৩১] এর ফলাফল এই হয় যে, হাদীস বর্ণনার সময় তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

একবার তিনি স্বীয় বর্ণিত হাদীসের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ যে সকল হাদীস আমি বর্ণনা করে থাকি তার সব আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনিনি। আমরা উটের রাখালি ও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতাম। এ কারণে সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে হাজির থাকতে পারতাম না। আমার বর্ণিত হাদীসের অনেকগুলি অন্য সাহাবীদের নিকট থেকে শোনা।[৩২]

আল-বারা' ইবন 'আযিব সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে সকল সাহাবীর নিকট থেকে তিনি হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকে আপন আপন স্তরে নেতৃস্থানীয়। যেমন ঃ বিলাল ইবন রাবাহ, সাবিত ইবন ওয়াদীয়া আল-আনসারী, হাস্সান ইবন সাবিত, আবু আইউব আল-আনসারী, আবু বকর ইবন আবী কুহাফা, 'আলী ইবন আবী তালিব ও 'উমার ইবনুল খাত্তাব।[৩৩]

যাঁরা তাঁর ছাত্র হওয়ার এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনার গৌরব লাভ করেন তাঁরা সকলে শ্রেষ্ঠ তাবে'ঈ। 'তাহজীবুল কামাল' গ্রন্থকার তাঁর এমন ৫০ জন তাবে'ঈ ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। তারমধ্যে বিশেষ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল ঃ ইয়াদ ইবন লাকীত, সাবিত ইবন 'উবাইদ, হারাম ইবন সা'দ, তাঁর ছেলে আর-রাবী' ইবনুল বারা', 'উবাইদ ইবনুল বারা', লুত ইবনুল বারা', ইয়াযীদ ইবনুল বারা', খায়সামা ইবন আবদির রহমান, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, যায়িদ ইবন ওয়াহাব আল-জুহানী, সা'দ ইবন 'উবাইদা, আবু বুরদাহ্ ইবন আবী মুসা আল-আশ'য়ারী প্রমুখ।[৩৪]

তাঁর হাদীসের দারসে কোন কোন সময় সাহাবীরাও হাজির হয়েছেন। এমন কিছু সাহাবীর নাম সীরাতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। তাঁরা আল-বারা' সূত্রে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-খতামী, আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবন 'আবদিল্লাহ প্রমুখ।[৩৫] তাছাড়া অনেক সাহাবী হঠাৎ করে তাঁর দারসে হাজির হয়ে যেতেন। একদিন কা'ব ইবন হুজর (রা) আরো কয়েকজন সাহাবীর সাথে তার দারসে হাজির হয়েছিলেন।[৩৬]

তাঁর মজলিসে উপস্থিত ছাত্ররা নানা ধরনের প্রশ্ন করতো। কেউ প্রশ্ন করতো কুরআনের আয়াত সম্পর্কে, আবার কেউ বা করতো ফিকাহর কোন মাসয়ালা বিষয়ে।

এক ব্যক্তি একবার সূরা আল-বাকারার ১৯৫ নং আয়াত 'নিজের জীবনকে তোমরা ধ্বংসের সম্মুখীন করো না'– সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলো। বললো ঃ এই নিষেধাজ্ঞার

মধ্যে কি পৌত্তলিকদের ওপর আক্রমণ শামিল হবেনা? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তা কি করে হয়? কারণ, আল্লাহ তো রাসূলকে (সা) জিহাদের হুকুম দিয়ে বলেছেন ঃ 'আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাক, তুমি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে জিম্মাদার নও। তুমি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাক।' (সূরা আন-নিসা ঃ ৮৪) তিনি আরো বললেন ঃ 'তুমি যে আয়াত পেশ করেছো তা হচ্ছে খরচের ব্যাপারে।'[৩৭] অর্থাৎ এমন বিশ্বাস যেন না জন্মে যে, আল্লাহর পথে খরচ করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন বিশ্বাস হলে ধ্বংস।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, লোকটি জানতে চেয়েছিল ঃ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা কি ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে শত্রুর সাক্ষাৎ পেয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন ঃ না। বরং আয়াতের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে কোন পাপ করে। অতঃপর বলে, আল্লাহ এ পাপ ক্ষমা করবেন না।[৩৮]

একবার আবদুর রহমান ইবন মুত'য়িমের এক বন্ধু কিছু দিরহাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রী করলেন। আবদুর রহমান তাঁর বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন ঃ এমন বিক্রী কি জায়েয? তিনি বললেন ঃ হাঁ, জায়েয। আমি এর আগেও এভাবে বিক্রী করেছি, কেউ মন্দ বলেনি। আবদুর রহমান আল-বারা' ইবন 'আযিবের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। শুনে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় আসেন তখন আমরা এভাবে কেনা-বেচা করতাম। তা দেখে তিনি বললেন ঃ নগদা-নগদি হলে এমন বেচাকেনায় দোষ নেই। তবে বাকী হলে জায়েয হবে না। তারপর তিনি আবদুর রহমানকে বললেন ঃ তুমি আরো নিশ্চিত হতে চাইলে যায়িদ ইবন আরকামের কাছে জিজ্ঞেস করতে পার। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আবদুর রহমান যায়িদ ইবন আরকামের কাছে যান। তিনি আল-বারা'র কথা সমর্থন করেন। ঘটনাটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে। আবুল মিনহাল বলেন ঃ একবার আমি যায়িদ ইবন আরকাম ও আল-বারা' ইবন ইবন 'আযিবের কাছে 'সারফ' বা মুদ্রা বিনিময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। আমি যখন তাঁদের একজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি অন্যজনের কথা বলে বললেন ঃ তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর। কারণ, তিনি আমার চেয়ে ভালো এবং আমার চেয়ে বেশী জানেন।[৩৯]

হযরত রাসূলে কারীমের প্রতি সীমাহীন মুহাব্বত, সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ এবং বিনয় ও ভীতি ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট। সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর নামাযের প্রতিটি বিষয় রাসূলুল্লাহর (সা) অনুরূপ ছিল। একদিন তিনি পরিবারের লোকদের জড় করে বললেন ঃ যেভাবে রাসূল (সা) ওজু করতেন এবং যেভাবে নামায পড়তেন [illegible] আমি তোমাদের তা দেখাবো। কারণ, আল্লাহই জানেন, আমি আর [illegible]দিন বাঁচবো। তিনি ওজু করে জুহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ঈশার নামায সেইভাবে আদায় করেন। আর একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সিজদার অনুসরণ করে দেখান।[৪০]

একবার আবু দাউদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। আল-বারা' প্রথমে সালাম করেন এবং তাঁর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একচোট প্রাণখুলে হাসেন। পরে বলেন ঃ জান, আমি এমনটি কেন করেছি? রাসূল (সা) একবার আমার সাথে এরূপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয় এবং নিজেদের কোন স্বার্থ প্রতিবন্ধক না হয় তখন তাদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৪১]

হাদীসে নামাযের কাতারে ডান দিকে দাঁড়ানোর অনেক বেশী ফজীলাতের কথা এসেছে। এ কারণে তিনি ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতেন।[৪২]

নিজের জান-মাল থেকেও অনেক বেশী রাসূলকে (সা) ভালোবাসতেন। প্রতিটি কথা ও কাজে তার প্রমাণ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা-সুরাতের বর্ণনা যখন দিতেন তখন তাঁর প্রতিটি শব্দ হতো প্রেম-রসে সিক্ত। বলতেন ঃ রাসূল (সা) ছিলেন জগতের সকল মানুষ থেকে সুন্দর। আমি লাল চাদর গায়ে জড়িয়ে দেখেছি, তা যতখানি রাসূলুল্লাহর (সা) গায়ে সুন্দর দেখাতো অন্যের গায়ে ততখানি নয়।[৪৩]

একবার একজন প্রশ্ন করলো, রাসূলুল্লাহর (সা) মুবারাক চেহারার দীপ্তি কি তরবারির ঔজ্জ্বল্যের মত ছিল? বললেন ঃ না। চাঁদের মত ছিল।[৪৪]

তিনি রাসূলকে (সা) যেমন গভীরভাবে ভালোবাসতেন তেমনি ভয়ও করতেন। তিনি বলেন ঃ একবার আমি রাসূলের (সা) নিকট একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাইলাম; কিন্তু তাঁর প্রতি অত্যধিক ভীতির কারণে দুই বছর দেরী করলাম।[৪৫]

বিনয় ও নম্রতার তিনি ছিলেন বাস্তব প্রতিচ্ছবি। অতি উঁচু মর্যাদার সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও অতি নগণ্য মনে করতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনার কত বড় খোশ কিসমত যে, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য্য লাভ এবং বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন। তাঁর কথা শুনে তিনি বললেন ঃ ভাতিজা, তোমার জানা নেই, রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আমরা কি কি করেছি।[৪৬]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল-৪/৩৪; তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭২; তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১৩২; আল-ইসাবা-১/১৪২,
২. উসুদুল গাবা-১/১৭১; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৯,
৩. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৫; আল-ইসাবা-১/১৪২,
৪. তাহজীবুল আসমা-১/১৩৭; তাহজীবুল কামাল-৪/৩৫; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; তাবাকাত-৪/৩৬৪,
৫ সহীহ বুখারী-১/৫৭৭; তাবাকাত-৪/৩৬৫; আল-বিদায়া-৩/১৮৭, ১৮৮; উসুদুল গাবা-১/৭২; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪০,
৬. আল-আ'লাম-২/১৪,
৭. বুখারী-১/৫৫৮; তাহজীবুল আসমা-১/১৩৩; কানযুল উম্মাল-৮/৩৩১; আল-বিদায়া-৩/১৮৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৪,

৮. আস্‌সীরাতুন নাবাবিয়্যা লি-ইবনকাসীর-১/৪৫৫; শাজারাতুজ জাহাব-১/৭৮; তাবাকাত-৪/৩৬৭-৩৬৮; বুখারী-১/৫৬৪; আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬; উসুদুল গাবা-১/১৭২,

৯. তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭৩; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৪; উসুদুল গাবা-১/১৭১; তাহজীবুল-আসমা-১/১৩২,

১০. আল-ইসতীয়াব-১/১৪০,

১১. তাবাকাত-৪/৩৬৮,

১২. আল-ইসাবা-১/১৪২; উসুদুল গাবা-১/১৭১,

১৩. মুসনাদে আহমাদ-৪/২৯২; তাবাকাত-৪/৩৬৮; তাহজীবুল আসমা-১/১৩১

১৪. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'য়া বুলুগিল আমানী-২১/৯৬,

১৫. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩১১; উসুদুল গাবা-১/১৭২,

১৬. তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭৩,

১৭. তাফসীরে ইবন কাসীর-৪/১৮২; তাহজীবুল আসমা-১/১৩৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৮,

১৮. আল-বিদায়া-৪/৩২৮; হায়াতুস সাহাবা-২/৬১০; বুখারী-১/৬১৭; মুসনাদ-৪/২৮২,

১৯. বুখারী-১/৬২৬; আল-বিদায়া-৫/১০৫; হায়াতুস-সাহাবা-১/১২১,

২০. তাহজীবুল আসমা-১/১৩৩; উসুদুল গাবা-১/১৭১,

২১. উসুদুল গাবা-১/১৭১; আল-ইসাবা-১/১৪২,

২২. তাহজীবুল আসমা-১/১৩৩; উসুদুল গাবা-১/১৭১,

২৩. তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল-৪/৩৫; আল-আ'লাম-২/১৪,

২৪ শাজারাতুজ জাহাব-১/৭৭; তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭২; তাবাকাত-৪/৩৬৮; আল-ইসাবা-১/১৪২,

২৫. তাহজীবুল আস্‌মা-১/১৩৩,

২৬. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৬,

২৭. মুসনাদ-৪/২৮৮,

২৮. তাবাকাত-৬/২০৭,

২৯. প্রাগুক্ত-৬/২৯৪,

৩০. তাবাকাত-৪/৩৬৫; তাহজীবুল আসমা-১/১৩২,

৩১. তাবাকাত-৪/২৯২,

৩২. মুসনাদ-৪/২৯২; তাবাকাত-৪/২৮৩; কানযুল 'উম্মাল-৫/২৩৮; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৮৯,

৩৩. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৫,

৩৪. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৬, ৩৭; তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭২,

৩৫. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৬; তাহজীবুল আসমা-১/১৩২,

৩৬. মুসনাদ-৪/৩০৩,

৩৭. প্রাগুক্ত-৪/২৮১,

৩৮. হায়াতুস-সাহাবা-৩/৩১৮,

৩৯. প্রাগুক্ত-৩/২৫৩,

৪০. মুসনাদ-৪/২৯৮; ৩০৩,

৪১. প্রাগুক্ত-৪/২৮৯,

৪২. প্রাগুক্ত-৪/৩০৪,

৪৩. বুখারী-১/৫০২,

৪৪. প্রাগুক্ত-১/৫০২,

৪৫. হায়াতুস সাহাবা-২/৩২৫,

৪৬. বুখারী-১/৫৯৯,

হুবাব ইবনুল মুনজির (রা)

নাম হুবাব, ডাকনাম আবু 'উমার বা আবু 'আমর। পিতা মুনজির এবং মাতা শামূস বিন্‌তু হাক্ক। মদীনার খাযরাজ গোত্রের সন্তান।[১] আকাবার অন্যতম নাকীব এবং বিরে মা'উনার অন্যতম শহীদ আল-মুনজির ইবন 'আমর আস-সা'য়িদীর (রা) মামা।[২] মহানবীর মদীনায় হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদর থেকে নিয়ে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের ঝান্ডা তাঁরই হাতে ছিল।[৩] ইবন সা'দ বলেন ঃ 'তিনি যে বদর যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, এ ব্যাপারে প্রায় ইজমা হয়ে গেছে। তবে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক তাঁকে বদরীদের মধ্যে গণ্য করেননি। আমাদের মতে এটা তাঁর ভুল। কারণ, বদরে হুবাবের কর্মকান্ড অতি প্রসিদ্ধ।'[৪]

বদরের কাছাকাছি পৌঁছে রাসূল (সা) শিবির স্থাপনের জন্য অবতরণ করলেন। হুবাব আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত কি আল্লাহর পক্ষ থেকে, না আপনার নিজের? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার নিজের। হুবাব বললেন ঃ তাহলে এখানে নয়। আমাদেরকে শত্রুপক্ষের কাছাকাছি সর্বশেষ পানির কাছে নিয়ে চলুন। সেখানে আমরা একটি পানির হাউজ তৈরী করবো, পাত্র দিয়ে উঠিয়ে সেই পানি পান করবো, আর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবো। এছাড়া অন্যসব কূপের পানি আমরা ঘোলা করে ফেলবো। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হুবাব বললেন ঃ আমরা হচ্ছি যোদ্ধা সম্প্রদায়। আমার মত হচ্ছে, একটিমাত্র কূয়ো ছাড়া বাকি সবগুলি কূয়োর পানি ঘোলা করে ফেলা। যাতে কোন অবস্থাতে আমাদের পানি-কষ্ট না হয়। পক্ষান্তরে শত্রুরা পানির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে।

হুবাবের পরামর্শ দানের পর জিবরীল (আ) এসে রাসূলকে (সা) জানান যে, হুবাবের মতটিই সঠিক। অতঃপর রাসূল (সা) হুবাবকে ডেকে বলেন, তোমার মতটিই সঠিক। একথা বলে তিনি গোটা বাহিনী সরিয়ে নিয়ে বদরের কূয়োর ধারে অবতরণ করেন।[৫]

এই বদর যুদ্ধে রাসূল (সা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, এ কারণে তিনি 'জু-আর-রায়' বা সিদ্ধান্ত দানকারী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ইমাম সা'য়ালাবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ[৬] 'বদরে তিনি ছিলেন পরামর্শদাতা। রাসূল (সা) পরামর্শ গ্রহণ করেন। জিবরীল (আ) এসে বলেন ঃ হুবাব যে মত পেশ করেছে তাই সঠিক। জাহিলী 'আমলেও তিনি অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রদান করেছেন।'

মক্কায় যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) সবচেয়ে বেশী উৎপীড়িত করেছিল নরাধম আবু কায়স ইবন আল-ফাকিহ তাদের অন্যতম। বদরে সে নিহত হয়। একটি বর্ণনা মতে হযরত হুবাবই তাকে হত্যা করেন।[৭] এ যুদ্ধে তিনি হযরত বিলালের (রা) উৎপীড়ক উমাইয়্যা ইবন খালাফের একটি উরু তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাছাড়া 'আম্মার

ইবন ইয়াসির ও তিনি একযোগে উমাইয়্যার ছেলে আলীকেও হত্যা করেন।[৮] এ যুদ্ধে তিনি খালিদ ইবন আল-আ'লামকে বন্দী করেন।[৯]

উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী এমন তোড়জোড় সহকারে মদীনার দিকে ধেয়ে আসে যে, গোটা মদীনায় একটা শোরগোল পড়ে যায়। কুরাইশ বাহিনী মদীনার অনতিদূরে জুল-হুলায়ফায় পৌঁছালে রাসূল (সা) দু'জন গুপ্তচর পাঠালেন এবং তাদের পিছনে হুবাবকেও পাঠালেন। তিনি শত্রু বাহিনীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং শত্রু বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা রাসূলুল্লাহকে (সা) দান করেন।[১০] এ যুদ্ধেও খাযরাজ গোত্রের ঝান্ডা ছিল তাঁর হাতে। অনেকের ধারণা, ঝান্ডা বাহক তিনি নন, বরং সা'দ ইবন 'উবাদা।[১১]

এই উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দেয় এবং মুসলিম বাহিনী হযরত রাসূলে কারীম (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন যে ১৫ জন মুজাহিদ জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে রাখেন তাঁদের একজন ছিলেন এই হুবাব। এ যুদ্ধে তিনি মৃত্যুর জন্য বাই'য়াত করেছিলেন।[১২]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জা ও বনু নাদীরের বিষয়ে সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাইলে হুবাব বলেন ঃ আমরা তাদের বাড়ী-ঘর ঘেরাও করে তাদের যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো। রাসূল (সা) তাঁর মতই গ্রহণ করেন।[১৩]

খাইবার যুদ্ধে খাযরাজ বাহিনীর একাংশের এবং হুনাইন যুদ্ধে গোটা খাযরাজ বাহিনীর ঝান্ডা বাহক ছিলেন তিনি।[১৪] একটি বর্ণনা মতে তাবুক যুদ্ধের সময়ও রাসূল (সা) খাযরাজ বাহিনীর ঝান্ডা তাঁর হাতে তুলে দেন।[১৫]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর মদীনার আউস ও খাযরাজ সহ গোটা আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা মসজিদে নববীর অনতিদূরে সাকীফা বনী সা'য়িদা নামক স্থানে সমবেত হয়ে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা শুরু করে। আনসার নেতা সা'দ ইবন 'উবাদার একটি ভাষণের পর তাঁরা প্রায় তাঁকেই খলীফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। এদিকে আনসারদের এ সমাবেশের খবর আবু বকরের (রা) কানে গেল। তিনি 'উমারকে (রা) সাথে নিয়ে সেখানে ছুটে গেলেন। সেখানে খলীফা মুহাজির না আনসারদের মধ্য থেকে হবে, এনিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়। এই বিতর্কে হযরত হুবাব ছিলেন হযরত সা'দ ইবন উবাদার (রা) কঠোর সমর্থক। তিনি আনসারদের পক্ষ নিয়ে হযরত 'উমারের (রা) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং দু' পর্যায়ে দু'টি জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। হযরত আবু বকরের (রা) ভাষণ শেষ হলে হুবাব উঠে দাঁড়ান এবং আনসারদের সম্বোধন করে বলতে শুরু করেন ঃ[১৬]

'ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের এ অধিকার তোমরা হাতছাড়া করো না। জনগণ তোমাদেরই সাথে আছে। তোমাদের চরিত্রের ওপর আঘাত হানতে কেউ দুঃসাহসী

হবেনা। তোমাদের মতামত ছাড়া কেউ কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সক্ষম হবে না। তোমরা হচ্ছো সম্মানী ধনবান, সংখ্যাগুরু, অভিজ্ঞ, সাহসী ও বুদ্ধিমান। তোমরা কি সিদ্ধান্ত নেবে তা দেখার জন্য মানুষ তাকিয়ে আছে। তোমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করোনা। বিভেদ সৃষ্টি করলে তোমাদের অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিপক্ষ মুহাজিররা তোমাদের দাবী যদি না-ই মানে তাহলে আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং তাদের মধ্য থেকে একজন—মোট দু'জন আমীর হবেন।'

হযরত হুবাবের (রা) এই দুই আমীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হযরত 'উমার (রা) বলে ওঠেন ঃ 'দূর! এক শিং-এর ওপর দু'জনের অবস্থান অসম্ভব।' 'উমারের (রা) বক্তব্য শেষ হলে তিনি আবার বলতে শুরু করেন ঃ 'তোমরা নিজেদের অধিকার শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। এ ব্যক্তির কথায় কান দিওনা। তাঁর কথা শুনলে তোমাদের এ ক্ষমতার অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি আমার সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন ব্যক্তি এবং মানুষ আমার সিদ্ধান্ত দ্বারা উপকৃত হয়। আল্লাহর কসম! তোমরা চাইলে এ খিলাফতকে আমরা পাঁচ বছরের একটি উটের বাচ্চায় রূপান্তরিত করে ছাড়বো।' তারপর তিনি মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'ব্যাপারটি আপনাদের হাতে ছেড়ে দিতে আমরা কার্পণ্য করতাম না। যদি না আমাদের আশঙ্কা হতো, যে সম্প্রদায়ের লোকদের পিতা ও ভ্রাতাদের আমরা হত্যা করেছি তারাই এটা হস্তগত করে না নেয়।' 'উমার জবাব দিলেন, 'যদি এমন হয় তাহলে বেঁচে থেকে কোন কল্যাণ নেই। তখন তোমার মরণই শ্রেয়ঃ।' অর্থাৎ 'উমার (রা) আশ্বাস দিলেন, এমনটি কক্ষনো হবেনা। 'আমাদের যাঁরা প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদেরই একজনের হাতে আমরা বাই'য়াত করবো যিনি তোমাদের ওপর কোনরকম অন্যায় ও অবিচার করবেন না।'

এত কিছু সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত জনতাকে হযরত আবু বকরের (রা) হাতে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) থেকে বিরত রাখতে পারলেন না। আনসারদের মধ্য থেকে সর্ব প্রথম হযরত বাশীর ইবন সা'দ (রা) আবু বকরের (রা) হাতে বাই'য়াত করেন। তখন বাশীরকে লক্ষ্য করে হুবাব বলেন ঃ 'তুমি নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারণ করলে? তোমার চাচাতো ভাইয়ের ইমারাত বা নেতৃত্বকে ঈর্ষা করলে?' বাশীর জবাব দিলেন ঃ 'তা নয়; বরং একটি সম্প্রদায়কে আল্লাহ যে অধিকার দিয়েছেন তা নিয়ে বিবাদ করা আমি পছন্দ করিনি।'

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৭] তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছরের মত। বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর।[১৮]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবুত তুফাইল 'আমের ইবন ওয়াসিলা তাঁর ছাত্র। তিনি হুবাবের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৯]

কবিত্ব ছিল তৎকালীন আরবদের স্বভাবজাত গুণ। হযরত হুবাবের মধ্যেও এ গুণটি ছিল। তিনি কবিতা রচনা করেছেন। ইতিহাসের কোন কোন গ্রন্থে তাঁর নামে কিছু

পংক্তি সংকলিত হয়েছে।[২০] তাঁর কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ তোমাদের দু'জনের পিতামাতার ভালো করুন! তোমরা কি জাননা যে, মানুষ দু' রকমের–অন্ধ ও চক্ষুষ্মান?

২. আমরা এবং মুহাম্মাদের দুশমনরা-সকলেই সিংহ-পুরুষ। যাদের হুংকার সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

৩. তবে পার্থক্য এই যে, আমরা তাঁকে সাহায্য করেছি এবং আশ্রয় দিয়েছি। আমরা ছাড়া তাঁর আর কোন সাহায্যকারী নেই।

তিনি একজন তুখোড় বক্তা ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল বিশুদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ। সাকীফা বনী সা'য়িদায় তিনি যে দু'টি ভাষণ দিয়েছিলেন তা পাঠ করলে তাঁর বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আনসাররা যে খিলাফতের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম, যে কথাটি তিনি একটি অলঙ্কার মন্ডিত বাক্যে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! তোমরা যদি চাও তাহলে অবশ্যই আমরা এ খিলাফতকে পাঁচ বছরের একটি উটের বাচ্চায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।' এখানে তিনি খিলাফতকে উটের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে আমরা যুদ্ধকে শক্তিশালী করতে পারি। তেমনিভাবে তিনি আনসারদের মধ্যে স্বীয় মর্যাদা ও স্থান বর্ণনা করেন এভাবে ঃ 'আমি আনসারদের চর্মরোগগ্রস্ত উটের শরীর চুলকাবার খুঁটি এবং তাদের দীর্ঘ ও ফলবান বৃক্ষের ঠেস দানের খুঁটি বা প্রাচীর।'

আরবে চর্মরোগগ্রস্ত উটের জন্য একটি খুঁটি বা কাঠ গেঁড়ে দেওয়া হতো যাতে সে তাতে গা চুলকাতে পারে এবং এর মাধ্যমে সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তেমনিভাবে যে খেজুর গাছটি লম্বা বা ফলবান হওয়ার কারণে উপড়ে পড়ার আশঙ্কা হতো, তাতে ঠেস দিয়ে একটি খুঁটি পুতে দেওয়া হতো অথবা একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হতো। হযরত হুবাব নিজেকে সেই খুঁটি ও প্রাচীরের সাথে তুলনা করেছেন।[২১]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা-১/৩০২; তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১/১২৩
২. তাবাকাত-৩/৫৬৭
৩. উসুদুল গাবা-১/৩৬৫; আনসাবুল আশরাফ-১/২৯৩
৪. তাবাকাত-৩/৫৬৭, ৫৬৮
৫. তাবাকাত-৩/৫৬৭; আনসাবুল আশরাফ-১/২৯৩; তাজরীদ-১/১২৩
৬. সিমারুল কুলুব-২৩০; আল-ইসাবা-১/৩০২
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/১৩৮; ২৯৯
৮. প্রাগুক্ত-১/১৯১
৯. প্রাগুক্ত-১/৩০৩
১০. উসুদুল গাবা-১/২৫২
১১. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৭; উসুদুল গাবা-১/২৫২

১২. তাবাকাত-৩/৫৬৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮
১৩. তাবাকাত-৩/৫৬৭
১৪. উসুদুল গাবা-১/১৫২
১৫. হায়াতুস সাহাবা- (আরবী) ১/৪২৩
১৬. ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন ঃ আল-বিদায়া-৫/২৪৫; আনসাবুল আশরাফ-১/৫৮০-৫৮৪; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/৩৩৬-৩৩৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৪০১; তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়া-১/১৬৮-১৬৯; তাবাকাত-৩/৫৬৮; সহীহ বুখারী-২/১০১০
১৭. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১/১২৩
১৮. তাবাকাত-৩/৫৬৮
১৯. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১/১২৩
২০. আল-আ'লাম-১/১৬৭; আল-ইসাবা-১/৩০২
২১. তাবাকাত-৩/৫৬৮; তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১/১২৩; হায়াতুস সাহাবা-২/১৬-১৭।

কাতাদা ইবন নু'মান (রা)

নাম কাতাদা। ডাকনাম অনেকগুলি। যেমন ঃ আবু 'উমার, আবু 'উসমান, আবু 'আমর ও আবু 'আবদিল্লাহ।[১] মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের বনু জাফার শাখার সন্তান।[২] মা উনাইসা বিনতু কায়স নাজ্জার গোত্রের কন্যা এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরীও (রা) তাঁর সন্তান। কাতাদা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী বৈপিত্রীয় ভাই।[৩]

তিনি সর্বশেষ 'আকাবার শপথে শরীক হন এবং ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন।[৪] বদর সহ অন্য সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন।[৫] উহুদ যুদ্ধে তিনি অকল্পনীয় ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলিম তীরন্দায বাহিনীর অন্যতম সদস্য। এ সময় রাসূল (সা) তাঁকে স্বীয় 'আল-কাতুম' নামক একটি ভাঙ্গা ধনুক দান করেছিলেন।[৬]

উহুদ যুদ্ধের এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) মুশরিক তীরন্দাযরা তাদের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিল। তাঁকেই লক্ষ্য করে তারা তীর ছুড়ছিলো। রাসূলুল্লাহর (সা) আশে পাশে তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুজাহিদ মাত্র। অন্যরা এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। এ মুষ্টিমেয় মুজাহিদরা একজনের পর একজন নিজের বুক পেতে দিয়ে প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর থেকে রাসূলকে (সা) আড়াল করে রাখছিলেন। এভাবে দশজন শহীদ হওয়ার পর হযরত কাতাদার পালা আসলো। তিনি ছিলেন একাদশ ব্যক্তি। তিনি রাসূলকে (সা) পিছনে রেখে শত্রুবাহিনীর দিকে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর ছুটে এসে তাঁর একটি চোখে আঘাত হানে। চোখটি কোটর থেকে ছিটকে গন্ডদেশে গড়িয়ে পড়ে। অন্য একটি বর্ণনা মতে চোখটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি তা হাতে ধরে রাখেন। লোকেরা ফেলে দেওয়ার পরামর্শ দিল। তিনি রাজী হলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ আমার এক স্ত্রী আছে। আমি তার প্রতি আসক্ত। তাকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসি। আমার এ অবস্থায় সে আমাকে ঘৃণা করতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে আমি যা করেছি তা শুধু শাহাদাত লাভের জন্যই করেছি। রাসূল (সা) নিজ হাতে চোখটি আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ! কাতাদা তার মুখমন্ডল দ্বারা তোমার নবীকে (সা) রক্ষা করেছে। সুতরাং তুমি এখন তার এ চোখটিকে অন্যটি অপেক্ষা সুন্দর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন করে দাও।' রাসূলুল্লাহর (সা) এ দু'আ কবুল হয়। এ চোখটি অন্যটি অপেক্ষা খুবই সুন্দর হয় এবং দৃষ্টিশক্তিও তীক্ষ্ণ হয়।[৭]

পরবর্তীকালে তাঁর সন্তানদের কেউ একজন উমাইয়্যা খলীফা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের দরবারে যান। তিনি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে একটি কবিতায় নিজের পরিচয় দান করেন। এখানে তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ দেয়া হলো ঃ[৮]

'আমি তো সেই ব্যক্তির সন্তান যার একটি চোখ তার গন্ডদেশে গড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর নবী মুস্তাফার হাত তাকে যথাস্থানে বসিয়ে দেয়।
তারপর তা পূর্বের মত হয়ে যায়। সেই চোখটির রূপ কী চমৎকার হয় এবং স্থাপনও হয় কত সুন্দর!'

হযরত কাতাদার চোখটি কোন্ যুদ্ধে আহত হয় সে সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। বদর, উহুদ ও খন্দক—এ তিনটি যুদ্ধের কথাই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালিক, দারু কুতনী, বায়হাকী ও হাফেজ ইবন 'আবদিল বার উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা সর্বাধিক সঠিক বলে মনে করেছেন।[৯]

মক্কা বিজয় অভিযানে বনু জাফারের ঝান্ডা হযরত কাতাদার হাতেই ছিল।[১০] হুনাইন যুদ্ধের চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে যাঁরা দৃঢ়পদ ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।[১১]

হিজরী ১১ সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) উসামা ইবন যায়িদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মুহাজির ও আনসারদের প্রায় সকল উঁচু স্তরের সাহাবী এ বাহিনীতে ছিলেন। হযরত কাতাদাও (রা) ছিলেন এর একজন সদস্য।[১২]

তিনি হিজরী ২৩/ খ্রীস্টাব্দ ৬৪৪, ৬৫ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন খিলাফতের মসনদে আসীন।[১৩] খলীফা 'উমার (রা) জানাযার নামায পড়ান। 'উমার, আবু সাঈদ আল খুদরী ও মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা)-এই তিনজন কবরে নেমে তাঁকে সমাহিত করেন।[১৪] ইমাম নাওয়াবী বলেন, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা ও আল-হারেস ইবন খুযায়মা এদুজন কবরে নামেন।[১৫]

'উমার ও 'উবাইদ নামে তাঁর দুই ছেলের নাম জানা যায়। স্ত্রীর নাম জানা যায় না। তবে স্ত্রীর সাথে তাঁর গভীর প্রেম-প্রীতির সম্পর্কের কথা জানা যায়।[১৬] উহুদ যুদ্ধের পূর্বে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাবে'ঈ মুহাদ্দিস হযরত 'আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদার দাদা। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক তাঁর সূত্রে প্রচুর বর্ণনা নকল করেছেন।[১৭] এই 'আসিম হিঃ ১২০ অথবা ১২৯ সনে ইনতিকাল করেন।[১৮]

তিনি ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবীদের একজন। শরীয়াতের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁর নিকট জানতে চাইতেন। হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু কাতাদার মত বিশিষ্ট সাহাবীরা যে তাঁর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতেন তা হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।[১৯]

হযরত কাতাদা ইবন নু'মানের (রা) বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা-৭ (সাত)। তারমধ্যে ইমাম বুখারী এককভাবে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২০]

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আবু সাঈদ আল খুদরী, হুজাইফা, মাহমুদ ইবন লাবীদ, 'উবাইদ ইবন হুনাইন, 'আয়াদ ইবন 'আবদিল্লাহ ও তাঁর ছেলে 'উমার ইবন কাতাদার মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আছেন।[২১]

তাঁর চরিত্রে যুহ্দ ও তাকওয়ার প্রাধান্য ছিল। একবার শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করতে করতে রাত শেষ করে ফেলেন।[২২]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় হযরত কাতাদার বংশের মধ্যে চুরির একটি ঘটনা ঘটে। চোরটি ছিল একজন মুনাফিক। সে চুরির দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর পায়তারা করে। হযরত কাতাদা তাকেই সন্দেহ করেছিলেন। তিনি তাঁর সন্দেহের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রকাশ করলে তিনি বেশ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এদিকে যাকে সন্দেহ করা হয়েছিল সে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে নিতান্ত ভালো মানুষ সেজে কাতাদার এহেন সন্দেহের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে। তখন আল্লাহ্ পাক সূরা আন-নিসার ১০৫ থেকে ১১৩ নং আয়াতগুলি নাযিল করে প্রকৃত ঘটনা রাসূলকে অবহিত করেন এবং একই সাথে কাতাদার সত্যবাদিতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৩]

হযরত কাতাদার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযা প্রকাশের ঘটনা সীরাতের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়। একদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ঘন অন্ধকার রাত। রাসূল (সা) ঈশার নামাযের জন্য আসলেন। কাতাদাও হাজির হলেন। বিদ্যুৎ চমকালে রাসূল (সা) কাতাদাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাতাদা? তিনি জবাব দিলেন ঃ আজ লোকের উপস্থিতি কম হবে–একথা ভেবে আমি ইচ্ছে করেই হাজির হয়েছি। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ ঘরে ফেরার সময় আমার কাছে এসো। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করলেন। একটি খেজুরের শাখা তাঁর হাতে দিয়ে তিনি বললেন ঃ 'ধর। এটা হাতে থাকলে তোমার সামনে দশজন এবং পিছনে দশজন আলোকিত করতে থাকবে। আর বাড়ী পৌঁছে ঘরের আশেপাশে কোথাও অন্ধকার দেখলে কোন কথা না বলেই এটা দ্বারা সেখানে আঘাত করবে। কারণ, সে শয়তান।' তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশমত খেজুর শাখাটি হাতে করে বাড়ী ফিরলেন। সত্যি সত্যিই বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি শক্ত লোম বিশিষ্ট গোলাকৃতির ক্ষুদ্র প্রাণী দেখতে পেলেন এবং সেই শাখাটি দিয়ে আঘাত করলে সেটা পালিয়ে যায়।[২৪]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৫৮
২. তাকরীবুত তাহজীব-২/১২৩
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; উসুদুল গাবা-৪/১৯৫; আল-আ'লাম ৬/২৭; আল-ইসাবা-৩/২২৫
৪. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; তাহজীবুল আসমা-২/৫৮
৫. সহীহ বুখারী-২/৫৭৪; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৮৭; আল-আ'লাম-৬/২৭
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৩; ৫২৩
৭. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪; হায়াতুস সাহাবা-১/৫০৬, ৫৫৯; ২/৩৩৪; ৩/৫৫৫ আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; আল-ইসাবা-৩/২২৫
৮. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪; তাহজীবুল আসমা-২/৫৮; উসুদুল গাবা-৪/১৯৬
৯. তাহজীবুল আসমা-২/৫৮; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৫৫, ২/৩৩৪; আল ইসাবা-৩/২২৫; উসুদুল গাবা-৪/১৯৫
১০. আল-আ'লাম-৬/২৭; তাহজীবুল আসমা-২/৫৮

১১. আল-ইসাবা-৩/২২৫
১২. তাবাকাত-২/১৩৬; হায়াতুস সাহাবা-১/৪২৩
১৩. তাকরীবুত তাহজীব-২/১২৩; আল-আ'লাম-৬/২৭; শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪
১৪. উসুদুল গাবা-৪/১৯৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; আল-ইসাবা-৩/২২৬
১৫. তাহজীবুল আসমা-২/৫৯
১৬. আল ইসতীয়াব-২/৫৪৫
১৭. উসুদুল গাবা-৪/১৯৬
১৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫২৫
১৯. সহীহ বুখারী-২/৫৭০; মুসনাদ-৪/১৫
২০. তাহজীবুল আসমা-২/৫৮; আল-আ'লাম-৬/২৭
২১. আল-ইসাবা-৩/২২৫; তাহজীবুল আসমা-২/৫৯
২২. সীয়ারে আনসার-১/১৩০
২৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৭৮-২৮০
২৪. হায়াতুস সাহাবা-৩/৬১১; আল-ইসাবা-৩/২২৬; উসুদুল গাবা-৪/১৯৬

খুযায়মা ইবন সাবিত (রা)

আবু 'আম্মারা খুযায়মা নাম এবং জু-আশ্-শাহাদাতাইন উপাধি। পিতা সাবিত ইবনুল ফাকিহ্ মদীনার আউস গোত্রের এবং মাতা কাবশা বিনতু আউস খাযরাজ গোত্রের সন্তান। আউস গোত্রের খাতম শাখার সন্তান হওয়ার কারণে তাঁকে খাতমী বলা হয়। তিনি একজন আনসারী সাহাবী।[১] জাহিলী ও ইসলামী আমলে মদীনার আউস গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত নেতা এবং সাহসী বীর।[২]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে কোন এক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 'উমাইর ইবন 'আদী ইবন খারাশাকে সংগে নিয়ে নিজ গোত্রের মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলেন।[৩] ইবন হিশাম বলেন ঃ বনু খাতমার যাঁরা প্রথম পর্বে চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন 'উমাইর ইবন 'আদী, 'আবদুল্লাহ্ ইবন আউস ও খুযায়মা ইবন সাবিত'।[৪]

ইবন সা'দের মতে তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সিফ্ফীনে মারা যান।[৫] তবে গ্রহণযোগ্য মতে তিনি উহুদ ও তার পরবর্তী যুদ্ধ ও অভিযানগুলিতে অংশগ্রহণ করেন।[৬] ইমাম জাহাবী সিফ্ফীন যুদ্ধের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বলেন ঃ যে সকল অবদরী সাহাবী সিফ্ফীনে আলীর পক্ষে যোগ দেন তাঁদের মধ্যে খুযাইমা অন্যতম।[৭] মক্কা বিজয় অভিযানে স্বীয় গোত্র বনু খাতমার ঝান্ডা ছিল তাঁরই হাতে।[৮] তিনি মূতা অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন ঃ আমি মূতা অভিযানে অংশগ্রহণ করি এবং একদিন এক ব্যক্তির একটি শ্বেত-শুভ্ররত্ন ছিনিয়ে নিই। যুদ্ধের পর আমি সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হই। তিনি সেটা আমাকে দান করেন এবং আমি তা খলীফা 'উমারের (রা) সময়ে বিক্রী করে খাতমা গোত্রের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগান ক্রয় করি।[৯] উটের যুদ্ধে তিনি আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করলেও তরবারি কোষমুক্ত করেননি। সিফ্ফীনে আলীর (রা) সাথে রণাঙ্গনে উপস্থিত হন এবং বলেন ঃ আম্মার নিহত না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা তাঁকে হত্যা করে তা না দেখা পর্যন্ত আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ আম্মারকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। অতঃপর মু'য়াবিয়ার (রা) বাহিনীর হাতে 'আম্মার নিহত হলে তিনি মন্তব্য করেন ঃ এখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এরপর সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তরবারি কোষমুক্ত করে একটি কবিতার দু'টি চরণ গুন গুন করে আবৃত্তি করতে করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১০] চরণ দু'টির অর্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আমরা 'আলীর হাতে বাই'য়াত করেছি এবং যে ফিতনার ভয় করেছি তার জন্য আবুল হাসানই যথেষ্ট।
২. 'আলীর মধ্যে শামবাসীদের সকল কল্যাণ বিদ্যমান; কিন্তু তাদের মধ্যে 'আলীর গুণাবলীর কিছুমাত্র নেই।

এভাবে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করে সিফ্ফীনের ময়দানে শহীদ হন। এটা হিজরী

৩৭/ খ্রীঃ ৬৫৭ সনের ঘটনা।[১১] মৃত্যুকালে তিনি 'আম্মারা, 'উমার ও উমারা নামে তিনটি ছেলে-মেয়ে রেখে যান।

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৩৮ (আটত্রিশ)[১২] জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আম্মারা ইবন 'উসমান, ইবন হুনাইফ, 'আমর ইবন মায়মূন আউদী, ইবরাহীম ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, আবু 'আবদিল্লাহ জাদালী, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, 'আতা ইবন ইয়াসার প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবে'ঈ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ঈমানের দৃঢ়তা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি গভীর প্রেম ও ভালোবাসা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঈমানী মজবুতীর পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনা দ্বারা। একবার রাসূল (সা) এক আরব বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া খরিদ করেন। লোকটির নাম সাওয়া ইবন কায়স আল-মুহাযিলী। এ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। এ কারণে বিষয়টি কারো জানা ছিলনা। রাসূল (সা) দর দাম ঠিক ও কথা পাকাপাকি করে লোকটিকে সংগে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে অন্য এক খরিদদার ঘোড়াটির মূল্য বেশী বলায় ঘোড়ার মালিক রাসূলকে (সা) ডেকে বলে ঘোড়া যদি নিতে চান নিয়ে নিন, নইলে আমি এর কাছে বিক্রী করে দিই। কথাটি সে এমনভাবে বলে যেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তার বেচা-কেনা হয়নি। রাসূল (সা) বললেন, ঘোড়াটি তো আগেই আমার কাছে বিক্রী করে ফেলেছো। লোকটি বললো না, আমি বিক্রী করিনি। যদি আপনার কথা সত্য হয় তাহলে কোন সাক্ষী হাজির করুন। দু'জনের কথার মাঝখানে মুসলিম জনতা জড় হয়ে গেল। তারা বললো, রাসূল (সা) সত্য বলছেন। লোকটি অস্বীকার করে সাক্ষী হাজির করার দাবী জানাতে লাগলো। ইত্যবসরে হযরত খুযায়মা সেখানে উপস্থিত হলেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ঘোড়াটি বিক্রী করেছো। খুযায়মার এমন কথায় খোদ রাসূল (সা) বিস্মিত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কিসের ভিত্তিতে তুমি এমন সাক্ষ্য দিলে? তুমি তো উপস্থিত ছিলে না? খুযায়মা উত্তর দিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তা সবই সত্য বলে জেনেছি। আর একথাও জেনেছি, আপনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, খুযায়মা বলেন ঃ আপনি আসমানের যে সব খবর দেন তা আমি বিশ্বাস করি। আর আপনি নিজে যা বলছেন তা আমি বিশ্বাস করবো না? সে দিনই হযরত রাসূলে কারীম (সা), হযরত খুযায়মার একার সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দেন এবং সে দিন থেকেই তাঁর লকব বা উপাধি হয় 'জূ-আশ্-শাহাদাতাইন' বা দু'সাক্ষের অধিকারী ব্যক্তি[১৩]। আবু দাউদ ইমাম যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ খুযায়মা একা কারো জন্য সাক্ষ্য দিলে তার একার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।[১৪]

কোন কোন সীরাত গ্রন্থে দু'জন 'জূ-আশ্-শাহাদাতাইন' লকবধারী ব্যক্তিকে দেখা যায়। অন্য জন খুযায়মা ইবন সাবিত ইবন শাম্মাস। দু'জন কি একই ব্যক্তি না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তা বলা কঠিন। আল-ইসাবা গ্রন্থের ২২৫১ ও ২২৫২ নং জীবনী দু'টিতে তাঁদের বর্ণনা এসেছে।[১৫]

সহীহ বুখারীতে হযরত খুযায়মার উপরোক্ত ঘটনাটি অন্য একটি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়িদ ইবন সাবিত বর্ণনা করেন ঃ আমরা যখন 'মাসহাফ' সংকলন করছিলাম তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত যা আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনতাম, পেলাম না। তবে আয়াতটি শুধু খুযায়মা আনসারীর নিকটই ছিল। আর তাঁর সাক্ষ্যকে রাসূল (সা) দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।[১৬]

তাঁর সম্মান ও মর্যাদার অনেক কথা সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলে পাকের পবিত্র কপালে চুমু দিচ্ছেন। স্বপ্নের কথা রাসূলকে (সা) বলার পর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পার। অতঃপর খুযায়মা উঠে এগিয়ে গিয়ে রাসূলের (সা) পবিত্র কপালে চুমু দেন।[১৭]

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি স্বপ্ন দেখেন, রাসূলকে (সা) সিজদা করছেন। একথা রাসূলের (সা) নিকট বলার পর রাসূল (সা) স্বীয় কপাল দ্বারা খুযায়মার কপাল স্পর্শ করেন।[১৮]

একবার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌলিন্য নিয়ে বাকযুদ্ধ হয়। তখন আউস গোত্রের লোকেরা খুযায়মার নামটিও অতি গর্বের সাথে উল্লেখ করে বলে, আমাদের মধ্যে খুযায়মা আছেন যাঁর সাক্ষ্যকে রাসূল (সা) দু'জনের সাক্ষ্যের সমান ঘোষণা দিয়েছেন।[১৯]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১৭০; তারীখে ইবন 'আসাকির-৫/১৩২
২. আল-আ'লাম-২/৩৫১
৩. আল-ইসাবা-১/৪২৫,৪২৬,
৪. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৩৮
৫. আল-ইসাবা-১/৪২৬
৬. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১৭০; তারীখে ইবন আসাকির-৫/১২৩
৭. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/১৭১
৮. আল-ইসাবা-১/৪২৫
৯. তারীখে ইবন 'আসাকির-৫/১৩২
১০. মুসনাদ-৫/২১৪; আনসাবুল আশরাফ-১/১৭০
১১. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১৭০; আল-ইসাবা-১/৪২৬, তারীখু ইবন 'আসাকির-৫/১৩২; আল-আ'লাম-২/৩৫১
১২. আল-আ'লাম-২/৩৫১
১৩. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ তারীখে ইবন আসাকির-৫/১৩৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৫০৯; তারকাত-৪/৩৭৮; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৬২-৬৩; আল-আজকিয়া-২৭-২৮।
১৪. আল-ইসাবা-১/৪২৫
১৫. আল-আ'লাম-২/৩৫১; আল-ইসাবা-১/৪২৯-৩০
১৬. বুখারী-২/৭০৫; তারীখে ইবন আসাকির-৫/১৩৩; হায়াতুস সাহাবা-২/৩৭০
১৭. মুসনাদ-৫/২১৪,
১৮. প্রাগুক্ত-৫/২১৫
১৯. তারীখে ইবন আসাকির-৫/১৩৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৯৫

আবু দুজানা (রা)

আসল নাম সিমাক, ডাকনাম আবু দুজানা। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু সায়িদা শাখার সন্তান। খাযরাজ নেতা বিখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) চাচাতো ভাই। পিতার নাম খারাশা ইবন লাওজান, মতান্তরে আউস ইবন খারাশা এবং মাতার নাম হাযমা বিনতু হারমালা।[১] আবু দুজানা একজন খ্যাতিমান আনসারী সাহাবী এবং একজন সাহসী বীর। ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিরাট আত্মত্যাগ স্বীকৃত।[২]

হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে 'উতবা ইবন গাযওয়ানের (রা) সাথে তাঁর দ্বীনি ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[৩] 'আল্লামা ইবন হাজার (রহ) তাঁর বদরে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতের কথা বর্ণনা করেছেন।[৪] ইবন হিশামও তাঁর বদরে শরীক হওয়ার কথা বলেছেন।[৫] বদরের যুদ্ধের দিন তাঁর মাথায় একটি লাল ফেটা বাঁধা ছিল। মুসা ইবন মুহাম্মাদ বলেন ঃ সেদিন জনতার মাঝে এ লাল ফেটার জন্যই তাঁকে স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছিল।[৬] মক্কায় যারা হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) নির্মমভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, আবুল আসওয়াদ ইবনল মুত্তালিব ছিল তাদের অন্যতম। একটি বর্ণনামতে বদরে আবু দুজানা তার ছেলে আবু হাকীমা যাম'য়া ইবনুল আসওয়াদকে হত্যা করেন। তাছাড়া আবু মুসাফি' আল-আশ'য়ারী ও মা'বাদ ইবন ওয়াহাবকেও হত্যা করেন।[৭]

আবু দুজানা উহুদ যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। এবং চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তেও তার সাথে অটল থাকেন। সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে মৃত্যুর জন্য বাই'য়াত করেছিলেন। আনাস ইবন মালিক বলেন ঃ যুদ্ধের পূর্বক্ষণে রাসূল (সা) একখানি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন ঃ এটি কে নিবে? উপস্থিত সকলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠেঃ আমি, আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কে এর হক আদায় করতে পারবে? তখন সবাই চুপ থাকলো; কিন্তু আবু দুজানা বললেন ঃ আমি পারবো এর হক আদায় করতে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু দুজানা রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর হক কি? তিনি জবাব দিলেন; এ দিয়ে কোন মুসলমানকে হত্যা না করা, এটি নিয়ে কাফিরদের ভয়ে পালিয়ে না যাওয়া।[৮]

যুদ্ধের সময় মাথায় একটি লাল ফেটা বাঁধা ছিল তাঁর অভ্যাস। সেটা বাঁধলে বুঝা যেত তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহর (সা) হাত থেকে তরবারিখানি নিয়ে তিনি মাথায় ফেটা বাঁধলেন। তারপর একটা অভিজাত চলনে সৈনিকদের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।[৯] কিছুক্ষণ পর কবিতার কিছু পংক্তি গুন গুন করে গাইতে গাইতে শত্রুবাহিনীর দিকে ধাবিত হলেন। দু'টি পংক্তির অর্থ নিম্নরূপ ঃ[১০]

১. আমি সেই ব্যক্তি, যাকে আমার বন্ধু পাহাড়ের পাদদেশে খেজুর বাগানের সন্নিকটে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন।

২. আমি যেন সৈনিকদের সারির শেষ প্রান্তে অবস্থান না করি। আর তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) তরবারি দ্বারা শত্রু নিধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উহুদের রণক্ষেত্রের দিকে তিনি অভিজাত ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়েছিলেন, তা দেখে রাসূল (সা) মন্তব্য করেছিলেন ঃ যদিও এভাবে চলা আল্লাহর পসন্দ নয়, তবে এক্ষেত্রে কোন দোষ নেই।[১১]

হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম বলেন, আবু দুজানার আগেই আমি তরবারিখানি চেয়েছিলাম। কিন্তু রাসূল (সা) আমাকে না দিয়ে দিলেন তাঁকে। অথচ আমি হলাম রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সাফিয়্যা বিনতু আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। তাই তরবারিখানি তাঁকে দেওয়ার রহস্য জানার জন্য আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি রাসূল (সা) প্রদত্ত তরবারি হাতে নিয়ে অগ্রসর হলেন। যে দিকে এগুতে লাগলেন শত্রুদের মাঝে ত্রাস ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। একসময় তিনি পাহাড়ের ঢালে নেমে গেলেন, যেখানে কুরাইশ রমণীরা হিন্দার নেতৃত্বে রণসঙ্গীত গেয়ে তাদের সৈনিকদের উৎসাহিত করছিলো। তারা আবু দুজানাকে দেখে ভীত হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করে দিল। কিন্তু কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না। কিন্তু না, আবু দুজানা তাদের কাউকে স্পর্শ করলেন না। ফিরে এলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, হিন্দার মাথার ওপর তরবারি রেখে তিনি আবার তা উঠিয়ে নিলেন। যুবাইর তাঁর পিছনেই ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন। আবু দাজানা জবাব দিলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) তরবারি দিয়ে অসহায় কোন নারীকে হত্যা করতে আমার ইচ্ছা হয়নি।[১২]

উহুদের বিপর্যয়ের সময় যে মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসূলকে (সা) ঘিরে নিজেদের দেহকে ঢাল বানিয়ে অটল হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের মধ্যে আবু দুজানা অন্যতম।[১৩] এদিন তিনি নিজের পিঠ পেতে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পিঠ রক্ষা করেছিলেন। তাই শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর-বর্শার আঘাতেই তাঁর পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো।[১৪]

এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে পৌত্তলিক আবদুল্লাহ ইবন হুমাইদ, রাসূলকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। আবু দুজানা তাকে তরবারি দ্বারা প্রচন্ড আঘাত হেনে বলে ওঠেন ঃ নে, আমি ইবন খারাশা। সেই আঘাতে নরাধম আবদুল্লাহ ধরাশায়ী হয়। তখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জন্য এই বলে দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি ইবন খারাশার প্রতি সন্তুষ্ট হও, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।[১৫]

রাসূল (সা) উহুদের যুদ্ধ শেষে রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে কন্যা ফাতিমাকে (রা) বললেনঃ লও, আমার তরবারিখানি ধুয়ে ফেল। আজ সে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে। হযরত আলীও (রা) ফাতিমার নিকট একই আবেদন করে বললেন ঃ আজ আমি খুব লড়েছি। রাসূল (সা) তার জবাবে বললেন, হাঁ, তুমি যদি ভালো লড়ে থাক তাহলে সাহল ইবন হুনাইফ ও আবু দুজানা—দু'জনই ভালো লড়েছে।[১৬]

আল্লাহপাক বনু নাদীরের যাবতীয় গনীমতের মালিকানা দান করেন রাসূলকে (সা)। তিনি সেই সম্পদ শুধুমাত্র প্রথম পর্বের মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেন। তবে সাহল ইবন হুনাইফ ও আবু দুজানা– এ দু'জন আনসারীকেও তাঁদের দারিদ্র্যের কারণে কিছু কিছু দান করেন। এ সময় আবু দুজানা কিছু ভূমি লাভ করেন যা বহু দিন পর্যন্ত ইবন খারাশার ভূমি নামে পরিচিত ছিল।[১৭]

একটি বর্ণনা মতে তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) খাযরাজ গোত্রের ঝান্ডাটি আবু দুজানার হাতে অর্পণ করেন।[১৮]

মোটকথা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কালের সকল যুদ্ধে তার প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল।'[১৯]

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে সংঘটিত ইয়ামামার ভয়াবহ যুদ্ধে তিনি চরম দুঃসাহসের পরিচয় দেন। যুদ্ধটি ছিল ভন্ড নবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের বিরুদ্ধে। সে তার একটি সুরক্ষিত উদ্যানের মধ্য থেকে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করছিল। উদ্যানটি শক্ত প্রাচীর বেষ্টিত থাকার কারণে মুসলিম বাহিনী ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে আবু দুজানা ভাবলেন। তারপর বললেন ঃ 'আমার মুসলমান ভাইয়েরা! আমাকে ভিতরে ছুড়ে মার।' এভাবে তিনি প্রাচীর তো টপকালেন; কিন্তু পা ভেঙ্গে গেল। তা সত্ত্বেও প্রাচীরের ফটক থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেন এবং মুসলিম সৈন্যরা ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত নিজের স্থানে অটল থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ ও ওয়াহশীর সাথে তিনি ভন্ড মুসায়লামার হত্যায় অংশ গ্রহণ করেন। অবশেষে এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইবন সা'দের মতে এটা হিজরী ১২ সনের, আর আল্লামা যিরিক্লীর মতে হিঃ ১১/খ্রীঃ ৬৩২ সনের ঘটনা।[২০]

আবু দুজানার সূত্রে কোন হাদীস বর্ণিত না থাকলেও 'ইবনুল আসীরের' ভাষায় ঃ 'তিনি ছিলেন সম্মানিত সাহাবীদের একজন এবং তাঁদের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।'[২১]

প্রবল একটা ঈমানী আবেগ তাঁর মধ্যে ছিল। এর প্রমাণ তিনি দিয়েছেন ইয়ামামার যুদ্ধে। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন উহুদ যুদ্ধে। এ যুদ্ধের এক মারাত্মক পর্যায়ে যখন মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে রাসূল (সা) থেকে দূরে ছিটকে পড়ে তখন যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈনিক তাঁর ধারে কাছে ছিলেন তাঁদের মধ্যে মুস'য়াব ইবন 'উমাইর ও আবু দুজানা ঢাল হিসেবে নিজেদের বুক পেতে দেন। মুসয়াব তো জীবনই দান করেন। আর আবু দুজানা নিজের দেহ ঝাঝরা করে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।

তাঁর চলার ভঙ্গিটা ছিল এক বিশেষ ধরনের যা তখন রীতিমত একটা দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল। 'আল-মাশহারা' নামে তাঁর একটি বর্ম ছিল। যুদ্ধের সময় তিনি সেটা

পরতেন। এ কারণে তাঁকে 'জুল মাশহারা' (আল-মাশহারার অধিকারী) বলা হতো। তাঁকে 'জু-আস্-সায়ফাইন'ও বলা হতো। কারণ উহুদে তিনি দু'টি তরবারি দিয়ে লড়েছিলেন। একটি নিজের এবং অপরটি রাসূলুল্লাহর (সা)। 'জু-আস্-সায়ফাইন'-অর্থ দুই তরবারির অধিকারী।[২২]

আবু দুজানা একবার রোগশয্যায় শায়িত। এক ব্যক্তি তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি তাঁর চেহারায় নূরের ঝলক দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার চেহেরা এমন উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ দু'টি অভ্যাস ছাড়া আমার তেমন কোন 'আমল নেই। একটি হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় কোন কথা আমি বলিনে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার অন্তরটি সব সময় মুসলমানদের কল্যাণকামী।[২৩] উপরোক্ত আলোচনা থেকে তাঁর কর্মময় জীবন, চরিত্র ও গুণাবলী সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৫৫৬; উসুদুল গাবা-৫/১৮৪; আল-ইসাবা-৪/৫৮
২. আল-আ'লাম-৩/২০২
৩. তাবাকাত-৩/৫৫৬; উসুদুল গাবা-৫/১৮৪
৪. আল-ইসাবা-৪/৫৮
৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৯৫, ৬৯৬
৬. তাবাকাত-৩/৫৫৬
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/১৪৯, ২৯৯, ৩০১
৮. আল-ইসাবা-৪/৫৯
৯. সিরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬, ৬৮
১০. তাবাকাত-৩/৫৫৬; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৬, ৫৫৭; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৮
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৮; আল-আ'লাম-৩/২০২
১২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৮
১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮
১৪. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৯
১৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৯, ৩২০, ৩২৪
১৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১০০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৪২
১৭. তাবাকাত ঃ মাগাযী খন্ড-১৪২; সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৯২; আনসাবুল আশরাফ-১/৫১৮
১৮. হায়াতুস সাহাবা-১/৪২৩
১৯. সীয়ারে আনসার-১/২৩৬
২০. তাবাকাত-৩/৫৫; আল-আ'লাম-৩/২০২; উসুদুল গাবা-৫/১৮৪
২১. উসুদুল গাবা-৫/১৮৪
২২. আল-আ'লাম-৩/২০২
২৩. তাবাকাত-৩/৫৫৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৩০

কুলসূম ইবনুল হিদ্ম (রা)

ইসলামের ইতিহাসে হিজরাত অধ্যায় আলোচনা করতে গেলেই হযরত কুলসূম ইবনুল হিদমের (রা) পবিত্র নামটি বারবার এসে যায়। ইসলামের প্রচার প্রসারে তাঁর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে তিনি যে আশ্রয় দিয়েছেন তাতেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বিস্তারিত জীবন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

তাঁর ডাকনাম আবু কায়স এবং আসল নাম কুলসূম। পিতা আল-হিদ্ম ইবন ইমরাউল কায়স। আউস গোত্রের বনী 'আমর ইবন 'আওফের সন্তান। মদীনার কুবা পল্লীর অধিবাসী এবং রাসূলুল্লাহর (সা) একজন আনসার সাহাবী। হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর জীবনে বার্দ্ধক্য এসে গেছে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরেই ঐতিহাসিক হিজরাত সংঘটিত হয়।[১]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে সর্বপ্রথম মদীনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে 'আমর ইবন আওফ গোত্রে চারদিন অবস্থান করেন।[২] সর্বাধিক সঠিক বর্ণনা মতে এ চারদিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও তাঁর সফর সঙ্গীকে আতিথেয়তার দুর্লভ সৌভাগ্য যিনি অর্জন করেন, তিনি এই কুলসূম ইবনুল হিদ্ম (রা)। রাসূল (সা) ও আবু বকর (রা) কুবায় এসে তাঁর গৃহেই ওঠেন। এ ব্যাপারে ইবন ইসহাক, মূসা ইবন 'উকবা ও আল-ওয়াকিদী ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৩] ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূল (সা) কুবায় কুলসূমের গৃহে অবতরণ করেন। তবে কেউ কেউ যে বলেছেন, কুলসূমের নয় বরং সা'দ ইবন খায়সামার গৃহে অবস্থান করেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেনঃ রাসূল (সা) কুলসূমের গৃহে অবস্থান করতেন এবং সা'দের গৃহে লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। কারণ, সা'দ ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর পরিবার-পরিজন ছিল না। একারণে মক্কা থেকে আগত অবিবাহিত মুহাজিরগণ সা'দের গৃহেই আশ্রয় নিতেন। আর তাই ঐ গৃহটি অবিবাহিতদের আবাসস্থল বলে লোকেরা আখ্যায়িত করতো।[৪] তাঁর গৃহে চারদিন অবস্থানের পর তিনি মদীনার মূল ভূখন্ডে আবু আইউব আল-আনসারীর (রা) গৃহে অবস্থান করেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আগমনে তিনি এত খুশী হন যে বাড়ীর চাকর-বাকরদেরকে চিৎকার করে হাঁক-ডাক শুরু করেন। নাজীহ নামে তাঁর এক চাকর ছিল। রাসূল (সা) তাঁর গৃহে উপস্থিত হলে তিনি নাজীহ, নাজীহ বলে ডাকাডাকি শুরু করেন। নাজীহ অর্থ সফলকাম। রাসূল (সা) এ নামকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করলেন। তিনি আবু বকরকে (রা) বললেনঃ ওহে আবু বকর! সফলকাম হয়েছ।[৫]

শুধুই কি হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও আবু বকর (রা) তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছিলেন? না, তা নয়। আরো অনেকে মক্কা থেকে এসে প্রথমে তাঁর ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) কুবায় তাঁর গৃহে অবস্থান কালেই আলী (রা)

ও সুহাইব (রা) মক্কা থেকে এসে সেখানেই রাসূলের (সা) সাথে মিলিত হন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁদের যখন দেখা হয় তখন তাঁর সামনে ছিল কুলসূম ইবনুল হিদমের উপস্থাপিত উম্মু জারজান নামক এক প্রকার উৎকৃষ্ট জাতের খেজুর। সুহাইব তখন ভীষণ ক্ষুধার্ত। তাছাড়া তাঁর ছিল চোখের পীড়া। এ অবস্থায় তিনি সেই খেজুর ভীষণ আগ্রহের সাথে খেতে থাকেন। তাঁকে এভাবে খেতে দেখে রাসূল (সা) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেনঃ কুরাইশরা বন্দী করে আমার ওপর অত্যাচার করেছিল। তারপর আমার সকল ধন-সম্পদের বিনিময়ে আমার নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবন ক্রয় করে খুব দ্রুত চলে এসেছি। রাসূল (সা) মন্তব্য করেন ঃ তুমি লাভবান হয়েছো।[৬]

বালাজুরী কুলসূম ইবনুল হিদমের গৃহে আলীর (রা) অবস্থানকালের একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি সেখানে থাকাকালে লক্ষ্য করেন যে, প্রতিদিনই গভীর রাতে পাশের একটি বাড়ীর দরজা খোলা হয় এবং লোকজনের আনাগোনার শব্দ হয়। এতে তাঁর মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। একদিন তিনি পাশের বাড়ীর মহিলাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। মহিলাটি বলেন ঃ জনাব, আমি একজন অনাথ বিধবা। সাইল ইবন হুনাইফ প্রতিদিন রাতে গোপনে মদীনার কাঠের তৈরী বিগ্রহগুলি ভেঙ্গে তার কাঠগুলি জ্বালানীর জন্য আমাকে দিয়ে যায়।[৭] এর দ্বারা বুঝা যায় কুলসূমের বাড়ীতে তাঁর অবস্থান বেশ দীর্ঘ হয়।

তাছাড়া আবু মা'বাদ আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)[৮] যায়িদ ইবন হারিসা (রা)[৯] আবু মারসাদ কান্নায ইবন হিসন (রা)[১০] ও আবু কাবশা (রা)[১১] মক্কা থেকে এসে সর্বপ্রথম তাঁরই আশ্রয়ে থাকেন। আল-হায়সাম ইবন 'আদীর মতে আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহও (রা) প্রথমে তাঁর বাড়ীতে ওঠেন।[১২] এভাবে ইতিহাসের পাতা উল্টালে আরো অনেক মুহাজিরের নাম পাওয়া যাবে যাঁদেরকে তিনি সেই চরম দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে হযরত হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের (রা) সাথে কুলসূমের মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১৩]

মদীনায় মসজিদে নাবাবী ও রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিনীদের আবাসস্থল নির্মাণের কাজ যখন চলছে তখনই তাঁর পরপারের ডাক এসে যায়। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই হয় বদর যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন যুদ্ধ বা অভিযানে অংশ গ্রহণের সুযোগ তিনি পাননি।[১৪] রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পর এটাই ছিল কোন আনসারী সাহাবীর মৃত্যু। এর কিছুদিন পরেই ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ মুবাল্লিগ হযরত আবু উমামা (রা) ইনতিকাল করেন। তাছাড়া অন্য একজন আনসারী সাহাবী হযরত আস'য়াদ ইবন যুরারা তার কিছুদিন পর মারা যান।[১৫] তাবারী ও ইবন কুতায়বা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে মদীনায় সর্বপ্রথম কুলসূম ইবনুল হিদমই মারা

যান। তারপর মারা যান আস'য়াদ ইবন যুরারা (রা)।[১৬]

তথ্যসূত্র ঃ

১. সিয়ারুল আনসার-১/১৫৫; সীরাতু ইবন হিশামঃ টীকা-১/৪৯৩
২. তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৩৭
৩. আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবা-৩/৩১৫
৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৩; আল-ইসাবা-৩/৩০৫; আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৩
৫. আল ইসাবা-৩/৫৫২
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/১৮২; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৭, কানযুল উম্মাল-৮/৩৩৫
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৫
৮. প্রাগুক্ত-১/২০৫
৯. প্রাগুক্ত-১/২৭২; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭৮
১০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭৭
১১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৭৮; ইবন হিশাম-১/৪৭৮
১২. আনসাবুল আশরাফ-১/২২৪
১৩. প্রাগুক্ত-১/২৭০
১৪. আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা-৩/৩১৫
১৫. টীকা সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৩
১৬. আল-ইসতী'য়াব-৩/৩০৫; ৩১৫।

শাদ্দাদ ইবন আউস (রা)

নাম শাদ্দাদ, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু ইয়া'লা আবু 'আবদির রহমান। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সন্তান। এ গোত্রের বিখ্যাত কবি 'শায়িরুর রাসূল' ও 'শায়িরুল মান্‌জিরা' নামে খ্যাত হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিতের (রা) ভাতিজা। কবি হাস্‌সান ছিলেন শাদ্দাদের পিতা আউস ইবন সাবিতের ভাই।[১] মাতা সুরাইমা বনু নাজ্জারের 'আদী উপগোত্রের কন্যা।[২]

শাদ্দাদের সম্মানিত পিতা হযরত আউস ইবন সাবিত (রা) 'আকাবার শেষ বাইয়াত (শপথ) এবং বদর যুদ্ধে শরীক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৩]

হযরত শাদ্দাদ ছিলেন একজন সাহাবী এবং একজন আমীর। খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাকে হিমসের আমীর নিয়োগ করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করলে তিনি সকল দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ ভাষী, ধৈর্যশীল ও বিজ্ঞ ব্যক্তি।[৪]

মদীনায় ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্বেই তাঁর বাবা-চাচা সহ গোত্রের প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিও তাঁদের সাথে ঈমান আনেন।[৫] যেহেতু যুদ্ধে যাওয়ার বয়স তখনও শাদ্দাদের হয়নি, একারণে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে কোন যুদ্ধে যাননি বলে জানা যায়। ইমাম বুখারীর মতে তিনি বদরে শরীক ছিলেন। আর এটা সঠিক নয় বলে আল্লামা ইবন 'আসাকির ও আরো অনেকে মন্তব্য করেছেন।[৬]

হিজরী ৫৮, খ্রীঃ ৬৭৭ সনে ৭৫ বছর বয়সে তিনি ফিলিস্তীনে ইন্তিকাল করেন এবং তাকে বাইতুল মাকদাসে দাফন করা হয়।[৭] তবে হিজরী ৪১, ৫৪ ও ৬৪ সনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলেও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।[৮]

হাফেজ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হযরত শাদ্দাদ চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। ছেলেরা হলেন ঃ ইয়া'লা, মুহাম্মাদ, আবদুল ওয়াহ্‌হাব ও আল-মুনজির। ইয়া'লা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। অন্যদের বংশধারা ছিল। মেয়েটি আয্‌দ গোত্রে বিয়ে করেন এবং হিজরী ১৩০ পর্যন্ত তাঁর বংশধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এ বছর আবু মুসলিম খুরাসানীর উত্থান ও উমাইয়্যা রাজবংশের পতন হয়। আর এ বছরেই শাম ও বাইতুল মাকদাসে দারুণ এক ভূমিকম্প হয়। এ ঘটনায় এখানে বসবাসরত আনসারদের বহু বংশধর নিহত হয়। শাদ্দাদের সন্তানরা বাড়ী ধসে মারা যান। তবে তার ছেলে মুহাম্মাদ কোন রকম বেঁচে যান। তিনি পঙ্গু অবস্থায় খলীফা আল-মাহদীর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) এক জোড়া জুতো হযরত শাদ্দাদের হিফাজতে ছিল। তার একখানা তাঁর কন্যার মাধ্যমে তাঁর সন্তানদের হাতে চলে যায়। খলীফা আল-মাহদী

যখন বাইতুল মাকদাস সফর করেন তখন জুতোখানি তাঁদের নিকট থেকে এক হাজার দীনার ও বিপুল উপঢৌকনের বিনিময়ে হাতিয়ে নেন। অবশিষ্ট জুতোখানি সম্পর্কে জানতে পারেন যে, তা মুহাম্মাদ ইবন শাদ্দাদের হিফাজতে আছে। আল-মাহদী তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হলে তিনি জুতোখানি দাবী করেন। তিনি অনেক অনুনয় ও বিনয় সহকারে বলেন যে, রাসূল (সা) যে সম্মান এ জুতোর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গীকে দান করে গেছেন, আপনি তাঁর বংশধরদের নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিবেন না। আল-মাহদী রাজী হন এবং জুতোখানি তাঁদের কাছেই রাখার অনুমতি দান করেন।[৯]

হযরত শাদ্দাদ ছিলেন বিজ্ঞ সাহাবীদের অন্যতম। হযরত 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) ছিলেন উম্মাতের একজন স্তম্ভস্বরূপ এবং সাহাবা সমাজে জ্ঞানের একটি কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বলতেন, মানুষ হয় দুই ধরনের। কিছু হয় জ্ঞানী, তবে তারা খুব বদমেজাজী। আর কিছু হয় ধৈর্যশীল। কিন্তু তারা হয় মূর্খ ও অজ্ঞ। শাদ্দাদের মধ্যে জ্ঞান ও ধৈর্যের সমন্বয় ঘটেছিল।[১০] হযরত আবুদদারদা (রা) বলতেন ঃ কিছু মানুষকে তো 'ইলম' (জ্ঞান) দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 'হিল্‌ম' (ধৈর্য) দেওয়া হয়নি। তবে আবু ই'য়ালা শাদ্দাদের মধ্যে এ দু'টির সমাবেশ ঘটেছিল।[১১] তিনি আরো বলতেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের থাকে একজন ফকীহ্‌ (ধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)। আর এ উম্মাতের 'ফকীহ' হচ্ছেন শাদ্দাদ। তাঁকে ইলম ও হিকমাত দান করা হয়েছে।[১২]

একবার মসজিদে জাবিয়ায় বসে কথা বলছেন হযরত ইবন গানাম, আবুদদারদা ও 'উবাদা ইবন সামিত। এমন সময় হযরত শাদ্দাদ এসে বললেন ঃ লোকেরা! আপনাদের নিয়ে আমার ভয় হয়। আর সে ভয়টা হচ্ছে, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার 'উম্মাত প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে পড়বে এবং শিরকে লিপ্ত হবে। কথাটির শেষাংশ ছিল বিস্মিত হওয়ার মত। তাই আবুদদারদা ও উবাদা প্রতিবাদ করলেন এবং নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদীস পেশ করলেন। হাদীসটি হলো, আরব উপদ্বীপে শয়তান তার উপাসনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাহলে আমাদের মুশরিক হওয়ার অর্থ কি? —এ প্রশ্নটি তারা রাখলেন।

শাদ্দাদ বললেন, এক ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে— তার সম্পর্কে আপনারা কি ধারণা পোষণ করেন? তাঁরা জবাব দিলেন, সে মুশরিক (অংশীবাদী)। এরপর তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে রাসূলের (সা) নিকট থেকে শুনেছি, এ সকল কাজ যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করবে, সে হবে মুশরিক। হযরত 'আউফ ইবন মালিকও ছিলেন তাঁদের সাথে। তিনি বললেন, যতটুকু কর্ম রিয়া (লোক দেখানো) থেকে মুক্ত হবে ততটুকুই কবুল হওয়ার আশা আছে। আর অবশিষ্ট কর্ম, যাতে শিরকের মিশ্রণ আছে, তা কবুল হবে না। এ হিসাবে আমাদের নিজেদের কর্মের উপর আস্থাবান হওয়া উচিত। হযরত শাদ্দাদ উত্তরে বললেন ঃ হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মুশরিকের যাবতীয় 'আমল তার উপাস্য বা মা'বুদকে দেওয়া হবে। আল্লাহ তার মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন।[১৩] হযরত শাদ্দাদের এ অভিমত হুবহু কুরআনের বাণীর

অনুরূপ। কুরআন বলছে, আল্লাহ কোন অবস্থাতেই শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিচক্ষণতা ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি 'দিরায়াত' ও 'নাকদ'-এর মূলনীতি অনুসরণ করতেন। হযরত আবুজার আল-গিফারী (রা) ছিলেন যুহ্‌দ কিনা'য়াত (বৈরাগ্য ও অল্পেতুষ্টি)-এর জন্য প্রসিদ্ধ। ভোগবাদী জীবনের বিরুদ্ধে তিনি গোটা শামে এক প্রচন্ড আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর মত ও আন্দোলনের সপক্ষে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেন। এতে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। তাঁর সম্পর্কে হযরত শাদ্দাদ (রা) বলেন ঃ আবুজার রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে কোন হাদীস, যাতে কোন কঠোরতা থাকতো, শুনতেন। তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তা প্রচার করতেন। রাসূল (সা) আবার এই কঠোরতায় কিছুটা শিথিলতা প্রদান করতেন। কিন্তু আবুজার তা জানতেন না। তিনি সেই কঠোরতার ওপর অটল থাকেন।[১৪]

হযরত শাদ্দাদের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ)। আল্লামা যিরিকলী বলেছেন, এর সবগুলিই সাহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে।[১৫] এ সকল হাদীস তিনি রাসূল (সা) থেকে এবং কিছু কা'ব আল-আহবার (রা) থেকে শুনেছেন।[১৬]

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের অনেকেই ছিলেন শামের অধিবাসী। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ মাহমুদ ইবন লাবীদ,তাঁর দুই পুত্র মুহাম্মাদ ও ইয়া'লা, আবুল আশ'য়াস সাফানী, দামরা ইবন হাবীব, আবু ইদরীস খাওলানী, মাহমুদ ইবন রাবী', 'আবদুর রহমান ইবন গানাম, বাশীর ইবন কা'ব, জুবাইর ইবন নুফাইর, আবু আসমা রাহবী, হাস্‌সান ইবন আতিয়্যা, 'উবাদা ইবন বাসানী হানজালী প্রমুখ।[১৭]

তিনি ছিলেন একজন অতি খোদাভীরু 'আবেদ ব্যক্তি। আল্লাহর ভয়ে সব সময় কম্পিত থাকতেন। অধিকাংশ সময় রাতে আরাম করার জন্য শুয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ পর আবার উঠে বসতেন এবং সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। কখনো কখনো শোনা যেত, তিনি উচ্চারণ করছেন ঃ 'আল্লাহুম্মা আন্নান নারা কাদ হালাত বায়নী ওয়া বায়নান নাওম'–হে খোদা! জাহান্নামের আগুন আমার এবং ঘুমের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহান্নাম আমার ঘুম দূর করে দিয়েছে। এখানে আসাদ ইবন বিদা'য়ার একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ শাদ্দাদ যখন রাতে বিছানায় যেতেন তখন আল্লাহর ভয়ে অত্যন্ত অশান্ত ও ভীত থাকতেন।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) ও খিলাফতে রাশেদার পর মুসলমানদের মধ্যে যে পরিবর্তন হচ্ছিল তা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করতেন। উ'বাদা ইবন নাসী বলেন ঃ একবার শাদ্দাদ ইবন আউস আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার হাতটি ধরে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। তারপর বসে কাঁদতে শুরু করলেন। তা দেখে আমরাও কাঁদা শুরু করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাঁদছেন কেন? বললাম ঃ আপনার কান্না দেখে আমার কান্না পেয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমার রাসূলুল্লাহর একটি হাদীস মনে পড়েছে। তিনি বলেছিলেনঃ আমার সবচেয়ে বেশী ভয় হয় আমার উম্মাতের প্রবৃত্তির গোপন কামনা-

বাসনার পূজারী হওয়া ও শিরকে লিপ্ত হওয়ার। আমি বললাম ঃ আপনার উম্মাত মুশরিক হয়ে যাবে? বললেন ঃ হাঁ। তবে এমন নয় যে তারা চন্দ্র, সূর্য, মূর্তি, পাথরের পূজা করবে। তাদের মধ্যে রিয়া ও প্রবৃত্তি পূজার প্রভাব দেখা দেবে। সকল মানুষ রোযা রাখবে, কিন্তু যখন তার প্রবৃত্তি চাইবে, সে নিঃসংকোচে তা ভেঙ্গে ফেলবে।[২০]

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন রোগগ্রস্ত হলে তাদের দেখতে যাওয়া ও খোঁজ-খবর নেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। আবু আশ'য়াস সাগানী শামের নিকটবর্তী দিমাশক মসজিদে থাকতেন। একবার শাদ্দাদ (রা) ও সানাবিহীর সাথে পথে তাঁর দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন দিকে যাচ্ছেন? শাদ্দাদ জবাব দিলেন, আমাদের এক ভাই অসুস্থ, তাকে দেখতে যাচ্ছি। তিনিও সংগী হলেন। ভিতরে ঢুকে তিনি রোগীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অবস্থা? জবাব এলো ঃ ভালো আছি। হযরত শাদ্দাদ বললেনঃ আমি তোমাকে রোগ-ব্যাধি গুনাহর কাফ্‌ফারা হওয়ার সুসংবাদ শুনাচ্ছি। হাদীসে এসেছেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পরীক্ষায় তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া সদ্যজাত শিশুর মত পাক-পবিত্র হয়ে যায়।[২১]

মক্কা বিজয়ের সময়কালে একদিন রাসূল (সা) মদীনার বাকী' গোরস্তানে যান। হযরত শাদ্দাদ তখন সঙ্গে ছিলেন এবং রাসূল (সা) তাঁর একটি হাত ধরেছিলেন।[২২] এ ঘটনা দ্বারা রাসূলের (সা) সাথে তাঁর সম্পর্ক অনুমান করা যায়।

একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। তাঁর চেহারায় বিমর্ষতার ছাপ দেখে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি হয়েছে? বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ। রাসূল (সা) বললেন ঃ পৃথিবী তোমার জন্য সংকীর্ণ হবে না। শাম ও বাইতুল মাকদাস বিজিত হবে। তুমি ও তোমার সন্তানরা তথাকার ইমাম হবে।[২৩] অক্ষরে অক্ষরে এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সহ বাইতুল মাকদাসে বসতি স্থাপন করেন এবং গোটা শামের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

একবার শাদ্দাদ জিহাদে গমনকারী একদল মুজাহিদকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁকে তাঁদের সাথে আহার করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াতের পর থেকে খাবারটি কোথা থেকে এসেছে তা না জেনে যদি খাওয়ার অভ্যাস থাকতো তাহলে তোমাদের সাথে অবশ্যই খেতাম।[২৪]

ইবন সা'দ খালিদ ইবন মা'দান থেকে বর্ণনা করেছেন, খালিদ বলেছেন ঃ উবাদা ইবন সামিত ও শাদ্দাদ ইবন আউস অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত, চিন্তাবিদ ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ শামে জীবিত নেই।[২৫]

ইল্‌ম উঠে যাওয়া ও ভুলে যাওয়া সম্পর্কেও একটি হাদীস আওফ ইবন মালিক আল-আশজা'ঈ (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি শাদ্দাদকে (রা) প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ 'আওফ সত্য বলেছে,তারপর তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম কোন্

'ইলমটি উঠবে তাকি তোমাকে বলবো? সে বললো ঃ হাঁ। বললেন ঃ আল্লাহভীতি। এমন কি একজন আল্লাহভীরু লোকও তুমি দেখবে না।[২৬]

শাদ্দাদ ইবন আওস বলতেন ঃ তোমরা কল্যাণ ও মঙ্গলের 'সবাব' বা কারণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাও না। তেমনিভাবে অকল্যাণ ও অমঙ্গলের কারণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওনা। কল্যাণের সবকিছুই জান্নাতের এবং অকল্যাণের সবকিছুই জাহান্নামের। আর এই দুনিয়া একটি উপস্থিত ভোগের বস্তু। সৎ ও অসৎ সকলেই তা ভোগ করে থাকে। আর আখিরাত হচ্ছে সত্য অঙ্গীকার যেখানে রাজত্ব করেন মহাপরাক্রমশালী রাজা। প্রত্যেকেরই আছে সন্তানাদি। তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়োনা।[২৭]

তিনি ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল ও স্বল্পভাষী। তবে মানুষের সাথে যখন কথা বলতেন, তখন তা হতো খুবই মধুর ও চিত্তাকর্ষক। সা'ঈদ ইবন আবদিল আযীয বলেন ঃ শাদ্দাদ দুইটি অভ্যাসে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে। বলার সময় বাগ্মিতায় এবং ক্রোধের সময় ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহানুভবতায়।[২৮]

তিনি যে কত স্বল্পভাষী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর একটি মন্তব্য দ্বারা। একবার তিনি তার এক সঙ্গীকে বললেন, পাথেয়টুকু নিয়ে এসো, একটু খেলি। সঙ্গীটি বললো ঃ এমন কথা তো আপনার মুখে কখনো শুনিনি! তিনি বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই মুখে লাগাম পরে নিয়েছি। আজ অকস্মাৎ মুখ থেকে একথাটি বেরিয়ে গেল, তোমরা এটা ভুলে যাও। আর কখনো এমনটি হবে না।[২৯]

একবার হযরত মু'য়াবিয়া (রা) হযরত শাদ্দাদকে জিজ্ঞেস করলেনঃ শাদ্দাদ, বলুন তো আমি ভালো না আলী ইবন আবী তালিব ভালো? আমাদের দু'জনের মধ্যে কে আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? শাদ্দাদ বললেনঃ আলী আগে হিজরাত করেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বেশী ভালো কাজ করেছেন, আপনার চেয়ে বেশী সাহসী, আর তিনি আপনার চেয়ে বেশী প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষ। আর ভালোবাসার কথা বলছেন? আলী চলে গেছেন। আজ মানুষ আপনার কাছে বেশী আশা করে।[৩০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তারীখু ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮
২. আল-ইসাবা- ২/১৩৯
৩. ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮; আনসাবুল আশরাফ- ১/২৪৩
৪. আল-আ'লাম- ৩/২৩২; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৯
৫. সিয়ারুল আনসার- ২/৪৫
৬. আল-ইসাবা- ২/১৩৯; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮
৭. শাজারাতুজ জাহাব- ১/৬৪; তারীকুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম- ২/২৬৫; আল-আ'লাম- ৩/২৩২
৮. আল-ইসাবা- ২/১৪০; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮
৯. বিস্তারিত জানার জন্য- তারীখু ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮, ২৮৯

১০. উসুদুল গাবা- ২/৩৮৭
১১. আল-ইসাবা- ২/১৩৯; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৫২২
১২. আল-আ'লাম- ৩৩/২৩২; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৯
১৩. মুসনাদে ইমাম আহমাদ- ৪/১২৬; সিয়ারে আনসার- ২/৪৬
১৪. মুসনাদ- ৪/১২৫
১৫. আল-আ'লাম- ৩/২৩২
১৬. আল-ইসাবা- ২/১৩৯
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. ইবন 'আসাকির- ৬/২৯১; হায়াতুস সাহাবা- ২/৬২১
১৯. উসুদুল গাবা- ২/৩৮৮
২০. মুসনাদ- ৪/১২৪; ইবন 'আসাকির- ৬/২৯০
২১. মুসনাদ- ৪/১২৩
২২. প্রাগুক্ত- ৪/১২৪
২৩. আল-ইসাবা- ২/১৪০
২৪. ইবন আসাকির- ৬/২৯১
২৫. হায়াতুস সাহাবা- ৩/২৬২; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৯
২৬. হায়াতুস সাহাবা- ৩/২৬৭
২৭. ইবন 'আসাকির- ৬/২৯১; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৫২২
২৮. আল-ইসাবা- ২/১৩৯
২৯. হায়াতুস সাহাবা- ২/৬৩৯
৩০. ইবন আসাকির- ৬/২৯১

মু'য়াজ ইবন আফরা (রা)

হযরত মু'য়াজের পিতার নাম আল-হারিস ইবন রাফা'য়া আন-নাজ্জারী এবং মাতার নাম 'আফরা বিনতু 'উবাইদ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সন্তান। পিতার নামে তিনি পরিচিত নন। ইবন সা'দ বলেন ঃ তাঁকে মায়ের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়।[১]

তাঁর মা 'আফরার প্রথম বিয়ে হয় আল-হারিস ইবন রাফা'য়া আল-খাযরাজীর সাথে। সেখানে তাঁর দু'ছেলে- মু'য়াজ ও মু'য়াওবিজ-এর জন্ম হয়। এরপর তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। 'আফরা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় যান এবং সেখানে আল-বুকাইর ইবন 'আবদি ইয়ালীল আল-লাইসীকে বিয়ে করেন। সেখানে 'আকিল, ইয়াস, 'আমির ও খালিদ নামে চার ছেলের জন্মের পর আবার মদীনায় ফিরে আসেন। পূর্ব স্বামী আল-হারিস আবার তাঁকে ফিরিয়ে নেন। এবার ছেলে 'আওফ-এর জন্ম হয়।[২] এ সবই ইসলাম-পূর্ব জীবনের ঘটনা।

হযরত 'আফরা (রা) ছিলেন একজন ভাগ্যবতী মহিলা। ইসলাম গ্রহণ করে নিজে তো সাহাবিয়্যা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাছাড়া মু'য়াজ, মু'য়াওবিজ ও 'আওফের মত তিনটি ছেলের মা হওয়ার দুর্লভ সম্মানও অর্জন করেন। এ তিনটি ছেলেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বদরের যোদ্ধা।[৩] শেষোক্ত দু'জন বদরের শহীদ।[৪] শুধু তাই নয়, তাঁরাই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ দুশমন আবু জাহলকে এ বদরেই এক যোগে হামলা করে হত্যা করেন।

'আকাবা উপত্যকায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে মদীনাবাসীদের বাই'য়াত বা শপথ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই তিনি মক্কায় গিয়ে মুসলমান হন। আরো পাঁচ ব্যক্তি এ সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। অবশ্য এ ছ'জনের নামের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। যুহরী ও 'উরওয়ার বর্ণনা মতে মু'য়াজ ইবন 'আফরাও তাদের একজন।[৫]

তাবারানী 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। হজ্জ মওসুমে আনসারদের কয়েক ব্যক্তি মক্কায় গিয়ে হজ্জ করলেন। তাঁরা হলেন ঃ মু'য়াজ ইবন 'আফরা, আস'য়াদ ইবন যুরারা, রাফে ইবন মালিক, জাকওয়ান ইবন 'আবদিল কায়েস, আবুল হায়সাম ইবন আত্-তায়্যিহান ও 'উওয়ায়িম ইবন সা'য়িদা (রা)। খবর পেয়ে রাসূল (সা) তাঁদের কাছে গেলেন এবং আল্লাহ যে তাঁকে নবী হিসেবে নির্বাচন করেছেন তা তাঁদেরকে জানালেন। তিনি কুরআন থেকে পাঠ করেও শোনালেন। তাঁরা অত্যন্ত ধীর-স্থির ভাবে কান লাগিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনলেন। আহলি কিতাবদের নিকট থেকে শেষ নবীর যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা এবং তাঁর দা'ওয়াতের বিষয় তাঁদের জানা ছিল, তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) দাবীর প্রতি তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস জন্মালো। তাঁরা ঈমান আনলেন। আগামী হজ্জ মওসুমে তাঁর সাথে আবার মিলিত হবেন-এ অঙ্গীকার করে তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন।

মদীনায় এসে তাঁরা চুপে চুপে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন এবং তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাব ও তাঁর মিশন সম্পর্কে অবহিত করতে লাগলেন। মানুষকে কুরআন পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন। তাঁরা এমন ভাবে কাজ করলেন যে, আনসারদের এমন বাড়ি খুব কমই ছিল যেখানে একজন লোকও মুসলমান হলো না।[৬] ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনাকে কেউ কেউ 'আকাবার প্রথম বাইয়াত বা শপথ বলে উল্লেখ করেছেন। এ হিসেবে 'আকাবার বা'ইয়াত হয় তিনটি।

মদীনায় যখন বেশ কিছু লোক ইসলাম কবুল করলো এবং ঘরে ঘরে ইসলামের পরিচিতি গড়ে উঠলো তখন মদীনাবাসীরা মক্কা থেকে একজন লোক পাঠানোর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অনুরোধ জানালো যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি হিসেবে তাদেরকে কুরআন শিখাবেন এবং দ্বীনের সঠিক তা'লীম দেবেন। রাসূল (সা) তাঁদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রখ্যাত দা'ঈ (আহবানকারী) মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে (রা) মদীনায় পাঠান। আবু নু'য়াইম 'আল-হুলয়িয়্যা' গ্রন্থে (১/১০৭) যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মদীনাবাসীরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাদের এ আবেদন পৌঁছানোর জন্য মু'য়াজ ইবন 'আফরা ও রাফে' ইবন মালিককে মক্কায় পাঠান।[৭]

তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মক্কায় গমন সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা রকম ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন ইবন সা'দ বলেন, বর্ণিত আছে, মু'য়াজ ইবন আল-হারিস ও রাফে' ইবন মালিক আনসারদের প্রথম দু' ব্যক্তি যাঁরা মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তাঁদের দু'জনকে আনসারদের সেই আট ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করা হয় যাঁরা প্রথম পর্বে মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার তাঁদেরকে সেই ছয় ব্যক্তির মধ্যেও গণ্য করা হয় যাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরাই আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। যাঁদের আগে আর কেউ এমন করেননি। ওয়াকিদী ও মুহাম্মদ ইবন 'উমার বলেন ঃ ছয় জনের বর্ণনাটি আমাদের নিকট সর্বাধিক সঠিক ও শক্তিশালী বলে মনে হয়।[৮] সীরাত বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, তিনি 'আকাবার পরবর্তী দু'টি বাই'য়াতেই উপস্থিত ছিলেন।[৯]

হিজরাতের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) মা'মার ইবনুল হারিসের সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১০] হযরত মু'য়াজ তাঁর অন্য দু' ভাই মু'য়াওবিজ ও 'আওফের সাথে বদরে অংশ গ্রহণ করেন। ইবন হিশাম বলেন ঃ বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[১১]

হযরত মু'য়াজ ইবন 'আফরার বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ যুদ্ধে ইসলামের চরম দুশমন আবু জাহলকে তাঁর হত্যা বা এ যুদ্ধে তাঁর শাহাদাত বরণ সম্পর্কে সীরাত ও হাদীস বিশেষজ্ঞদের দারুণ মতবিরোধ আছে। বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আবু জাহলের হত্যায় অংশগ্রহণ করেন এবং বদর যুদ্ধে আহত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি।

বদর যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশ পক্ষের তিন বীর - শায়বা, 'উতবা ও ওয়ালীদ ইবন 'উতবা হুঙ্কার ছেড়ে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায়। তখন মুসলিম বাহিনীর মধ্য হতে সর্বপ্রথম হযরত 'আফরার তিন ছেলে মু'য়াজ, মুয়াওবিজ ও আওফ তরবারি হাতে নিয়ে ময়দানের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাদেরকে বিরত রাখেন। তিনি হযরত হামযা ও অন্যদেরকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু জিহাদের তীব্র আবেগ কি তাতে দমে থাকতে পারে? হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আওফ একটি সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর ডানে-বামে দু'পাশে তাঁরা দু' ভাই এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদুর রহমান তাদেরকে চিনতেন না। এ কারণে নিজের দু' পাশে দু' তরুণকে দেখে একটু হতাশা ও ভীতি অনুভব করলেন। এর মধ্যে একজন ফিস ফিস করে জানতে চাইলেন ঃ চাচা, বলুন তো আবু জাহল কোন দিকে? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ ভাতিজা, তাকে দিয়ে কি করবে? তরুণটি বললেন ঃ শুনেছি সে রাসূলুল্লাহকে (সা) গালি দেয়, এজন্য আমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, তাকে অবশ্যই হত্যা করবো। আর এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে জীবনও বিলিয়ে দেব। দ্বিতীয় তরুণও ঠিক একই কথা বললেন।

হযরত 'আবদুর রহমান দারুণ পুলকিত হলেন। তিনি কিছুটা গর্বও অনুভব করলেন এই ভেবে যে, কত মহান দু' ব্যক্তির মাঝখানেই না দাঁড়িয়ে! তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ দেখ, ঐ যে আবু জাহল হাঁটছে। এতটুকু বলতেই তাঁরা দু'জন বাজ পাখীর ন্যায় ত্বরিৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন। ফিরে এসে তাঁরা রাসূলকে (সা) এ হত্যার সুসংবাদ দান করেন। তখন তাঁদের দু' জনের তরবারিতে আবু জাহলের রক্ত বিদ্যমান।[১২]

সহীহ মুসলিম গ্রন্থে এ দু' তরুণের নাম মু'য়াজ ইবন 'আমর ইবনুল জামূহ এবং মু'য়াজ ইবন 'আফরা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সহীহ বুখারীতে 'আফরা'র ছেলেদের কথা এসেছে। যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, মু'য়াজ ইবন 'আফরা' ও তাঁর ভায়েরা নরাধম আবু জাহলকে হত্যা করেছিলেন।

আল হাকেম (৩/৪২৫) ও আল-বায়হাকীর (৬/৩০৫) বর্ণনায় জানা যায়, ঐ দু' তরুণের একজন মু'য়াজ ইবন 'আফরা এবং অন্যজন মু'য়াজ ইবন 'আমর ইবনুল জামূহ। তাঁরা আবু জাহলকে হত্যার পর দৌড়ে রাসূলকে (সা) সুসংবাদ দিতে এলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের দু'জনের কে তাঁকে হত্যা করেছে? তাঁরা দু'জনই বললেন ঃ আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছো? তাঁরা বললেন ঃ না। রাসূল (সা) তাদের দু'জনের তরবারির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা দু'জনেই তাঁকে হত্যা করেছো, এরপর তিনি তাঁদের দু'জনকেই রণক্ষেত্রে আবু জাহলের নিকট থেকে প্রাপ্ত জিনিসগুলি দান করেন।[১৩]

ইবন আবী খায়সামা ইবন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মু'য়াজ ইবন 'আফরা বলেছেন ঃ 'আমি সুযোগ পেয়ে আবু জাহলকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত হানলাম

যে, তার পায়ের নলার মাঝামাঝি থেকে কেটে পড়ে গেল। সাথে সাথে 'আকরামা ইবন আবী জাহল আমার এক কাঁধে আঘাত করে বসলো। আমার একটি হাত গোড়া থেকে কেটে ঝুলে থাকলো। আমার সেই ঝোলানো হাতটি পিছনের দিকে টেনে নিয়ে বেড়াতাম। তারপর সেটা যখন বেশী কষ্ট দিতে লাগলো তখন একদিন পা দিয়ে চেপে ধরে ছিঁড়ে ফেলে দেই। অবশ্য ইবন হিশাম ইবন ইসহাকের সূত্রে উপরোক্ত ঘটনা মু'য়াজ ইবন 'আমর ইবনুল জামূহ-এর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর সহযোগী হিসেবে মু'য়াওবিজ ইবন 'আফরার কথা বলেছেন।[১৪]

'আল-ইসতীয়াব গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, বদরে তিনি বনু যুরাইক গোত্রের ইবন মায়িদ-এর আঘাতে আহত হন।[১৫] ইবন সা'দ-এর মতে 'আফরার দু'ছেলে মু'য়াওবিজ ও 'আওফ এক কোপে আবু জাহলকে আক্রমণ করেন। আবু জাহল পাল্টা আক্রমণ করে তাদের দু'জনকেই হত্যা করে। এরপর আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বাকী কাজটুকু শেষ করে তাকে জাহান্নামে পাঠান।[১৬]

একটি বর্ণনা মতে এ বদর যুদ্ধে তিনি ইসলামের অন্য এক চরম দুশমন উমাইয়্যা ইবন খালাফকে হত্যায় অংশগ্রহণ করেন।[১৭]

আবু জাহলের হত্যার ঘটনার মত হযরত মু'য়াজ ইবন 'আফরার মৃত্যুর সময় সম্পর্কে বেশ মতভেদ আছে। যেমন, বালাজুরী বলেন ঃ মু'য়াজ ও তাঁর ভাই মু'য়াওবিজ বদরে শহীদ হন। তাঁদের ভাই 'আওফ জীবিত থাকেন। ইবনুল কালবী বলেন ঃ বদরে মু'য়াজ ও মু'য়াওবিজ শহীদ হওয়ার পর 'আফরা ছেলে 'আওফকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসেন। তারপর ছেলে 'আওফের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমার সবচেয়ে খারাপ ছেলেটি রয়ে গেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ না। তার মাধ্যমেই 'আফরা'র বংশধারা চলবে। কিন্তু ওয়াকিদী বলেন ঃ বদরে 'আওফ ও মু'য়াবিজ শহীদ হন এবং মু'য়াজ জীবিত থাকেন। তারপর ফিত্না অর্থাৎ আলী-মু'য়াওবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় হিজরী ৩৭ সনে ইনতিকাল করেন।[১৯] 'আওফ ও মু'য়াওবিজ যে বদরে শহীদ হন, একথা ইবন হিশামও বলেছেন।[২০]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, মু'য়াজ বদরে বনু যুরাইক গোত্রের ইবন মা'য়িদা-এর হাতে আহত হন এবং তাতেই পরে মদীনায় মারা যান। ইবন ইদরীস, ইবন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মু'য়াজ খলীফা উসমানের (রা) সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। খলীফা ইবন খাইয়্যাত বলেছেন ঃ তিনি আলী ইবন আবী তালিবের (রা) খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন।[২১]

যাই হোক, তিনি যে বদরে শাহাদাত বরণ বা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেননি তা প্রমাণিত হয় সীরাত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত তাঁর পরবর্তী জীবনের অনেক ঘটনাবলী দ্বারা। এখানে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো ঃ

খলীফা হযরত 'উমার (রা) খাইবার থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করার পর সেখানকার 'ওয়াদি-উল-কুরা মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তাঁর একটি অংশ মু'য়াজ ইবন 'আফরাও লাভ করেন।[২২]

হযরত আবু আইউব আল-আনসারীর (রা) আযাদকৃত দাস আফলাহ্ বর্ণনা করেছেন। একবার খলীফা 'উমার (রা) প্রত্যেক বদরী সাহাবীকে দেওয়ার জন্য খুব সুন্দর চাদর তৈরী করালেন। তার একটি মু'য়াজ ইবন 'আফরাকেও পাঠালেন। তারপর মু'য়াজ আমাকে বললেন ঃ চাদরটি বিক্রী করে দাও। আমি পনেরো শো দিরহামে বিক্রী করলাম। তিনি আবার আমাকে সেই অর্থ দিয়ে কিছু দাস খরীদ করে আনতে বললেন। আমি পাঁচটি দাস খরীদ করে আনলাম। তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিলেন। 'উমার (রা) এ খবর শুনে মাত্র এক শো দিরহাম খরচ করে একটি মোটা ও পুরো চাদর তৈরী করে আবার পাঠান। মু'য়াজ চাদরটি হাতে নিয়ে সোজা 'উমারের (রা) নিকট চলে যান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি এটি পাঠিয়েছেন? 'উমার বললেন ঃ হ্যাঁ। পূর্বে যেটি পাঠিয়েছিলাম, ঠিক সে রকম চাদর আপনার অন্যসব ভাইদের নিকটও পাঠিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি সেটি পরেননি। মু'য়াজ বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! এটা আমি পরবো না। আমি চাই, আপনার নিকট যে সব কল্যাণকর জিনিস আছে তাই আসুক। একথা বলে তিনি চাদরটি ফিরিয়ে দেন।[২৩] দুনিয়ার প্রতি তিনি যে কতখানি নিরাসক্ত ছিলেন তা উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়।

হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নরাধম আবু জাহলের হত্যার ঘটনায়। এ ক্ষেত্রে জীবনের মায়া ত্যাগ করে যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

মদীনায় মসজিদে নববী যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সে ভূ-খন্ডটি ছিল সাহল ও সুহাইল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের। রাসূল (সা) কুবা থেকে যে দিন মদীনার মূল ভূ-খন্ডে প্রবেশ করেন সে দিন তাঁর বাহন উটটির লাগাম ছেড়ে দেওয়া ছিল। সে আল্লাহর নির্দেশে চলছিল এবং আল্লাহরই নির্দেশে সাহল ও সুহাইলের উক্ত ভূমিতে এসে বসে পড়ে। ইবন হিশামের বর্ণনামতে উক্ত ইয়াতীমদ্বয় তখন এই মু'য়াজ ইবন 'আফরার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছিল।[২৪] এতে বুঝা যায়, তিনি ইয়াতীম ও অসহায়দের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন।

দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একবার হজ্জ করেন। এছাড়া আরো হজ্জ করেন। যার একটির বর্ণনা সুনানে নাসাঈ গ্রন্থে এসেছে।[২৫]

ইবন সা'দ তাঁর একাধিক স্ত্রী ও অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এমন কি তাদের নামও বর্ণনা করেছেন।[২৬]

সুনানে নাসাঈ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত দু'একটি হাদীস পাওয়া যায়।[২৭]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৪৯১; তাকরীবুত তাহজীব-২/২৫৫,
২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, ২৯৬,
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭০২, ৪২৯, আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৪
৪. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, ২৯৬,

৫. ফাতহুল বারী-৭/১৭২
৬. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭৯
৭. প্রাগুক্ত-১/১১৭
৮. তাবাকাত-৩/৪৯২, আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৪
৯. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩১, ৪৫৭, তাবাকাত-৩/৪৯২
১০. আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৬; তাবাকাত-৩/৪৯২, উসুদুল গাবা-৪/৩৭৯
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৭, আল-ইসাবা-৩/৪২৮, উসুদুল গাবা-৪/৩৭৯
১২. বুখারী; কিতাবুল মাগাযী-২/৫৬৮; মুসলিম-২/৬৮,৬৯, হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৪, ৫৫৫
১৩. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৫
১৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭১০; আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৫
১৫. আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৪
১৬. তাবাকাত-৩/৪৯২, ৯৩ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩১, ৪৫৭
১৭. আল-ইসাবা-৩/৪২৮; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭১৩
১৮. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, ২৯৬
১৯. তাবাকাত-৩/৪৯২; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, ২৯৬
২০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩১, ৪৫৭ উসুদুল গাবা-৪/৩৭৯
২১. আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৪, ৩৬৬; তাকরীবুত তাহজীব-২/২৫৬, আল-ইসাবা-৩/২২৮, উসুদুল গাবা-৪/৩৭৯
২২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৫৮
২৩. হায়াতুস সাহাবা-১/২৯৭-২৯৮
২৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৫
২৫. সীয়ারে আনসার-২/২০৪
২৬. তাবাকাত/৩/৪৯১
২৭. আল-ইসাবা-৩/২২৮, আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৫, ৩৬৬।

আবু লুবাবা (রা)

হযরত আবু লুবাবার (রা) আসল নামের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মুসা ইবন 'উকবা ও ইবন হিশাম বলেন, তাঁর নাম বাশীর। আর ইবন ইসহাকের মতে রাফা'য়া। তাফসীরে 'আল-কাশশাফের' রচয়িতা আল্লামা যামাখশারী সূরা আল আনফালের তাফসীরে তাঁর নাম 'মারওয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন।[১] বালাজুরীর মতে, রাফা'য়া হচ্ছেন আবু লুবাবার ভাই এবং তিনি 'আকাবার শেষ বা'ইয়াতে অংশ গ্রহণ করেন। বদরেও অংশ গ্রহণ করেন এবং খাইবার যুদ্ধে শহীদ হন। আর আবু লুবাবার নাম বাশীর।[২] তাঁর আসল নাম যাই হোক না কেন, ইতিহাসে তিনি আবু লুবাবা নামেই খ্যাত। তাঁর পিতার নাম 'আবদুল মুনজির ইবন যুবাইর। মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের বনু 'আমর ইবন 'আওফ শাখার সন্তান। তিনি 'আকাবার শেষ বাই'য়াতে (শপথ) অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজ গোত্রের 'নাকীব' (দায়িত্বশীল) মনোনীত হন।[৩]

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধের সময় বিশেষ সম্মানও লাভ করেন। এ সফরে প্রতিটি উটের ওপর তিনজন করে আরোহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) উটের ওপর আবু লুবাবা ও আলী ইবন আবী তালিব (রা) ছিলেন। তাঁরা পালাক্রমে উটের পিঠে ওঠানামা করছিলেন। যখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পালা আসছিলো, তাঁরা আবেদন করছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উটের পিঠেই থাকুন, আমরা হেঁটে চলছি। কিন্তু রাসূল (সা) বলছিলেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও। আর এমনও নয় যে, তোমাদের চেয়ে বেশী সাওয়াবের প্রয়োজন আমার নেই।[৪]

ইবন ইসহাক বলেন ঃ অনেকে বলেছেন, আবু লুবাবা ও আল-হারিস ইবন হাতিব, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদরের দিকে যাত্রা করেন। কিছু দূর যাওয়ার পর পথ থেকে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনকে আবার মদীনায় ফেরত পাঠান। রাসূল (সা) আবু লুবাবাকে মদীনার ইমারাতের দায়িত্বও দান করেন। যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনকেই গনীমাতের অংশ দেন এবং আসহাবে বদরের মতই তাঁদের সাথে আচরণ করেন। মুসা ইবন 'উকবা আবু লুবাবাকে বদরীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৫] ইবন হিশাম বলেন ঃ রাসূল (সা) 'আর-রাওহা' নামক স্থান থেকে তাঁদের দু'জনকে ফেরত পাঠান।[৬]

হিজরী ২য় সনের শাওয়াল মাসে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকা'র সাথে সংঘটিত যুদ্ধে এবং একই সনের জ্বিলহাজ্জ মাসে সংঘটিত 'সাবীক' যুদ্ধে তিনি যোগদান করেননি। এ সময় রাসূল (সা) তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। রাসূল (সা) পনেরো দিন যাবত বনু কায়নুকা' অবরোধ করে রাখেন। এ সময় আবু লুবাবা মদীনায় ইমারতের দায়িত্ব পালন করেন।[৭]

হিজরী ৫ম সনে খন্দক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জা কুরাইশ বাহিনীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা) সহ মুসলিম বাহিনী নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসার পরই জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? বললেন ঃ হাঁ। জিবরীল (আ) বললেন ঃ কিন্তু ফেরেশতারা অস্ত্র রাখেনি। ইয়া মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনাকে বনু কুরায়জার দিকে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সে দিকেই যাচ্ছি এবং তাদেরকে নাড়া দিচ্ছি। রাসূল (সা) তখন জুহরের নামায শেষ করে মাত্র ঘরে ফিরছেন।

জিবরীলের (আ) এ কথার পর রাসূল (সা) সাথে সাথে ঘোষণা দিলেন ঃ বনু কুরায়জা পৌঁছা ছাড়া কেউই 'আসর নামাজ পড়বে না। ঘোষণা অনুযায়ী সবাই বনু কুরায়জায় পৌঁছে। দীর্ঘ ২৫ রাত তাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয় এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণের আহবান জানানো হয়। অবশেষে আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দেন। তারা তাদের পুরাতন বন্ধু হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজের (রা) শালিশী মেনে নিতে রাজী হয়।

মদীনার আউস গোত্রের বনু 'আমর ইবন 'আওফ শাখার সাথে বনু কুরায়জার সেই জাহিলী যুগ থেকে মৈত্রী চুক্তি ছিল। আবু লুবাবা ছিলেন এ গোত্রেরই লোক। এ কারণে তারা অবরুদ্ধ অবস্থায় রাসূলুল্লাহর নিকট আবেদন জানায় ঃ আমাদের কাছে আবু লুবাবাকে পাঠান, আমরা তাঁর সাথে একটু পরামর্শ করতে চাই। রাসূল (সা) তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং আবু লুবাবাকে তাদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন।

আবু লুবাবা বনু কুরায়জায় পৌঁছালে ইহুদীরা তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। তারা আবু লুবাবার নিকট তাদের সমস্যা তুলে ধরে। ইহুদী নারী ও শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে দিশেহারার মত তার সামনে এসে দাঁড়ায়। দৃশ্যটি ছিল সত্যিই হৃদয়বিদারক। আবু লুবাবার অন্তর কোমল হয়ে যায়। তারা আবু লুবাবাকে প্রশ্ন করে ঃ আমরা কি মুহাম্মাদের নির্দেশ মেনে নেব? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তবে সাথে সাথে নিজের গলার দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দেন যে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

আবেগের বশে এ ইঙ্গিত তো করে ফেললেন। কিন্তু সাথে সাথে এ উপলব্ধি জন্মালো যে, এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়েছে। তখন তাঁর পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। তিনি সেখান থেকে উঠে সোজা মসজিদে নববীতে চলে আসলেন এবং একটি মোটা ও ভারী বেড়ী দিয়ে নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে বললেন ঃ যতক্ষণ আল্লাহ আমার তাওবা কবুল না করেন, এভাবে বাঁধা অবস্থায় থাকবো।

এদিকে আবু লুবাবার ফিরতে দেরী দেখে একদিন রাসূল (সা) বললেন ঃ আবু লুবাবা কি তার মিশন শেষ করেছে? তখন লোকেরা রাসূলকে (সা) বিষয়টি অবগত করে। রাসূল

(সা) বললেন ঃ যা হোক, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। সে যদি সোজা আমার কাছে চলে আসতো, আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করতাম। মোটকথা, বিশ মতান্তরে দশ রাত বেড়ী বাঁধা অবস্থায় আবু লুবাবার অতিক্রান্ত হয়। নামায ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনের সময় তাঁর স্ত্রী বেড়ী খুলে দিতেন এবং প্রয়োজন শেষ হলে আবার বেঁধে দিতেন। পানাহার একেবারেই ছেড়ে দেন। শ্রবণ শক্তি কমে যায়, দৃষ্টি শক্তিও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। একদিন দুর্বলতার কারণে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আর তখনই আল্লাহর রহমত নাযিলের সময় হয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সে দিন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) ঘরে ছিলেন। প্রভাতের পূর্বেই আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (সা) একটু হেসে ওঠেন। তা দেখে হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সব সময় খুশী রাখুন। বলুন তো কি ব্যাপার? বললেন ঃ আবু লুবাবার তাওবা কবুল হয়েছে। উম্মু সালামা (রা) জানতে চাইলেন, আমি কি এ সুসংবাদ মানুষকে জানিয়ে দিতে পারি? রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ। তখনও হিজাবের আয়াত নাযিল হয়নি। উম্মু সালামা (রা) হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে লোকদেরকে বিষয়টি জানিয়ে দেন। লোকেরা আবু লুবাবাকে মুক্ত করার জন্য ছুটে যায়। কিন্তু তিনি বললেন, যখন রাসূল (সা) নিজে এসে খুলবেন কেবল তখনই আমি এ স্থান থেকে সরবো। রাসূল (সা) যখন ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে আসেন তখন নিজ হাতে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করেন।

তাওবা কবুল হওয়ায় হযরত আবু লুবাবা (রা) দারুণ খুশী হন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঐ বাড়ী ত্যাগ করতে চাই যেখানে আমি এ পাপে লিপ্ত হয়েছি। আমি আমার সকল সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে দিতে চাই। রাসূল (সা) বললেন ঃ সব নয় বরং এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তিনি এক-তৃতীয়াংশই দান করেন।

হযরত আবু লুবাবার (রা) এ তাওবার পশ্চাতে কি কারণ ছিল সে সম্পর্কে অবশ্য সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। মা'মার ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু লুবাবা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অপরাধে তাওবার এ পন্থা অবলম্বন করেন। হযরত ইবন 'আব্বাসও (রা) একথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, সূরা আত্‌তাওবার ১০২ নং আয়াত- 'আর কোন কোন লোক আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' আবু লুবাবাসহ আরও ৮/৯ জন সম্পর্কে নাযিল হয়। তারা তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করে মদীনায় থেকে যায়। তারপর অনুতপ্ত হয়ে সকলে তাওবা করে। তারা তাওবার পদ্ধতি হিসেবে নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে ফেলে। অতঃপর তাদের তাওবা কবুল হয়। তাদের সবচেয়ে ভালো কাজ এ তাওবা এবং সবচেয়ে মন্দকাজ তাবুকে যোগদান না করা।

আবু 'আমরের মতে তাবুকের ঘটনায় নয়; বরং বনু কুরায়জার ঘটনায় আবু লুবাবা এ তাওবা করেন। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল আনফালের ২৭ নং আয়াত- 'হে

ঈমানদারগণ! খিয়ানত করোনা আল্লাহর সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খিয়ানত করোনা নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে’ নাযিল হয়। আবু ’আমরসহ অনেকের মতে আবু লুবাবা তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যে সকল মুসলমান বিনা কারণে তাবুকে যোগদান করেননি তাঁদের সংখ্যা মাত্র তিন। তাঁরা হলেন ঃ মুরারা ইবন রাবী’, হিলাল ইবন উমাইয়্যা এবং কা’ব ইবন মালিক (রা)। তাঁদের সাথে আবু লুবাবাকে যুক্ত করা ঠিক নয়। কারণ, সূরা আত্ তাওবার ১১৮ নং আয়াতে উপরোক্ত তিনজনের কথাই বলা হয়েছে ঃ ‘এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই— অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে।[৮]

হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয় অভিযানে বনু ’আমর ইবন ’আওফের ঝান্ডা ছিল হযরত আবু লুবাবার (রা) হাতে। এছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে দারুণ মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি হযরত ’আলীর (রা) খিলাফতকালে মারা যান। আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ’উসমানের (রা) শাহাদাতের পর তিনি মারা যান। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, হিজরী ৫০ সন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।[৯] মৃত্যুকালে সায়িব ও আবদুর রহমান নামে দু’টি ছেলে রেখে যান।

হযরত আবু লুবাবা ছিলেন একজন অতি মর্যাদাবান সাহাবী। তিনি বহু বছর রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যের সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু বাণী শুনে থাকবেন। কিন্তু তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাহাবীও আছেন। যেমন ঃ হযরত ’আবদুল্লাহ ইবন ’উমার (রা)। তাছাড়া তাবেঈদের প্রথম তাবকার অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

’আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ ইবন জাবির, আবু বকর ইবন ’আমর ইবন হাযাম, সা’ঈদ ইবন মুসাইয়্যাব, ’আবদুর রহমান ইবন কাব ইবন মালিক, সালেম ইবন ’আবদিল্লাহ, ’উবাইদুল্লাহ ইবন আবী ইয়াযিদ, নাফে মাওলা ইবন ’উমার, তাঁর দু’ছেলে- সায়িব ও ’আবদুর রহমান।[১০]

হযরত আবু লুবাবা (রা) ইসলামের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ পূর্ণরূপে মেনে চলতেন। মানবিক দুর্বলতার কারণে কক্ষণো কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তা বুঝতে পারার সাথে সাথে একনিষ্ঠভাবে তাওবা করতেন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আবু লুবাবা (রা) বনু কুরায়জার ব্যাপারে যে ভুল করেছিলেন এবং তাতে তাঁর চরিত্র যতখানি ম্লান হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল করেছিল তাঁর তাওবা। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাঁর তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দিয়ে

অহী নাযিল করেছেন, আর আল্লাহর রাসূল (সা) সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ হাতে তাঁর বন্ধন খুলে দিয়েছেন। আবু লুবাবার (রা) এর চেয়ে বড় মর্যাদা এবং পাওয়া আর কি আছে? প্রকৃতপক্ষে অনুতপ্ত তাওবাকারী অপরাধী আল্লাহর অতি প্রিয়। তিনি অতি খুটিনাটি বিষয়েও রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের ওপর আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে সাপ মারার হাদীস শুনেছিলেন। এ কারণে সাপ দেখলই মেরে ফেলতেন। আবু লুবাবার (রা) বাড়ীটি ছিল তাঁরই বাড়ীর একেবারে লাগোয়া। একদিন তিনি ইবন 'উমারকে (রা) বললেন, আপনার বাড়ীর দরজাটি একটু খুলুন, আমি এ পথেই মসজিদে যাব। ইবন 'উমার (রা) উঠে যেইনা দরজা খুলেছেন, অমনি একটি সাপ দেখতে পেলেন। ইবন 'উমার (রা) মারার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আবু লুবাবা (রা) তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ রাসূল (সা) ঘরের সাপ মারতে নিষেধ করেছে।[১১]

আবু নু'য়াইম তাঁর আদ-দালায়িল' (১৬০) গ্রন্থে আবু লুবাবার একটি বর্ণনা এনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূল (সা) এক জুম্মার দিন মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি দাও। আবু লুবাবা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! খেজুর তো শুকানোর জন্য উঠোনে রয়েছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি দাও যতক্ষণ না আবু লুবাবা ল্যাংটা হয়ে ওঠে এবং নিজের পাজামা দিয়ে তার উঠোনের পানির নালা বন্ধ করে। তারপর এত বৃষ্টি হতে থাকে যে, লোকেরা আবু লুবাবাকে বললো ঃ রাসূল (সা) তোমার সম্পর্কে যা বলেছেন তা না করা পর্যন্ত বৃষ্টি থামবে না। আবু লুবাবা তাই করলেন। বৃষ্টিও থেমে গেল।[১২]

এভাবে আবু লুবাবার (রা) জীবনের অনেক টুকরো টুকরো কথা সীরাতের গ্রন্থ সমূহের পাতায় ছড়িয়ে আছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা-৪/১৬৮; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৮৮; ২/৪৫
২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১
৩. আল-ইসাবা-৪/১৬৮
৪. আল-বিদায়া-৩/২৬১; হায়াতুস সাহাবা-২/৬০৩
৫. আল-ইসাবা-৪/১৬৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬১২, ৬৮৮;
   আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৯, ২৯৪
৬. আল-ইসতীয়াব-৪/১৬৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬১২, ৬৮৮
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৩০৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৫, ৪৯
৮. আবু লুবাবার (রা) এ ঘটনা বিস্তারিত জানার জন্য দ্রঃ 'আল্লামা ইবন কাসীরের সীরাতু নবী' ২/৮-১৮ পৃঃ, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৪-৩৩৮, ৫৩১ পৃঃ ফাতহুল বারী-৭/২৯১; আল-বিদায়া-৪/১১৯; আল-ইসাবা-৪/১৬৮; আল-ইসতীয়াব-৪/১৬৮; হায়াতুস সাহাবা-২/১৮০, ৩৬৫
৯. আল-ইসাবা-৪/১৬৮
১০. প্রাগুক্ত-৪/১৬৮
১১. মুসনাদ-৩/৪৫২, ৪৫৩
১২. আল-বিদায়া-৬/৯২

যায়িদ ইবন আরকাম (রা)

ভালো নাম যায়িদ। কুনিয়াত বা ডাক নামের ব্যাপারে দারুণ মতভেদ আছে। যেমন ঃ আবু 'উমার, আবু 'আমের, আবু সা'দ, আবু সা'ঈদ, আবু 'উনাইস ইত্যাদি।[১] পিতা আরকাম ইবন যায়িদ। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু হারিস শাখার সন্তান। একজন আনসারী সাহাবী। খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ছিলেন একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী। সম্পর্কে তিনি যায়িদের চাচা। তিনি পিতৃহারা যায়িদকে তত্ত্বাবধানে নেন এবং লালন পালন করেন।[২] 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) 'আকাবার বাইয়াতে (শপথ) শরীক ছিলেন। মূলতঃ তাঁরই প্রভাবে হযরত যায়িদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত যায়িদ উহুদ যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার বয়স না হওয়ায় হযরত রাসূলে কারীম (রা) তাঁকে বিরত রাখেন। সর্ব প্রথম খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তবে একথাও বর্ণিত আছে যে, 'আল-মুরাইসী' তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধ। এরপর থেকে সকল অভিযান ও যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগদান করেন। সহীহ আল বুখারীতে এভাবে তাঁর বর্ণনা আছে, 'রাসূল (সা) মোট উনিশটি যুদ্ধ করেছেন, তারমধ্যে আমি সতেরটিতে (১৭) শরীক ছিলাম।'[৩]

মূতার যুদ্ধে চাচা 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) সংগে গিয়েছিলেন। চাচা-ভাতিজা দু'জনেই ছিলেন একই উটের ওপর আরোহী। চাচা ইবন রাওয়াহা ছিলেন বড় মাপের কবি। তিনি পথ চলতে চলতে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন যাতে তাঁর শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খা প্রকাশ পায়। যায়িদ কবিতাটি শুনে কাঁদতে শুরু করেন। ইবন রাওয়াহা ছড়ি ঝাঁকিয়ে বলে ওঠেন, 'ওরে ছোটলোক, আমার শাহাদাতের ভাগ্য হলে তোর ক্ষতি কি?[৪]

খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত 'আলীর (রা) সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সিফ্‌ফীন যুদ্ধে 'আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন। তাঁকে 'আলীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়।[৫]

হযরত যায়িদ (রা) শেষ জীবনে কূফার বনু কিন্দা মহল্লায় বাড়ী করে বসতি স্থাপন করেন। এ কূফা শহরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে কিছু মতান্তর আছে। অনেকের মতে, আল-মুখতার আস-সাকাফীর বিদ্রোহের সময় হিজরী ৬৬ সনে মারা যান। তবে আল-হায়সাম ইবন 'আদী এবং আরো অনেকের মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ৬৮ সন। অনেকে একথাও বলেছেন যে হযরত আল-হুসাইনের (রা) শাহাদাতের অল্প কিছু দিন পর তাঁর মৃত্যু হয়।[৬]

হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন তাঁর সময়ের জ্ঞান, মর্যাদা ও সম্মানের একটি কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসতো। এক ব্যক্তিতো

'কিসতাস'-এর শেষ প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছিল তাঁর কাছে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে।[৭] তিনি যেখানেই যেতেন, হাদীসের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিরা তাঁর পাশে ভীড় জমাতো। একবার বসরা মতান্তরে মক্কায় গেলে হযরত 'আব্বাস (রা) বললেন, অমুক হাদীসটি যা আপনি বর্ণনা করে থাকেন, আবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।[৮] একবার 'আতিয়্যা আল- 'আওফী এসে বললেন, আপনি অমুক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমার আসার উদ্দেশ্য হলো, আপনার মুখ থেকেই হাদীসটি শোনা। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করলে 'আতিয়্যা বললেন, আপনি এ বাক্যটিও তো বলেছিলেন - আমি যেমন শুনেছি, তেমনই তোমাকে বর্ণনা করবো।[৯]

হাদীস ছাড়াও যে সকল দু'আ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনে মুখস্ত করেছিলেন, মানুষকে শিখাতেন। একবার লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ এগুলি রাসূল (সা) আমাদেরকে শিখাতেন, তাই আমরা তোমাদেরকে শিখাচ্ছি। তাঁর বর্ণিত বহু দু'আ হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে।[১০]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত যায়িদ (রা) দারুণ সতর্ক ছিলেন। আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা বলেন ঃ আমরা তাঁর কাছে এসে আবেদন জানাতাম, আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করুন। বলতেন ঃ আমি এখন বুড়ো হয়েছি এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করা বড় কঠিন কাজ।[১১]

একবার ইয়াযীদ ইবন হায়্যান, হুসাইন ইবন সাবরা ও 'আমর ইবন মুসলিম হাদীস শোনার জন্য তাঁর কাছে যান। প্রথমে তাঁরা যায়িদের (রা) প্রশংসা করে বলেন, আল্লাহ আপনাকে বড় ফজীলাত দিয়েছেন। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) কামালিয়্যাত (পূর্ণতা) প্রত্যক্ষ করেছেন। হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধে গেছেন এবং তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছেন। এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কি হতে পারে? আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীস শোনান। জবাবে যায়িদ (রা) বললেন ঃ ভাতিজা, আমি এখন বুড়ো হয়েছি, সে সময়ও চলে গেছে। অনেক কথাই আজ স্মৃতি ও স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। হাদীসের একটি বড় ভান্ডার আজ ভুলে গেছি। এখন আমি যা কিছু বর্ণনা করি তাই শোন। যা নেই তার জন্য আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের উচিত হবে না।[১২]

এ কারণে হযরত যায়িদের (রা) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র নব্বই (৯০)টি। তিনি হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও 'আলীর (রা) মুখ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাই বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর সূত্রে যে সকল সাহাবী ও তাবে'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন, এখানে তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস, আবুততুফাইল, আবু 'উসমান আন-নাহদী, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, 'আবদে খায়র আল-হামাদানী, তাঊস, নাদার ইবন আনাস, আবু 'উমার শায়বানী, আবুল মিনহাল, আবদুর রহমান ইবন মুতয়িম, আবু ইসহাক আস-সুবা'ঈ, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী, আবু হামযা তালহা ইবন

ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিস আল-বসরী, কাসেম ইবন 'আওফ, আতিয়্যা আল-আওফ, আবু মুসলিম আল -বাজালী প্রমুখ।[১৩]

হযরত যায়িদের (রা) মধ্যে ইসলামের রূহানী বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় বনু মুসতালিক যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনায়। ঘটনাটি সংক্ষেপে এরূপ ঃ

বনু আল-মুসতালিক-এর সংরক্ষিত জলাশয়ের নাম আল-মুরাইসী।' ইবন ইসহাকের মতে হিজরী ৬ এবং মূসা ইবন 'উকবার মতে ৪ সনে এ জলাশয়ের পাশে রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মুসলিম, বাহিনীর এক যুদ্ধ হয়। যা ইতিহাসে 'আল-মুরাইসী'র যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে বনু মুসতালিফ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।[১৪]

রাসূল (সা) তাঁর বাহিনীসহ এ জলাশয়ের পাশে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সৈনিকরা এখান থেকেই পশুকে পানি পান করাতো। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) ছিল জাহ্‌জাহ্ ইবন মাস'উদ নামে বনু গিফার গোত্রের এক মজুর। তিনি 'উমারের (রা) ঘোড়াটি চরাতেন। একদিন ঘোড়াটিকে পানি পান করাতে গিয়ে 'আওফ ইবন খাযরাজের হালীফ বা বন্ধু সিনান ইবন ওয়াবার আল-জুহানীর সাথে তাঁর ঝগড়া বাঁধে এবং তা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌছে। আল-জুহানী আনসারদের সাহায্য চেয়ে চিৎকার জুড়ে দেন। জাহ্‌জাহ্‌ও বসে থাকলেন না। তিনিও মুহাজিরদের সাহায্য চেয়ে আওয়াজ দেন। মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল এতে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়। তখন তার নিকট তার গোত্রের একদল লোক উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে যায়িদ ইবন আরকামও ছিলেন। তিনি তখন একজন তরুণ ব্যক্তি।

'আবদুল্লাহ ইবন উবাই সুযোগ বুঝে তার গোত্রীয় লোকদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ মুসলিম মুহাজিররা আমাদের সাথে এমন আচরণ করলো? আমাদেরই ভূমিতে তারা আমাদেরকে ঘৃণা করছে এবং আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেড়ে গেছে। মুহাজিরদের ব্যাপারটি যেন, 'খাইয়ে মোটাতাজা করা সেই পালিত কুকুরের মত যে তার প্রভুকে খেয়ে ফেলে।' আল্লাহর কসম, মদীনায় ফিরতে পারলে আমরা তথাকার অভিজাতরা এই ইতরদেরকে বিতাড়িত করে ছাড়বো। মূলতঃ এটা তোমাদেরই কর্মফল। তোমাদের মাতৃভূমির দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিয়েছো। তোমাদের সম্পদ তাদেরকে ভাগ করে দিয়েছো। আল্লাহর কসম, তোমাদের যা আছে তা যদি তোমরা তাদেরকে দেওয়া বন্ধ করে দাও তাহলে তারা (মুহাজিররা) তোমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।' মুনাফিক ইবন উবাই এভাবে তার গোত্রীয় লোকদের সুপ্ত অনুভূতিতে আঘাত করে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করলো না। যায়িদ ইবন আরকাম (রা) চুপ করে তার সব কথা শুনলেন। তাঁর ঈমানী চেতনা তাঁকে এ মুনাফিকের কথাগুলি চেপে রাখতে দিলোনা। যদিও ইবন উবাই ছিল তাঁর স্বগোত্রীয় লোক।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যুদ্ধের ব্যস্ততা শেষ করে একটু বিশ্রামে আছেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন তাঁর কাছে বসা। এ সময় যায়িদ (রা) উপস্থিত হলেন এবং সব কথা খুলে বললেন। 'উমার (রা) রাগে ফেটে পড়লেন এবং রাসূলকে (সা) পরামর্শ দিলেন ঃ আপনি ইবন উবাইকে হত্যা করার জন্য 'আব্বাদ ইবন বিশরকে নির্দেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'উমার, লোকে যখন বলাবলি করবে, মুহাম্মাদ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করেন তখন কি হবে? না তা হয়না। তুমি বরং লোকদেরকে এখান থেকে চলার কথা জানিয়ে দাও। সাধারণত রাসূল (সা) এমন সময় যাত্রা শুরু করতেন না। ঘোষণা অনুযায়ী লোকেরা যাত্রা শুরু করলো।

এ দিকে মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই যখন জানলো, যায়িদ ইবন আরকাম তার সব কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছে দিয়েছে তখন সে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ছুটে এসে হলফ করে বললো ঃ যায়িদ যা বলেছে তার কিছুই আমি বলিনি। এমন কোন কথাই আমি উচ্চারণ করিনি। সে ছিল তার গোত্রের একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি। তাই যে সকল আনসার সাহাবী তখন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সম্ভবত এ তরুণ ইবন উবাইয়ের কথা বুঝতে ভুল করেছে এবং তার মূল বক্তব্য মনে রাখতে পারেনি। এভাবে তাঁরা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কথা বিশ্বাস করে তার পক্ষে সাফাই গাইলেন। যায়িদের (রা) চাচা 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও (রা) তাঁকে তিরস্কার করলেন।

ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূল (সা) আল-মুরাইসী থেকে যাত্রা করলেন। উসাইদ ইবন হুদাইর এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি তো এমন অসময়ে বের হন না। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমাদের সাথী যে কথা বলেছে তা কি তোমার কানে পৌঁছেনি? বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন সাথীর কথা বলছেন? বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই। সে কি বলেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সা) যা শুনেছিলেন তাই তাঁকে বললেন। উসাইদ তখন বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনি চাইলে তো তাকেই বের করে দিতে পারবেন। সেই ইতর, আর আপনি তো সম্মানিত ও শক্তিশালী। এরপর তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন উবাইর প্রতি করুণা করার জন্য রাসূলকে (সা) অনুরোধ করেন।

এরপর রাসূল (সা) হিজাযের 'বাকয়া' নামক উঁচু ভূমিতে যাত্রা বিরতি করেন। আর সেখানেই সূরা 'আল-মুনাফিকুন' নাযিল হয়। এতে আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও তার মত অন্য মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিল। আর সেই সাথে ঘোষিত হয়েছে হযরত যায়িদের (রা) নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা। সূরাটি যেভাবে শুরু হয়েছে তা বুঝার জন্য এখানে প্রথম দু'টি আয়াতের অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ

"মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে।

অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।"

সূরা আল-মুনাফিকুন নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা) হযরত যায়িদের (রা) কান ধরে বলেন- 'এ সেই ব্যক্তি যার কান আল্লাহর হক পূর্ণরূপে আদায় করেছে।'

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আল মুরাইসী থেকে সফর শুরু করার পর হযরত যায়িদ (রা) বারবার রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কুরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়িদ ইবন আরকাম দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহর (রা) মধ্যে ওহী নাযিলের সময়ের লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তিনি আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহর (সা) এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়িদ (রা) বলেন ঃ আমার সাওয়ারী রাসূলুল্লাহ (সা) কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সাওয়ারীর ওপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ 'হে বালক, আল্লাহ তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন।'

এ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু ইমাম বাগভীর (রহ) বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং যায়িদ ইবন আরকাম (রা) অপমানের ভয়ে ঘরে আত্মগোপন করেন তখন এই সূরা নাযিল হয়।[১৫]

তিনি সুন্নাতে নাবাবীর অনুসরণে বিন্দুমাত্র হেরফের করতেন না। জানাযার নামাযে তিনি চারতাকবীর বলতেন। একবার পাঁচ তাকবীর বললেন। এক ব্যক্তি হাত টেনে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, ভুল করেননি তো? বললেন ঃ এটাও রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত। আমি একেবারেই ছেড়ে দিই কিভাবে?[১৬]

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (রা) অতি ঘনিষ্ঠজন। কোন সময় অসুস্থ হলে রাসূল (সা) তাকে দেখতে যেতেন।[১৭] একবার তিনি চোখের রোগে আক্রান্ত হলেন। রাসূল (সা) দেখতে গেলেন। সেরে ওঠার পর রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইবন আরকাম! তোমার রোগ যদি না সারতো, কি করতে? বললেন ঃ সবর করতাম এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় থাকতাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ এমন করলে পাপমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে।[১৮] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ এ রোগে তোমার কোন ক্ষতি হবেনা। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর যদি তুমি বেঁচে থাক এবং অন্ধ হয়ে যাও তাহলে কি করবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি তখন সবর করবো এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় থাকবো। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। রাসূলুল্লাহর (সা) মৃত্যুর পর হযরত যায়িদ (রা) অন্ধ হয়ে যান।[১৯]

কারও সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন আচরণ ও মন্তব্য থেকে তিনি সব সময় বিরত থাকতেন। আর কারও মধ্যে এ ত্রুটি দেখতে পেলে তার প্রতিবাদ করতেন। একবার

হযরত আলী (রা) সম্পর্কে হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) একটি অশোভন উক্তি করেন। সাথে সাথে হযরত যায়িদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) মৃতদেরকে খারাপ বলতে নিষেধ করেছেন। 'আলী (রা) মারা গেছেন। এখন তাঁকে খারাপ বলছেন কেন ?

মানুষের বিপদ মুসীবতে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ছিল তাঁর স্বভাব। হাররার ঘটনায় হযরত আনাসের এক ছেলে এবং তাঁর কিছু আত্মীয়-বন্ধু মারা যান। হযরত যায়িদ (রা) সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে আনাসের (রা) কাছে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেনঃ আমি আপনাকে আল্লাহর সুসংবাদ শুনাচ্ছি। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ, আনসার, তাদের সন্তান-সন্তুতি, অধঃস্তন পুরুষ, তাদের নাতি-নাতিনী এবং তাদের সকল ছেলে-মেয়েদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।[২০]

তিনি তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও গুণাবলীকে অত্যন্ত উদার চিত্তে স্বীকৃতি দিতেন। একারণে কেউ কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে তাঁকে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন। একবার আবুল মিনহাল আসলেন তাঁর কাছে 'বায় 'সারফ' সম্পর্কে কিছু জানার জন্য। তিনি বললেন ঃ বারা'-এর কাছে যাও। তাঁকে জিজ্ঞেস করো। এ ব্যাপারে তিনি আমার চেয়ে ভালো এবং বড় 'আলিম। আবুল মিনহাল বারা'-এর কাছে গেলেন। তিনি মাসয়ালার জবাব দিয়ে বললেন ঃ আমি যা বলেছি, এর সত্যতা যাচাই করে নিবে যায়িদ ইবন আরকামের নিকট থেকে। তিনি আমার চেয়ে বেশী এবং ভালো জানেন।

আমীর-উমারাদের সাথে তাঁর উঠা-বসা ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হযরত যায়িদ ইবন আরকাম ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিশ্বাস এবং ইবাদাত সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাহল্লাহ' পাঠ করবে, সে জান্নাতে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ নিষ্ঠার সাথে পাঠ করার অর্থ কি? বললেন ঃ আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত থাকা।[২২]

একবার কিছু লোক কুবার মসজিদে চাশতের নামায পড়ছিলো। ঐ পথে কোথাও যাচ্ছিলেন। লোকদের নামায পড়তে দেখে বললেন, সম্ভবত তাদের জানা নেই যে, এ নামাযের জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৭; উসুদুল গাবা-২/৩১৯

২. আল-ইসাবা-১/৫৬০; উসুদুল গাবা-২/৩১৯

৩. বুখারী-২/৫৬৩; উসুদুল গাবা-২/৩১৯; তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল-১০/১০; আল-ইসাবা-১/৫৬০

৪. আল-বিদায়া-৪/২৪৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩২ আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৮
৫. আল-ইসাবা-১/৫৬০; তাহজীবুল কামাল-১০/১১
৬. উসুদুল গাবা-২/৩২০; তাহজীবুল কামাল-১০/১১-১২, আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৭; তাবাকাত-৬/১৮
৭. তাবাকাত-৪/৩৭২
৮. প্রাগুক্ত-৪/৩৬৭
৯. প্রাগুক্ত-৪-৩৯৮
১০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৫১, ৩৬৭
১১. মুসনাদ-৪/৩৭০; কানযুল 'উম্মাল-৫/২৩৯; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৪১,
১২. মুসনাদ-৪/৩২৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৪৩
১৩. আল-ইসাবা-১/৫৬০; 'তাহজীবুল কামাল' গ্রন্থকার যায়িদ (রা) থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, এমন বিখ্যাত ২৯ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্রঃখ, ১০, পৃঃ ১০-১১
১৪. সহীহ বুখারী ঃ বাবু গাযওয়াতু বনী আল-মুসতালিক।
১৫. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ বুখারী-৬/১৮৯, ১৯০, ১৯১; তিরমিযী-৩৩১৪; মুসলিম-২৭৭২; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯০-২৯২; ইবন কাছীরের আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা-২/৪৮-৫০; উসুদুল গাবা-২/৩১৯; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৭; তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআন ঃ সূরা আল-মুনাফিকুন।
১৬. মুসনাদ-৪/৩৬০, ৩৭০
১৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৫০৮
১৮. মুসনাদ-৪/৩৭৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮৪; আল-আদাবুল মুফরাদ-৭৮
১৯. কানযুল 'উম্মাল-২/১৫৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৫৮
২০. মুসনাদ-৪৩৭০
২১. কানযুল 'উম্মাল-৫/২৪১; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৩ আল-ইসাবা-১/৫৬০
২২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-৩/৭৪; হায়াতুস সাহাবা/২৯২

যায়িদ ইবন সাবিত (রা)

রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত যায়িদ (রা)-এর বেশ কয়েকটি উপনাম বা ডাকনাম সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। যেমন ঃ আবু সাঈদ, আবু খারিজা, আবু 'আবদির রহমান ও আবু সাবিত।[১] মুসলিম উম্মাহ তাঁকে অনেকগুলি উপাধিতে ভূষিত করেছে। যেমনঃ হাবরুল উম্মাহ, কাতিবুল ওহী ইত্যাদি। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। পিতা সাবিত ইবন দাহহাক এবং মাতা নাওয়ার বিনতু মালিক।[২] নাওয়ার ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) খান্দানের মেয়ে।

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পূর্বে মদীনার অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে যে সব রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও সংঘর্ষ হয় তার মধ্যে 'বুয়াস' যুদ্ধটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধে যায়িদের পিতা সাবিত নিহত হন। এটা হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। তখন যায়িদের বয়স মাত্র ছয় বছর। তিনি মায়ের তত্ত্বাবধানে বড় হন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিযরতের সময় যায়িদ এগারো বছরের এক বালক মাত্র।[৩]

তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মদীনায় ইসলামের ভিত্তি খুব একটা মজবুত হয়নি। মক্কা থেকে হযরত রাসূলে করীম (সা) প্রেরিত মুবাল্লিগ হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর (রা) যখন মদীনায় ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে চলেছেন তখন কোন এক সময়ে অতি অল্প বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বালেগ হওয়ার পূর্বে ঈমান আনা যদি কোন গৌরবের বিষয় হয় তাহলে হযরত যায়িদ সেই গৌরবের অধিকারী। জীবনের সূচনা থেকেই এভাবে তিনি শিরকের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই কুরআন পড়তে শুরু করলেন। মানুষও তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তিনি ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী।[৪] রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসলেন। তখন তিনি কুরআনের সতেরটি সূরার হাফেজ। লোকেরা তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে নিয়ে গেল এবং এই বলে পরিচয় করে দিল যে, ছেলেটি নাজ্জার গোত্রের। এরই মধ্যে সে সতেরটি সূরার পাঠ শেষ করেছে। রাসূল (সা) তাঁর মুখ থেকে কুরআন তিলওয়াত শুনে খুব খুশী হলেন।[৫] যায়িদ বলেন ঃ তখন আমার বয়স মাত্র এগার বছর।[৬]

বদর যুদ্ধের সময় তিনি তের (১৩) বছরের এক বালক মাত্র। যুদ্ধে যাওয়ার বয়স তখনো হয়নি। তবুও আনসার ও মুহাজিরগণ যখন বদরের দিকে যাত্রা করলেন তখন এ বালকও যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরই মত ছোটদের একটি দলের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যুদ্ধের বয়স না হওয়ার কারণে রাসূল (সা) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে দেন।[৭]

হযরত যায়িদ সর্ব প্রথম কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা তিনি উহুদে যোগদান করেন। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধ। তখন তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার বয়স ষোল পূর্ণ হয়ে গেছে। আবার অনেকে বলেছেন, খন্দক তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধ।[৮] আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, যায়িদ ইবন সাবিত বলেন ঃ আমাকে বদর ও উহুদে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। খন্দকে প্রথম অনুমতি পাই।[৯] ইবন হিশামও বলেন, তাঁর বয়স কম হওয়ায় রাসূল (সা) অন্যদের সাথে তাঁকেও উহুদে ফিরিয়ে দেন।[১০]

হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থে যায়িদ ইবন সাবিতের একটি বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। তাদ্বারা বুঝা যায়, তিনি উহুদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ উহুদের দিন যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা) আমাকে সা'দ ইবনুর রাবীকে খুঁজতে পাঠালেন। যাবার সময় বলে দিলেন ঃ যদি তাঁকে পাও, আমার সালাম জানাবে। আর তাকে বলবে- রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে চেয়েছেন, তুমি নিজেকে কেমন দেখতে পাচ্ছো?

যায়িদ বলেন ঃ আমি শহীদদের মাঝে ঘুরে ঘুরে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। এক সময় পেয়ে গেলাম। তখন তাঁর অন্তিম মুহূর্ত। সারা দেহে তাঁর তীর, বর্শা ও তরবারির সত্তরটি (৭০) আঘাত। বললাম ঃ সা'দ রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তোমার কেমন মনে হচ্ছে তা জানতে চেয়েছেন।

সা'দ বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সালাম এবং তোমার প্রতিও। তুমি বলবে, আমি জান্নাতের খোশবু লাভ করছি।[১১]

যাইহোক, খন্দক যুদ্ধে যে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যায়িদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাকে খন্দকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন এবং এক খন্ড কুবতী (মিসরীয় সূক্ষ্ম ও শুভ্র) বস্ত্রও দান করেন।[১২] খন্দক খনন ও মাটি বহনে অংশ নেন। এ অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টিতে পড়লে তিনি মন্তব্য করেন ঃ 'বেশ ভালো ছেলে তো।'[১৩] ঘটনাক্রমে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় 'আম্মারা ইবন হাযাম একটু রসিকতা করে তাঁর কাঁধ থেকে অস্ত্র সরিয়ে নেন। যায়িদ টের পেলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) কাছেই ছিলেন। তিনিও একটু রস করে ডাক দিলেন ঃ 'ইয়া আবা রুকাদ!' ওহে নিদ্রাকাতর ব্যক্তি, ওঠো। তারপর তিনি লোকদের এ ধরনের মশকারা করতে নিষেধ করে দেন।[১৪] এই খন্দক থেকে নিয়ে পরবর্তীকালের সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।[১৫]

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত যায়িদের (রা) গোত্র মালিক ইবন নাজ্জারের ঝান্ডা প্রথম ছিল 'আম্মারা ইবন হাযামের হাতে। পরে রাসূল (সা) সেটি যায়িদের হাতে অর্পণ করেন। এতে 'আম্মারা মনে করেন, হয়তো তাঁর কোন ত্রুটি হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোন ত্রুটি হয়েছে কি? তিনি জবাব দেন ঃ না, তেমন কিছু নয়।

আমি কুরআনের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে একাজ করেছি। যায়িদ তোমার চেয়ে বেশী কুরআন পড়েছে। কুরআনই অগ্রাধিকারযোগ্য।[১৬]

খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফাতকালে ভন্ড নবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার যুদ্ধ হয়। এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যায়িদও (রা) অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর গায়ে একটি তীর লাগে। কিন্তু তিনি মারাত্মক আঘাত থেকে বেঁচে যান।[১৭] খলীফা 'উমারের (রা) আমলে খাইবার থেকে ইহুদীদের বিতাড়নের পর তথাকার 'ওয়াদি-উল-কুরা' মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়। যায়িদও (রা) একটি অংশ লাভ করেন।[১৮]

খলীফা হযরত 'উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী তখন মদীনার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্রোহীদের সাথে লড়বার জন্য খলীফার অনুমতি চান। এ সময় যায়িদ ইবন সাবিতও (রা) খলীফার সাথে দেখা করে বলেন ঃ আনসাররা আপনার দরজায় হাজির। আপনি চাইলে তারা আবারও আল্লাহর আনসার হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত। খলীফা বললেন ঃ তোমরা যদি লড়াই করার ইচ্ছা করে থাক তাহলে তাতে আমার সম্মতি নেই।[১৯]

হযরত যায়িদ ইবন সাবিতের (রা) গোটা জীবন সৎকর্মের সমষ্টি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সেক্রেটারী। ওহী লিখতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি-পত্র লিখতেন এবং যে সব চিঠি-পত্র আসতো তা পাঠ করে শোনাতেন। পরবর্তীকালে খলীফা 'উমারেরও (রা) সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।[২০]

পবিত্র কুরআন ইসলামের মূল ভিত্তি। এর সংগ্রহ ও সংকলন করার মহা গৌরবের অধিকারী হলেন 'কাতিবুল ওহী' যায়িদ ইবন সাবিত (রা)।[২১] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকাল পর্যন্ত হাড়, চামড়া, খেজুরের পাতা ও মুসলমান হাফেজদের স্মৃতিতে কুরআন সংরক্ষিত ছিলো। বহু সাহাবী কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। এ সকল হাফেজদের মধ্যে যায়িদও (রা) একজন।

হযরত রাসূলের কারীমের (সা) ইনতিকালের পর আরব উপদ্বীপের একদল মানুষ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগ করা) হয়ে মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের দলে ভিড়ে যায়। সে ইয়ামামায় নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করে। হযরত আবু বকর (রা) তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। মুসায়লামা ইয়ামামার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। তবে এ যুদ্ধে ৭০ (সত্তর) জন হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন।

এ ঘটনার পর হযরত 'উমারের (রা) অন্তরে কুরআন সংগ্রহ করার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তিনি খলীফা আবু বকরকে (রা) বললেন, এভাবে হাফেজদের শাহাদাতের ধারা অব্যাহত থাকলে কুরআনের বিরাট অংশ এক সময় হারিয়ে যাবার আশংকা আছে। সুতরাং বিলম্ব না করে গোটা কুরআন এক স্থানে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নিন। খলীফা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি যায়িদ ইবন সাবিতকে ডেকে বলেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান নওজোয়ান। তোমার প্রতি সবার আস্থা আছে। তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ওহী লিখেছিলে। সুতরাং তুমিই এ কাজটি সম্পাদন কর।[২২]

হযরত যায়িদ (রা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম! তাঁরা আমাকে কুরআন সংগ্রহ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা করার চেয়ে একটি পাহাড় সরানোর দায়িত্ব দিলে তা আমার কাছে অধিকতর সহজ হতো।[২৩] তিনি খলীফাকে বললেন ঃ আপনি এমন কাজ করতে চান যা রাসূল (সা) করেননি। খলীফা বললেন ঃ তা ঠিক। তবে ভালো কাজে অসুবিধা কি? তারপরেও যায়িদ কাজটি করতে ইতস্তত করতে থাকেন। খলীফা বিভিন্নভাবে বুঝানোর পর তিনি রাজী হয়ে গেলেন।[২৪]

এ কাজে যায়িদকে সহযোগিতার জন্য খলীফা আবু বকর (রা) আরও একদল সাহাবাকে দিলেন। দলটির সংখ্যা ৭৫ (পঁচাত্তর) বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উবাই ইবন কা'ব ও সা'ঈদ ইবনুল 'আসও (রা) ছিলেন। হযরত যায়িদ খেজুরের পাতা, পাতলা পাথর ও হাড়ের ওপর লেখা আল কুরআনের সকল অংশ সংগ্রহ করলেন। হাফেজদের পাঠের সাথে তা মিলিয়ে দেখলেন। তিনি নিজেও আল কুরআনের একজন হাফেজ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে আল কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন।[২৫]

আয়াতের সত্যতা এবং বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে বিতর্ক ও ঝগড়ার পর্যায়ে চলে যেত। এক স্থানে পৌঁছে যায়িদ বললেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট 'রজমের' আয়াত থেকে শুনেছিলাম। হযরত 'উমার (রা) বললেন ঃ কিন্তু রাসূল (সা) তা লেখার অনুমতি দেননি।[২৬] মোট কথা কঠোর পরিশ্রম করে হযরত যায়িদ (রা) এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাপ্ত করেন। তাঁর দ্বারাই সম্পূর্ণ আল কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

একটি আয়াতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রমাণের নিয়ম ধরা হয়েছিল প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে কম পক্ষে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য। আয়াতটি ছিল হযরত আবু খুযায়মার (রা) নিকট। ইনি সেই আবু খুযায়মা যাঁর একার সাক্ষ্যকে রাসূল (সা) দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। একারণে হযরত যায়িদ উক্ত আয়াতটির ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন মনে করেননি। তাছাড়া আয়াতটি তাঁর নিজের জানা ছিল।[২৭]

হযরত যায়িদ (রা) কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত কুরআন মজীদের এ কপিটি খলীফা হযরত আবু বকর (রা) নিজের হিফাজতে রাখেন। তাঁর ইনতিকালের পর দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) হাত হয়ে তা তাঁরই কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রা) হাতে পৌঁছে এবং সেখানে সংরক্ষিত হয়।[২৮]

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে যখন আল কুরআনের পাঠে তারতম্য দেখা দেয় তখন হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) খলীফাকে পরামর্শ দেন যে, ইহুদী ও নাসারাদের ধর্মীয় গ্রন্থের মত আল কুরআনের ব্যাপারেও মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আপনি তা রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। খলীফাও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুধাবন করেন। তিনি হযরত যায়িদের (রা) সংগৃহীত আল কুরআনের কপিটি হযরত হাফসার (রা) নিকট থেকে

চেয়ে নেন। তারপর হযরত যায়িদ ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনুয্‌যুবাইর, সা'ঈদ ইবনুল 'আস ও 'আবদুর রহমান ইবনুল হারেস ইবন হিশাম (রা) এ চারজন বিশিষ্ট সাহাবীকে তার থেকে কপি করার নির্দেশ দেন। তাঁরা হযরত আবু বকরের (রা) ঐ মূল কপি থেকে পাঁচটি কপি নকল করেন। খলীফা 'উসমান (রা) এই কপিগুলি খিলাফতের পাঁচটি অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল কপিটি- যা 'মাসহাফে সিদ্দীকী' নামে প্রসিদ্ধ - আবার হযরত হাফসার (রা) নিকট ফিরিয়ে দেন।[২৯]

নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ওহী লেখার দায়িত্ব বিভিন্ন সাহাবীর ওপর অর্পণ করেছিলেন। এ সকল ভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম হলেন হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা)।

হযরত যায়িদ কলম, দোয়াত, কাগজ, খেজুরের পাতা, চওড়া ও পাতলা হাড়, পাথর ইত্যাদি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে যেতেন। যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, রাসূল (সা) বলে যেতেন, আর তিনি লিখে চলতেন। লেখা সম্পর্কে বিশেষ কোন নির্দেশ থাকলে রাসূল (সা) তা বলে দিতেন, আর যায়িদ তদানুযায়ী কাজ করতেন।

ইমাম বুখারী (রহ) আল-বারা' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যখন সূরা আন-নিসা'র ৯৫ নং আয়াতটি—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ

(গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে -সমান নয়।) নাযিল হলো তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ কাঠ, দোয়াত, হাড় নিয়ে যায়িদকে আমার কাছে আসতে বলো, যায়িদ এলে তিনি আয়াতটি লিখতে বললেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে তখন অন্ধ সাহাবী 'আমর ইবন উম্মে মাকতুম বসা ছিলেন। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে কি হুকুম? আমি তো একজন অন্ধ মানুষ। তখন- (যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই) অংশটি নাযিল হয়। তখন রাসূল (সা) যায়িদকে আয়াতটি এভাবে সাজিয়ে লিখতে বলেন ঃ[৩০]

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ

وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

যায়িদ পরে অবতীর্ণ অংশটুকু হাড়ের ফাটার মধ্যে লিখে নেন। কারণ, যে হাড়টির মধ্যে পূর্বে আয়াতটি লেখা হয়েছিল তা ফাটা ছিল।[৩১]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের সাথে সাথে আনসারদের মধ্যে খিলাফতের বিষয়টি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা 'সাকীফা বনী সায়িদা'য় সমবেত হন এবং তাঁদের নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা (রা)। তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিরা সেখানে বক্তৃতা করছিলেন এবং আনসারদের একটি বড় দল ছিলেন তাঁর সমর্থক। এ মজলিসে যায়িদ ইবন সাবিতও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু জনতার মতের বিরুদ্ধে তখন কথা বলা সহজ ছিল না। এ জন্য তিনি চুপ করে বসে থাকেন।

তারপর হযরত আবু বকর, 'উমার ও আবু 'উবাইদাহ (রা) 'সাকীফা বনী সায়িদা'-য় পৌঁছলেন এবং মুহাজিরদের পক্ষ থেকে 'উমার (রা) খিলাফতের বিষয়টি আলোচনা শুরু করলেন। তখন সর্ব প্রথম যে আনসারী ব্যক্তি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন তিনি যায়িদ ইবন সাবিত।

হযরত হুবাব ইবনুল মুনজির (রা) একজন আনসারী ও বদরী সাহাবী। তিনি যখন তাঁর বক্তৃতায় দুই আমীরের তত্ত্ব পেশ করে মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আপনাদের মধ্য থেকে একজন এবং আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন। এছাড়া আর কিছুতেই আপোষ হবেনা।' তখন যায়িদ ইবন সাবিত উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে এক নতুন তত্ত্ব দিলেন। তিনি বললেন ঃ 'রাসূল (সা) ছিলেন একজন মুহাজির। এখন ইমামও হবেন একজন মুহাজির। আর আমরা যেমন ছিলাম রাসূলের (সা) আনসার তেমনিভাবে এখন হবো ইমামের আনসার।' একথা বলে তিনি আবু বকরের (রা) একটি হাত ধরে আনসারদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'এই তোমাদের বন্ধু, তোমরা এর হাতে বাই'য়াত কর।'[৩২]

হযরত যায়িদের (রা) এ বক্তব্য ছিল তারই গোত্রের লোকদের বিপক্ষে। তা সত্ত্বেও স্বীয় অনুভূতি প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে হযরত আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। যদি এর বিপরীত কিছু বলা হতো তাহলে আমরা হয়তো মানতাম না।[৩৩]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় আসার পর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ ও এলাকার রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা ও গোত্র প্রধানদের চিঠিপত্র বিভিন্ন সময় তাঁর নিকট আসতে থাকে। যার বেশীর ভাগই হতো সুরইয়ানী ও ইবরানী (হিব্রু) ভাষায়। মদীনায় তখন এ দু'টি ভাষা জানতো শুধু ইহুদীরা। তাদের ছিল আবার ইসলামের সাথে চরম দুশমনী। এ কারণে উক্ত ভাষা দু'টি আয়ত্ত করা ছিল মুসলমানদের একান্ত প্রয়োজন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) এ প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করলেন। তিনি হযরত যায়িদের (রা) মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁকেই এ কাজের জন্য নির্বাচন করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত যায়িদের (রা) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হলো ঃ

রাসূল (সা) মদীনায় এলে আমাকে তাঁর সামনে হাজির করা হয়। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'যায়িদ, আমার জন্য তুমি ইহুদীদের লেখা শিখ। আল্লাহর কসম! তারা

আমার পক্ষ থেকে 'ইবরানী ভাষায় যা কিছু লিখে থাকে তার ওপর আমার আস্থা হয় না।' তাই আমি 'ইবরানী ভাষা শিখলাম। মাত্র আধা মাসের মধ্যে এতে দক্ষতা অর্জন করে ফেললাম। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) ইহুদীদেরকে কিছু লেখার দরকার হলে আমিই লিখতাম এবং রাসূলকে (সা) কিছু লিখলে আমিই তা পাঠ করে শুনাতাম।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ 'যায়িদ, তুমি কি সুরইয়ানী ভাষা ভালো জান? এ ভাষায় আমার কাছে চিঠি-পত্র আসে। বললাম ঃ না। তিনি বললেনঃ তাহলে এ ভাষাটি শিখে ফেল। এরপর আমি মাত্র সতের দিনে ভাষাটি শিখে ফেললাম।[৩৪]

যায়িদের (রা) এই সীমাহীন মেধা ও জ্ঞানের কারণে হযরত রাসূলে কারীম (সা) যাবতীয় লেখালেখির দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন। মুহাম্মাদ ইবন 'উমার বলেন ঃ যায়িদ আরবী ও 'ইবরানী- দু'ভাষাতেই লিখতেন।[৩৫] বালাজুরী বলেন ঃ সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন উবাই ইবন কা'ব আল-আনসারী। উবাই-এর অনুপস্থিতিতে যায়িদ এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা ওহী ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি-পত্রও লিখতেন।[৩৬] রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা) ও 'উমারের (রা) খিলাফত কালেও এ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তবে তখন কাজের চাপ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় মু'য়াইকিব আদ-দাওসীকে তাঁর সহকারী নিয়োগ করা হয়।[৩৭]

ইসলামী হুকুমতের একটি অতি মর্যাদাপূর্ণ দফতর হলো বিচার বা কাজা'। প্রসিদ্ধ মতে এ দফতরটি সৃষ্টি হয় হযরত ফারূকে আজমের খিলাফতকালে। রাসূল (সা) ও আবু বকরের (রা) আমলে পৃথকভাবে এ দফতরটি ছিল না। খলীফা হযরত উমার (রা) এর সূচনা করেন এবং হযরত যায়িদ ইবন সাবিতকে (রা) মদীনায় কাজী নিয়োগ করেন। তাবাকাত ইবন সা'দ ও আখবারুল কুজাত গ্রন্থে এসেছে ঃ 'উমার (রা) যায়িদকে কাজী নিয়োগ করেন এবং তাঁর ভাতাও নির্ধারণ করেন।[৩৮]

তখনও বিচারকের জন্য পৃথক 'আদালত ভবন বা বাড়ি নির্মাণ হয়নি। হযরত যায়িদের (রা) বাড়িই ছিল 'দারুল কাজা' বা বিচারালয়। ঘরের মেঝেতে ফরাশ বিছানো থাকতো। তিনি তার ওপর মাঝখানে বসতেন। রাজধানী মদীনা ও তার আশে পাশের যাবতীয় মামলা-মোকদ্দামা হযরত যায়িদের (রা) এজলাসে উপস্থাপিত হতো। এমন কি তৎকালীন খলীফা খোদ 'উমারের (রা) বিরুদ্ধেও এখানে মামলা দায়ের হয়েছে এবং তার বিচারও চলেছে।

ইমাম শা'বী বর্ণনা করেছেন। একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) ও হযরত উবাই ইবন কা'বের (রা) মধ্যে একটি বিবাদ দেখা দিল। হযরত যায়িদের (রা) এজলাসে মুকাদ্দামা পেশ হলো। বিবাদী হিসাবে খলীফা 'উমার (রা) আদালতে হাজির হলেন। আধুনিক যুগে যেমন আদালতে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানের বসার জন্য চেয়ার দানের নিয়ম হয়েছে, হযরত যায়িদও তেমনি খলীফাকে নিজের আসনের পাশে বসার স্থান করে দেন। কিন্তু

ইসলাম যে সাম্য ও সমতার বিধান কায়েম করেছিল, সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতেন। বিশেষত হযরত 'উমার (রা) তো এ ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। তিনি বিচারক হযরত যায়িদের (রা) এ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'এ হলো আপনার প্রথম অবিচার। আমাকে আমার প্রতিপক্ষের সাথে বসা উচিত।' অতঃপর বাদী-বিবাদী উভয়ে আদালতের সামনে এক সাথে বসেন।

মামলার শুনানী শুরু হলো। হযরত 'উবাই (রা) ছিলেন বাদী। তিনি ছিলেন একটি বিষয়ের দাবীদার; পক্ষান্তরে 'উমার (রা) ছিলেন অস্বীকারকারী। ইসলামী বিচার বিধি অনুযায়ী অস্বীকারকারীর ওপর কসম বা শপথ দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু হযরত যায়িদ (রা) খিলাফতের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাদীকে বললেন, যদিও নিয়ম নয়, তবুও আমি বলছি, আপনি আমীরুল মুমিনীনকে কসম দানের বিষয়টি মাফ করে দিন। একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন ক্ষোভের সাথে বললেন ঃ "যায়িদ ন্যায় বিচারক হতে পারবেনা, যতক্ষণ না 'উমার ও সাধারণ একজন মুসলমান তাঁর নিকট সমান হয়।'[৩৯]

তৎকালীন খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে যদিও একাধিক স্থানীয় 'বাইতুলমাল' ছিল, তবুও 'দারুল খিলাফা' মদীনায় ছিল কেন্দ্রীয় 'বাইতুলমাল'। হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন এই কেন্দ্রীয় বাইতুলমালের দায়িত্বশীল। হিজরী ৩১ সনে খলীফা হযরত 'উসমান (রা) তাঁকে এ দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এই 'বাইতুলমালের' কর্মচারীদের মধ্যে 'ওহাইব' নামে যায়িদের (রা) একজন দাসও ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান। নানা কাজে যায়িদকে (রা) সাহায্য করতেন।

একদিন তিনি 'বাইতুল মালে' কাজ করছেন। এমন সময় খলীফা 'উসমান (রা) সেখানে উপস্থিত হন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এ কে? যায়িদ বললেন ঃ আমার দাস। উসমান (রা) বললেন ঃ আমাদের নিকট তার অধিকার আছে। কারণ সে মুসলমানদের সাহায্য করছে। মূলতঃ তিনি 'বাইতুলমালের কাজের' প্রতি ইঙ্গিত করেন। তারপর তিনি দু'হাজার দিরহাম তাঁর বেতন নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত যায়িদ এক হাজার করার প্রস্তাব রাখেন। খলীফা তাতে রাজী হন। এভাবে তাঁর বেতন এক হাজার নির্ধারিত হয়।[৪০]

খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) আমলে মুহাজির ও আনসারদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শূরার একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন যায়িদ (রা)। খলীফা 'উমার (রা) উক্ত শূরাকে একটি উপদেষ্টা কাউন্সিলের রূপ দান করেন। যায়িদ (রা) তারও সদস্য ছিলেন।

হযরত যায়িদের (রা) মধ্যে 'ইল্ম ও দ্বীনের পূর্ণতার সাথে সাথে প্রশাসনিক যোগ্যতাও ছিল। তাঁর ওপর খলীফা 'উমারের (রা) এতখানি আস্থা ছিল যে, যখনই তিনি মদীনার বাইরে সফরে যেতেন, তাঁকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। খলীফা 'উসমানও (রা) একই পন্থা অনুসরণ করেন। ইবন 'উমার থেকে নাফে বর্ণনা করেছেন। 'উমার (রা) যখন হজ্জে যেতেন, যায়িদকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। 'উসমানও তাই করতেন।[৪১]

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে মোট তিনবার তিনি খলীফার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হিজরী ১৬ ও ১৭ সনে দু'বার। বালাজুরী বলেন ঃ হিজরী ২৩ সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিনীদের সাথে নিয়ে 'উমার হজ্জ করেন। তখনও যায়িদ ইবন সাবিতকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান।[৪২] খলীফা 'উমার (রা) যখন শাম সফর করেন তখনও যায়িদকে (রা) দায়িত্ব দিয়ে যান। শামে পৌঁছে তিনি যায়িদের (রা) নিকট যে পত্র লেখেন তাতে যায়িদের নামটি খলীফার নিজের নামের আগেই উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন ঃ

- যায়িদ ইবন সাবিতের প্রতি 'উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট থেকে।[৪৩]

হযরত যায়িদ (রা) অত্যন্ত সতর্কতা ও যোগ্যতার সাথে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর দায়িত্ব পালনে খুশী হতেন এবং ফিরে এসে তাঁকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু দান করতেন।

হাদীসে এসেছে, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা আছে। তার মধ্যে আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এমন কি রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই।' হযরত যায়িদের (রা) মধ্যে এ আমানতদারীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। তাই রাষ্ট্রের অর্থ বিষয়ক অনেক গুরুদায়িত্ব বিভিন্ন সময় তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সময়কালে যে গনীমতের মাল আসতো তার বেশীর ভাগ তিনি নিজ হাতে বন্টন করতেন। এতে একাজটির গুরুত্ব কতখানি তা বুঝা যায়। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধটি অতি প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের বিপুল পরিমাণ সম্পদ বন্টনের ভার খলীফা অর্পণ করেছিলেন যায়িদের ওপর। তাছাড়া খলীফা 'উমার (রা) যখন সাহাবীদের ভাতা নির্ধারণ করেন তখন আনসারদের ভাতা বন্টনের দায়িত্ব তাঁকেই দেন। তিনি 'আওয়ালী থেকে শুরু করেন। তারপর যথাক্রমে আবদুল আশহাল, আউস, খাযরাজ প্রভৃতি গোত্রে বন্টন করে সব শেষে নিজের ভাতা গ্রহণ করেন।[৪৪]

হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন খলীফাদের দরবারের অতি ঘনিষ্ঠজন। হযরত 'উমারের (রা) নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল শীর্ষে। খলীফা 'উসমানেরও (রা) তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে যখন চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও অশান্তি ধূমায়িত হয়ে ওঠে তখনও যায়িদ (রা) ছিলেন খলীফার পক্ষে। সেই হাঙ্গামা ও বিশৃংখলার মধ্যে তিনি একদিন আনসারদের সম্বোধন করে বলেন ঃ 'ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা আরো একবার আল্লাহর আনসার হও।' দুঃখের বিষয়, হযরত যায়িদের (রা) মত ব্যক্তিরা সে দিন ইতিহাসের সেই চরম ট্রাজেডী রুখতে পারেননি।

এই ব্যর্থতার কারণও ছিল। কিছু সাহাবায়ে কিরাম (রা) কেন যেন হযরত 'উসমানের (রা) প্রতি সেদিন ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু আইউব আল-

আনসারীর (রা) মত বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন। তিনি হযরত যায়িদের (রা) কথার প্রতিবাদ করে বললেন ঃ 'উসমানের সাহায্যের জন্য তুমি মানুষকে এজন্য উৎসাহিত করেছ যে, তিনি তোমাকে বহু দাস দিয়েছেন। হযরত আবু আইউব (রা) ছিলেন বিশাল মর্যাদার অধিকারী একজন আনসারী সাহাবী। তাঁর সামনে হযরত যায়িদের (রা) চুপ করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলনা।

'তাহ্জীবুল কামাল' গ্রন্থকার হযরত যায়িদের (রা) একাধিক স্ত্রী ও ঊনত্রিশজন ছেলে-মেয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত সা'দ ইবন রাবী' আল-আনসারীর কন্যা একজন।[৪৫]

হযরত সা'দ ইবন রাবী' (রা) উহুদে শাহাদাত বরণ করেন। দু'কন্যা ও স্ত্রী রেখে যান। স্ত্রী তখন গর্ভবতী। গর্ভের এই সন্তানটিই উম্মু সা'দ বা উম্মুল 'আলা। ভালো নাম জামীলা। পরবর্তীকালে তিনিই হযরত যায়িদের (রা) সম্মানিতা স্ত্রী। সা'দ (রা) যখন মারা যান তখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয়নি। এ কারণে জাহিলী প্রথা অনুযায়ী সা'দের ভাই গোটা মীরাস আত্মসাৎ করে। তখনই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মীরাসের আয়াত নাযিল হয়। তিনি সা'দের (রা) ভাইকে ডেকে $\frac{২}{৩}$ অংশ দু'কন্যা এবং $\frac{১}{২}$ অংশ স্ত্রীকে দিয়ে বাকী অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখনও গর্ভের সন্তানকে মীরাস দানের বিধান চালু হয়নি। পরবর্তীকালে খলীফা 'উমার (রা) গর্ভের সন্তানকে মীরাস দানের বিধান চালু করলে হযরত যায়িদ স্ত্রীকে বললেন ঃ তুমি যদি চাও তাহলে তোমার পিতার মীরাসের ব্যাপারে তোমার বোনদের সাথে কথা বলতে পার। কারণ, এখন আমীরুল মুমিনীন গর্ভের সন্তানের মীরাস ঘোষণা করেছেন। উম্মু সা'দ বললেন ঃ না, আমি আমার বোনদের কাছে কিছুই চাইবো না।[৪৬]

হযরত যায়িদের (রা) সন্তানদের মধ্যে খারিজা ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র অন্যতম এবং উম্মু সা'দের গর্ভজাত সন্তান। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান এবং একজন পৌত্রও নিজেদের যুগের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর আযাদকৃত দাসের সংখ্যাও ছিল অনেক। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন সাবিত ইবন 'উবাইদ ও ওহাইব।

হযরত যায়িদের (রা) মৃত্যু সন সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ আছে। ওয়াকিদীর মতে হিজরী ৪৫ সন। 'আলী আল-মাদীনীর মতে হিঃ ৫১, আহমাদ ইবন হাম্বল ও আবু হাফ্স আল-ফাল্লাসের মতে হিঃ ৫১ এবং আল-হায়সাম ইবন 'আদী ও ইয়াহইয়া ইবন মু'ঈনের মতে হিঃ ৫৫ সনে তিনি মারা যান।[৪৭] ইবন হাজার (রহ) বলেন ঃ অধিকাংশের মতে হিজরী ৪৫ সনে তিনি মারা গেছেন।[৪৮] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪/৫৫ বছর। মারওয়ান ইবন হাকাম তখন মদীনার আমীর। তাঁর সাথে যায়িদের (রা) অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তিনিই জানাযার নামায পড়ান।[৪৯] তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে জনগণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) তাঁর মৃত্যুর দিন মন্তব্য করেন ঃ আজ 'হাবরুল উম্মাহ' (উম্মাতের ধর্মীয় নেতা) চলে গেলেন।[৫০] সালেম ইবন 'আবদুল্লাহ বলেন ঃ যায়িদ ইবন সাবিত যে দিন মারা যান সে দিন আমরা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সংগে ছিলাম। আমি বললাম ঃ আজ জনগণের শিক্ষক মারা গেলেন। ইবন 'উমার (রা) বললেন ঃ আল্লাহ তাঁকে রহম করুন। 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি ছিলেন জনগণের শিক্ষক ও 'হাবর' (ধর্মীয় নেতা)।[৫১]

প্রখ্যাত তাবে'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন ঃ আমি যায়িদ ইবন সাবিতের (রা) জানাযায় শরীক ছিলাম যখন তাঁকে কবরে নামানো হলো, ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ তোমরা যারা 'ইলম কিভাবে উঠে যায় তা জানতে চাও তারা জেনে নাও, এভাবে 'ইলম উঠে যায়। আজ বহু 'ইলম চলে গেল। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন ঃ আজ অনেক 'ইলম দাফন হয়ে গেল। হাত দিয়ে কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এভাবে 'ইলম চলে যায়। একজন মানুষ মারা যায় এবং সে যা জানে তা যদি অন্যরা না জানে তাহলে সে তার জ্ঞান নিয়েই কবরে চলে যায়।[৫২] কবি হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। তাঁর একটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[৫৩]

- হাস্‌সান ও তার পুত্রের পর কবিতার ছন্দ কে আর রচনা করবে?

যায়িদ ইবন সাবিতের পর ভাবের সমঝদার আর কে আছে?

কিরাআত, ফারায়েজ, বিচার ও ফাতওয়া শাস্ত্রে হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। পবিত্র কুরআনের ভাষায় তিনি 'রাসখ ফিল 'ইলম' (জ্ঞানে সুগভীর)। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-যাঁকে সাহাবীদের মধ্যে 'ইলমের সাগর গণ্য করা হতো, তিনিও যায়িদকে 'রাসেখ ফিল 'ইলম' গণ্য করতেন।[৫৪] ইবনুল আসীরের মতে তিনি সাহাবা সমাজের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।[৫৫] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র মাসরূক ইবন আজদা' বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের 'ইলম বা জ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। তাঁদের সকলের জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ, মু'য়াজ, আবুদ দারদা ও যায়িদ ইবন সাবিত-এই ছয়জনের মধ্যে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, যায়িদ ইবন সা'বিত আর-রাসেখুনা ফিল ইল্‌ম (জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিবর্গ)-এর অন্যতম ব্যক্তি।[৫৬]

ইসলাম যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করেছে 'ইলমে কিরাআত তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ শাস্ত্রে হযরত যায়িদের পান্ডিত্য সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'ঈনের প্রতিটি ব্যক্তি স্বীকার করতেন।

ইমাম শা'বীর মত শ্রেষ্ঠ বিদ্বান তাবে'ঈ বলেন ঃ 'যায়িদ 'ইলমে ফারায়েজের মত 'ইলমে কিরাআতেও সকল সাহাবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন।'[৫৭]

পবিত্র কুরআনের সাথে হযরত যায়িদের (রা) যে গভীর সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া

যায় তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়ের ঘটনা দ্বারা। মাত্র এগারো বছর বয়সে ১৭টি সূরা হিফজ করেন। অবশিষ্ট জীবন কুরআন লেখালেখির মধ্যেই অতিবাহিত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যখন যতটুকু ওহী নাযিল হতো তিনি জেনে লিখে নিতেন ও মুখস্থ করে ফেলতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় গোটা কুরআন তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়।[৫৮]

কাতাদাহ্ বলেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিককে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় কারা কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন? বললেন ঃ চারজন। তাঁদের সবাই আনসার। উবাই ইবন কা'ব, মু'য়াজ ইবন জাবাল, যায়িদ ইবন সাবিত ও আবু যায়িদ।[৫৯]

এ কারণে খলীফা আবুবকর (রা) যখন কুরআন সংগ্রহ ও সংকলন করার সিদ্ধান্ত নেন তখন এ দায়িত্ব পালনের জন্য যায়িদকে নির্বাচন করেন। আর খলীফা 'উসমান যখন কুরআনের কপি তৈরী করান তখনও এ কাজে যায়িদের (রা) সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য মনে করেন।

হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) ছিলেন কুররা বা কুরআন পাঠকদের নেতা। হযরত 'উমার (রা) যায়িদকে তাঁরও ওপর প্রাধান্য দিতেন। 'আবদুর রহমান আসসুলামী একবার খলীফা 'উসমানকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে চাইলে তিনি বললেন ঃ তাহলে তো তুমি আমাকে মানুষের কাজ থেকে বিরত রাখবে। তুমি বরং যায়িদ ইবন সাবিতের কাছে যাও। এ কাজের জন্য তাঁর হাতে বেশী সময় আছে। তাঁকে শুনাও। তাঁর ও আমার পাঠ একই। দু'জনের পাঠে কোন ভিন্নতা নেই।[৬০]

হযরত যায়িদের কিরাআতের সিলসিলা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেহেতু তিনি কুরাইশদের মত পাঠ করতেন এ কারণে মানুষের ঝোঁক ছিল তাঁরই দিকে। হযরত উবাই ইবন কা'বের জীবদ্দশায় যদিও তিনি এ ক্ষেত্রে সকলের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেননি, তবে তাঁর মৃত্যুর পর গোটা মুসলিম বিশ্বের একক কেন্দ্রে পরিণত হন। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ মদীনায় তাঁর নিকট ছুটে আসতো।

হযরত যায়িদ (রা) কুরআন মজীদের যে কিরাআত বা পাঠ প্রতিষ্ঠা করেন তা আজও বেঁচে আছে। ইবন 'আব্বাস, আবু 'আবদির রহমান আস-সুলামী, আবুল 'আলিয়া রাইয়্যাহী, আবু জা'ফর প্রমুখ ছিলেন কিরাআত শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র।[৬১]

পবিত্র কুরআনের পরেই মহানবীর হাদীসের স্থান। তিনি অন্যদের মত বেশী হাদীস বর্ণনা করেননি। তবে তাঁর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি 'দিরায়াত' বা যুক্তিকে কাজে লাগাতেন। হযরত রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বর্ণনা করলেন, রাসূল (সা) ভূমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। এ কথা যায়িদের (রা) কানে গেলে বললেন ঃ আল্লাহ রাফে'কে ক্ষমা করুন! তাঁর এত বেশী হাদীস বর্ণনার রহস্য আমার জানা আছে। আসল ঘটনা হলো, দু' ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। রাসূল (সা) তা দেখে বলেন, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ইজারার ভিত্তিতে ভূমি চাষ করা উচিত নয়। রাফে' শুধু শেষের অংশটুকু শুনেছে।[৬২]

হযরত 'আয়িশা (রা) যুবাইরের (রা) সন্তানদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) 'আসরের পরে তাঁর ঘরে দু' রাকা'য়াত নামায আদায় করেছিলেন। তাঁরা এ দু'রাকা'য়াতকে সুন্নাত মনে করে আদায় করা শুরু করেন। এ কথা যায়িদ (রা) জানতে পেরে বললেন ঃ আল্লাহ 'আয়িশাকে ক্ষমা করুন! হাদীসের জ্ঞান তাঁর চেয়ে আমার বেশী আছে। আসরের পরে নামায আদায়ের কারণ হলো, দুপুরে কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তারা প্রশ্ন করছিল, আর রাসূল (সা) উত্তর দিচ্ছিলেন। এভাবে জুহরের নামাযের সময় হলে তিনি শুধু ফরজ নামায আদায় করে আবার তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে বসে যান। এরপর আসরের নামাযের সময় হলে তা আদায় করেন। ঘরে ফেরার পর স্মরণ হয় যে, জুহরের ফরজের পরের দু'রাকা'য়াত সুন্নাত আদায় করেননি। তখন সেখানেই দু'রাকা'য়াত নামায আদায় করেন। আল্লাহ 'আয়িশাকে ক্ষমা করুন। তাঁর চেয়ে আমার বেশী জানা আছে যে, রাসূল (সা) 'আসরের পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।[৬৩]

কোন হাদীস সহীহ হলে এবং সে সম্পর্কে তাঁর নিকট কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি সমর্থন জানাতেন। একবার হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) স্বৈরাচারী উমাইয়্যা শাসক মারওয়ানের সামনে সাহাবীদের মর্যাদাবিষয়ক একটি হাদীস বর্ণনা করেন। মারওয়ান বললেন ঃ আপনি অসত্য বলছেন। যায়িদ ইবন সাবিত ও রাফে' ইবন খাদীজ (রা) মারওয়ানের পাশে মঞ্চে বসে ছিলেন। আবু সা'ঈদ মারওয়ানকে বললেন, আপনি তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। মারওয়ান তা না করে আবু সা'ঈদকে মারার জন্য ছড়ি তুলে ধরেন। তখন এ দুই মহান সাহাবী আবু সা'ঈদের কথা সত্য বলে সমর্থন করেন।[৬৪]

হযরত যায়িদের (রা) অধিকাংশ হাদীস সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত। তাছাড়া আবুবকর, 'উমার ও 'উসমান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬৫]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্রদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁর কাছে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এমন কয়েকজন বিখ্যাত সাহাবী ও তাবে'ঈর নাম এখানে উল্লেখ করা হলোঃ[৬৬]

ইবন 'আব্বাস, ইবন 'উমার, আনাস ইবন মালিক, আবু হুরাইরা, আবু সা'ঈদ খুদরী, সাহ্ল ইবন হুনাইফ, সাহ্ল ইবন সা'দ, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-খুতামী। এঁরা সকলে সাহাবী। সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যাব, কাসেম ইবন মুহাম্মদ, আবান ইবন 'উসমান, খারেজা ইবন যায়িদ (যায়িদের ছেলে এবং মদীনার সপ্ত ফুকাহার একজন), সাহ্ল ইবন আবী হাসামা, আবু 'আমর, মারওয়ান ইবন হাজম, 'উবাইদ ইবন সাব্বাক, 'আতা' ইবন ইয়াসার, বুসর ইবন সা'ঈদ, হাজার আল-মুদরী, তাউস, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, সালমান ইবন যায়িদ, সাবিত ইবন 'উবাইদ, উম্মু সা'দ (যায়িদের স্ত্রী)। এছাড়া আরো অনেকে।

হযরত যায়িদের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। মাত্র ৯২ (বিরানব্বই)টি। তারমধ্যে পাঁচটি মুত্তাফাক আলাইহি। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে

অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বনের কারণে তাঁর হাদীসের সংখ্যা এত কম হয়েছে। অন্যথায় তাঁর অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে থাকা পড়েছে, বহু হাদীস শোনা এবং বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্যও হয়েছে। এত কম হাদীস বর্ণনার কারণ হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) একটি সতর্কবাণী। আর সে বাণীই তাঁর মত আরও অনেককে বেশী হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সংযমী করে তুলেছে। মুহাম্মাদ ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে আনসারদের তৃতীয় তাবকায় তাঁকে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে প্রথম তাবকায় তাঁর আলোচনা এনেছেন।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে হযরত যায়িদ (রা) দারুণ পারদর্শী ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইফতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। সাহ্ল ইবন আবী খায়সামা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় মুহাজিরদের তিন ব্যক্তি ও আনসারদের তিন ব্যক্তি ফাতওয়া দিতেন। আনসারদের সেই তিনজনের একজন হলেন যায়িদ ইবন সাবিত (রা)।[৬৭] ইমাম শা'বী ও প্রখ্যাত তাবে'ঈ মাসরূক একই ধরনের কথা বর্ণনা করেছেন।[৬৮] হযরত আবুবকর (রা) ও 'উমারের (রা) খিলাফতকালেও তিনি মদীনার ইফতার মসনদে আসীন ছিলেন। শুধু তাই নয়, হিজরী ৪৫ সন পর্যন্ত আমরণ এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন। খলীফা আবুবকর (রা) কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে কতিপয় চিন্তাশীল ও ফিকাহবিদ আনসার ও মুহাজির সাহাবীর সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁদের মধ্যে যায়িদ ইবন সাবিতও একজন। আর তাঁরাই আবুবকর, 'উমার ও 'উসমানের (রা) যুগে ফাতওয়া দিতেন।[৬৯]

কাবীসা ইবন জুওয়াইব বর্ণনা করেছেন যে 'উমার, 'উসমান, 'আলীর (রা) 'আমলে, এমনকি হিজরী ৪০ সনে মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরী ৪৫ সনে মৃত্যু পর্যন্ত যায়িদ ((রা) মদীনার বিচার, ফাতওয়া, কিরাআত ও ফারায়েজ শাস্ত্রের প্রধান ছিলেন।[৭০] তাঁর যোগ্যতার পূর্ণ স্বীকৃতি খলীফা 'উমার (রা) দিয়েছেন। তিনি যায়িদকে (রা) এত গুরুত্ব দিতেন যে, তাঁকে মদীনার বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দিতেন না। মদীনার বাইরে বিভিন্ন স্থানে অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য হতো, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন দেখা দিত, আর সেজন্য খলীফার নিকট বিভিন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হতো। তিনি তাঁদের কাউকে মনোনীত করতেন। কিন্তু যায়িদের নামটি প্রস্তাব করা হলেই তিনি বলতেন, যায়িদ আমার হিসাবের বাইরে নেই। কিন্তু আমি কি করবো? মদীনাবাসী তাঁর মুখাপেক্ষী বেশী। কারণ, তাঁর কাছে যা পাবে অন্যের কাছে তা তারা পাবে না।[৭১]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার বলতেন, যায়িদ ছিলেন ফারূকী খিলাফতের একজন বড় 'আলীম। 'উমার (রা) সকল মানুষকে নানা দেশ ও শহরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফাতওয়া ও সিদ্ধান্ত দানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু যায়িদ মদীনায় বসে বসে মদীনাবাসী এবং সেখানে আগত লোকদের নিকট ফাতওয়া দিতেন।[৭২]

সুলায়মান ইবন ইয়াসার বলেন ঃ ফাতওয়া, ফারায়েজ ও কিরাআতে 'উমার ও 'উসমান (রা), যায়িদের (রা) ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতেন না।[৭৩] প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব একজন মস্তবড় মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ফাতওয়া ও বিচারে হযরত যায়িদের (রা) অনুসারী ছিলেন। তাঁর সামনে যখন কোন মাসয়ালা বা প্রশ্ন আসতো এবং মানুষ অন্যান্য সাহাবীর ইজতিহাদসমূহ বর্ণনা করতো তখন তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করতেন, এ ব্যাপারে যায়িদ কি বলেছেন? বিচার ফায়সালায় যায়িদ ছিলেন সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। আর যে সকল বিষয়ে কোন হাদীস পাওয়া যায় না সে সম্পর্কে মতামত দানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাঁর কোন কথা থাকলে তাই বল।[৭৪]

ইমাম মালিক (রহ) ছিলেন মদীনার ইমাম। আজও তিনি ফিকাহ ও হাদীস শাস্ত্রে অগণিত মানুষের ইমাম। তিনি বলতেন, 'উমারের (রা) পরে যায়িদ ইবন সাবিত ছিলেন মদীনার ইমাম। ইমাম শাফে'ঈও (রহ) ফারায়েজ শাস্ত্রের সকল মাসয়ালা হযরত যায়িদের তাকলীদ করেছেন।[৭৫]

ফকীহ সাহাবীদের তিনটি তাবকা বা স্তর ছিল। এর প্রথম তাবকায় ছিল হযরত যায়িদের (রা) স্থান। তিনি জীবনে বিপুল পরিমাণ ফাতওয়া দিয়েছেন। সবগুলি একত্রে সংগ্রহ করা হলে বিরাট আকারের একটি বই হবে।[৭৬]

হযরত যায়িদের (রা) ফিকাহ্ তাঁর জীবনকালেই জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব বলতেন, যায়িদ ইবন সাবিতের এমন কোন কথা নেই যার ওপর মানুষ সর্বসম্মতভাবে আমল করেনি। সাহাবীদের মধ্যে বহু ব্যক্তি এমন ছিলেন যাঁদের কথার ওপর কেউই আমল করেনি। কিন্তু হযরত যায়িদের (রা) ফাতওয়ার ওপর তাঁর জীবনকালেই পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ আমল করেছে।

মানুষের ধারণা, ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধি ও প্রসারের নিমিত্ত হচ্ছেন চারজন সাহাবী ব্যক্তিত্ব। যায়িদ ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ও আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা)। তাঁদেরই শিষ্য-শাগরিদদের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাহানে 'ইলমে দীনের প্রসার ঘটে। কিন্তু মদীনা ছিল ইসলামের উৎস ও নবীর (সা) আবাস স্থল। এ স্থানটি যায়িদ ও তাঁর ছাত্রদের বদৌলতে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ফকীহ সাহাবীদের দু'টি মজলিস ছিল। একটির সভাপতি ছিলেন হযরত 'উমার (রা), আর অন্যটির হযরত 'আলী (রা)। হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন 'উমারের (রা) মজলিসের সদস্য। এখানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো এবং জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।

যে সকল বিষয় এখনো বাস্তবে ঘটেনি সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জবাব তিনি দিতেন না। খারেজা ইবন যায়িদ বর্ণনা করেন, কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে- 'এটা কি ঘটেছে, না

ঘটেনি?' - এ রকম প্রশ্ন না করে তিনি কোন মতামত দিতেন না। বিষয়টি যদি বাস্তবে না ঘটতো তাহলে সে সম্পর্কে কিছুই বলতেন না। আর ঘটলে বলতেন।[৭৭]

হযরত যায়িদ (রা) সাধারণতঃ সব সময় জ্ঞান বিতরণে নিয়োজিত থাকতেন। তা সত্ত্বেও সর্ব সাধারণের সুবিধার্থে মসজিদে নববীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফাতওয়া ও মাসয়ালার জবাব দিতে বসতেন।

হযরত যায়িদের (রা) মাসয়ালাসমূহ ফিকাহ্র সকল অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। তার বিস্তারিত আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি মাসয়ালা তুলে ধরছি।

১. তিনি বলেছেন, ফরজ নামায ছাড়া অন্য নামায ঘরে আদায় করা উত্তম।[৭৮] তিনি বলেছেন, বাড়ীতে পুরুষের নামায আদায় একটি নূর বা জ্যোতি বিশেষ। পুরুষ যখন ঘরে নামাযে দাঁড়ায় তখন তার পাপসমূহ মাথার ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। একটি সিজদা দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তার পাপ মুছে দেন।[৭৯]

২. এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো জুহর ও আসরে কি কিরআত আছে? বললেন ঃ হ্যাঁ। রাসূল (সা) দীর্ঘ সময় ধরে এ দু'টি নামাযে কিয়াম (দাঁড়িয়ে থাকা) করতেন এবং এ সময় তাঁর ঠোঁট নড়াচড়া করতো।[৮০]

এর অর্থ এ নয় যে, ইমামের পিছনে মুকতাদিরও কিরাআত করা উচিত। মুলতঃ প্রশ্নটি ছিল ইমাম সম্পর্কে, মুকতাদি সম্পর্কে নয়। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, জুহর ও আসর নামাযে কি কিছু পড়া হয়? যায়িদ (রা) তারই জবাব দিয়েছেন। অন্যথায় সহীহ বুখারীতে খাব্বাব ইবন আরাত, যায়িদ ইবন সাবিত, আবু কাতাদাহ ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে যে সব বর্ণনা এসেছে তার কোনটি দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে কিরাআত করেছেন।

৪. কোন ব্যক্তি যদি নিজের বাসগৃহ নিজের জীবদ্দশা পর্যন্ত কাউকে থাকার জন্য দান করে তাহলে তার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা তার ওয়ারিস হবে। হযরত যায়িদের বর্ণনায় এর বিবরণ এসেছে। তিনি বলেছেন ঃ العمرى للوارث।

৫. হযরত যায়িদের মতে, যতদিন পর্যন্ত বাগানে ফল ভালো মত না আসে অথবা গাছে খেজুর পরিপক্ক না হয় ততদিন তা আন্দাজে বেচাকেনা নাজায়েজ।[৮২]

ইসলাম পূর্ব আমলে মদীনায় গাছে ফল পরিপক্ক হওয়ার আগেই বিক্রির প্রথা ছিল। এতে যখন ক্রেতার লোকসান হতো তখন দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হতো। রাসূল (সা) মদীনায় এসে এ অবস্থা দেখে এ ধরনের কেনাবেচা করতে নিষেধ করেন।

ফিকাহ্র অন্য সকল অধ্যায়ের চেয়ে ফারায়েজ-এর অধ্যায়ে ছিল হযরত যায়িদের (রা) বিশেষ পারদর্শিতা। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীসে এসেছে ঃ[৮৩] "আমার উম্মাতের সবচেয়ে বড় ফারায়েজ বিশেষজ্ঞ যায়িদ ইবন সাবিত।" রাসূলুল্লাহর (সা) এ সনদ দ্বারা বুঝা যায় তিনি ফারায়েজ শাস্ত্রে কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামও

এ শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য স্বীকার করতেন। খলীফা 'উমার (রা) তাঁর জাবীয়ার ঐতিহাসিক ভাষণে অগণিত শ্রোতার সামনে ঘোষণা করেন ঃ "ফারায়েজ সম্পর্কে কারো কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে সে যেন যায়িদ ইবন সাবিতের নিকট যায়।'[৮৪] তাঁর সমকালীন লোকেরা বলতো, যায়িদ ফারায়েজ ও কুরআনে অন্যদের অতিক্রম করে গেছেন।[৮৫]

ফারায়েজ শাস্ত্রটি বেশ জটিল। কুরআনে এ শাস্ত্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী, কর্ম এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) ফাতওয়া ও বিচার-আচার থেকেই গ্রহণ করা হয়। কুরআনে মীরাস ও অসীয়াত বিষয়ে যা কিছু এসেছে তা অতি চুম্বক কথায়। তাতে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি ইত্যাদি ধরনের উত্তরাধিকারীদের নির্ধারিত অংশ ঘোষণা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ সীমা লংঘন করবে সে হবে মূলতঃ নিজের ওপর অত্যাচারী।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বিচার-ফায়সালার মাধ্যমে এই সংক্ষিপ্ত বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ইনতিকালের পর যায়িদ (রা) এ শাস্ত্রের এত উন্নতি সাধন করেন যে, তাঁর পরেই এ বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হয় এবং বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (সা) মত জ্ঞানী ও উঁচু মর্যাদার সাহাবীরাও যায়িদের (রা) নিকট ফারায়েজ সংক্রান্ত মাসয়ালার সমাধান জানতে চাইতেন।

ইয়ামামার নিহত অধিবাসীদের ব্যাপারে হযরত আবুবকর (রা) হযরত যায়িদের (রা) ফাতওয়া অনুযায়ী ফায়সালা করেন। অর্থাৎ যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদেরই মৃতদের ওয়ারিস নির্ধারণ করেন। মৃতদেরকে পরস্পর ওয়ারিস নির্ধারণ করেননি।[৮৬]

'আমওয়াসের 'তা'উন' মহামারীতে যখন গোত্রের পর গোত্র মৃত্যু বরণ করে তখন 'উমার (রা) যায়িদের (রা) উল্লেখিত মতের ভিত্তিতে সমাধান দেন। এমন কি হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) যাঁকে উম্মাতের তত্ত্বজ্ঞানী ও জ্ঞানের সাগর বলা হয়, তিনিও যায়িদের (রা) সমাধানে নিশ্চিত হতেন।

একদিন তিনি ছাত্র 'আকরামাকে একথা বলে পাঠালেন, তুমি যায়িদকে জিজ্ঞেস করে এসো যে, এক ব্যক্তি স্ত্রী ও মাতা-পিতা রেখে মারা গেছে, তার মীরাস কিভাবে বন্টিত হবে? যায়িদ বললেন, স্ত্রী অর্ধেক এবং বাকী অর্ধেকের এক-তৃতীয়াংশ মাতা এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে পিতা। ইবন 'আব্বাসের (রা) ধারণা ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করতেন মাতা পাবে মোট মীরাসের এক-তৃতীয়াংশ। এজন্য আবার জানতে চাইলেন, এরকম বন্টন কি কুরআনে আছে, না এটা আপনার নিজের মত? যায়িদ (রা) বললেন, এ আমার ইজতিহাদ। আমি মাতাকে পিতার ওপর প্রাধান্য দিতে পারিনে।[৮৭]

খিলাফতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনগণ লিখিত আকারে ফাতওয়া চেয়ে চিঠি লিখতো। তিনিও লিখিত জবাব দিতেন। আমীর মু'য়াবিয়া (রা) একবার চিঠি মারফত

দাদার অংশ সম্পর্কে যায়িদের (রা) ফাতওয়া জানতে চান। হযরত যায়িদ (রা) জবাবে যে লিখিত ফাতওয়াটি দান করেন তা 'কানযুল 'উম্মাল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সেই চিঠিতে খলীফা 'উমার (রা) ও 'উসমান যেভাবে দাদার অংশ বন্টন করেছিলেন তা উল্লেখ করেন।[৮৮]

হযরত যায়িদ (রা) ফারায়েজের নানা ধরনের জিজ্ঞাসা বা মাসয়ালার সমাধান খলীফা 'উমারের (রা) 'আমলেই বিন্যাস করেন।[৮৯] তাঁর বোধ ও বুদ্ধিতে নতুন নতুন সমস্যার উদয় হতো আর তিনি তার সমাধান বের করতেন। পরবর্তীকালে এ সব সমাধান এ শাস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয়।

হযরত যায়িদ (রা) দাদার মীরাসের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দান করেন সাহাবাদের মধ্যে অনেকেই তার বিরোধী ছিলেন। তবে জনতার সমর্থন তার পক্ষেই ছিল। ফারায়েজ শাস্ত্রে দাদার মীরাস একটি দারুণ মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা। এমন কি হযরত যায়িদ (রা) এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম বুখারী 'আল-ফারায়েজ' অধ্যায়ে 'দাদার মীরাস' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ এনেছেন। তাতে তিনি এ মতবিরোধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, 'এ বিষয়ে ইবন 'উমার, আলী, ইবন মাস'উদ ও যায়িদের (রা) বিভিন্ন রকম কথা বর্ণিত হয়েছে।'[৯০] তবে যে মতের ওপর হযরত যায়িদের (রা) শেষ জীবন পর্যন্ত অটল ছিলেন 'উমার ও 'উসমান (রা) সেটাই প্রয়োগযোগ্য মনে করেছেন।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত 'উমার (রা) সর্বপ্রথম দাদার অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর এক পৌত্র মারা গেলে তিনি নিজেকে তার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী মনে করতে থাকেন। লোকেরা এর বিরোধী মত পোষণ করতে থাকে। একদিন হযরত 'উমার যখন হযরত যায়িদের (রা) বাড়ীতে উপস্থিত হলেন তখন তিনি চিরুনী করছিলেন এবং দাসী তাঁর চুল পরিপাটি করে দিচ্ছিল। যায়িদ (রা) খলীফাকে বললেন, কষ্ট করে আসার কি প্রয়োজন ছিল, ডেকে পাঠালেই তো পারতেন। খলীফা বললেন, একটি মাসয়ালা সম্পর্কে পরামর্শ করতে এসেছি। যদি আপনার মতের সাথে আমার মতের মিল হয় তাহলে 'আমল করবো। অন্যথায় আপনার ওপর কোন রকম বাধ্যবাধকতা নেই। যায়িদ এ অবস্থায় মতামত দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। 'উমার ফিরে গেলেন। অন্য একদিন আবার গেলেন। যায়িদ (রা) বললেন, আমার সিদ্ধান্ত আমি লিখিতভাবে জানাবো। অতঃপর তিনি শাজারার আকৃতিতে বিন্যাস করে অংশ বন্টন করেন। হযরত 'উমার (রা) জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন, যায়িদ ইবন সাবিত এটি লিখে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি তা চালু করছি।[৯১]

হযরত যায়িদ (রা) 'ইলমে ফারায়েজ গ্রন্থাবদ্ধ করেন এবং এর বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে গবেষণা করে নতুন নতুন মাসয়ালাও সৃষ্টি করেন। তবে এর মধ্যে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উদ্ভাবন হলো মাসয়ালায়ে 'আওল'। কিছু লোকের ধারণা, 'আওলের' উদ্ভাবক হলেন হযরত 'আব্বাস (রা)। কিন্তু এ ধারণা বর্ণনা ও যুক্তি উভয়ের পরিপন্থী।

প্রথমতঃ এ ধারণার পশ্চাতে তেমন কোন সনদ নেই। দ্বিতীয়তঃ হযরত আব্বাসের (রা) ফারায়েজ শাস্ত্রে তেমন বুৎপত্তি ছিলনা। এ কারণে এ জাতীয় উদ্ভাবনা তাঁর প্রতি আরোপ করা যুক্তির পরিপন্থী।

হযরত যায়িদ (রা) ফারায়েজ শাস্ত্রের যতটুকু খিদমাত করেছেন তা উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীমের বাণী- 'আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফারায়েজ বিশেষজ্ঞ হচ্ছে যায়িদ'- অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। হযরত যায়িদের (রা) অসাধারণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা ও অভিনব চিন্তাশক্তি দেখে সে যুগের উলামা-মাশায়েখ দারুণ বিস্মিত হয়েছেন। 'উলুমে শারা'য়িয়্যা ছাড়াও পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি যে কতখানি পারদর্শী ছিলেন সে সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। এখানে তার কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

যায়িদ (রা) রাসূলে কারীমের (সা) নির্দেশ মুতাবিক হিব্রু ও সুরইয়ানী ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর মেধা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, মাত্র পনেরো দিনের চেষ্টায় এ ভাষা দু'টিতে এতখানি দক্ষতা অর্জন করেন যে, অনায়াসে চিঠি লিখতে সক্ষম হন। পরে আরো চর্চার ফলে এতখানি উন্নতি হয় যে তাওরাত ও ইনজীলের ভাষাসমূহের একজন আলেমে পরিণত হন। মাস'উদী লিখেছেন, তিনি ফার্সী, রোমান, হাবশী ভাষাগুলোও জানতেন। এগুলি তিনি শিখেছিলেন মদীনায় যারা এ ভাষা জানতো তাদের নিকট থেকে।[৯২]

তৎকালীন আরবে হিসাব বা অংক শাস্ত্রের তেমন প্রচলন ছিলনা। এ কারণে ইসলামের প্রথম পর্বে খারাজের হিসাবপত্র রোমান অথবা ইরানীরা করতো। আরববাসী হাজারের ওপর গণনা করতে জানতো না। আরবীতে হাজারের ওপর সংখ্যার জন্য কোন শব্দও ছিলনা। কিন্তু যায়িদের (রা) অংকে এতখানি পারদর্শিতা ছিল যে, ফারায়েজ শাস্ত্রের অতি জটিল ও সূক্ষ্ম মাসয়ালাসমূহও অংক দ্বারা সমাধান করতেন। তাছাড়া অর্থ সম্পদের বন্টনও করতে পারতেন। হিজরী ৮ম সনে হুনাইন যুদ্ধ হয়। এতে প্রায় বারো হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করে। তাঁরই আদমশুমারী ও প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী রাসূল (সা) মালে গানীমাত বন্টন করেন। প্রথমে তিনি মানুষের সংখ্যা অবগত হন। তারপর মালে গানীমাত উক্ত সংখ্যার ওপর বিছিয়ে দেন। এমনিভাবে ইয়ারমুকের যুদ্ধের মালে গনীমাত মদীনায় আসলে যায়িদই (রা) তা বন্টন করেন।[৯৩]

ইসলাম-পূর্ব আরবে লেখার তেমন প্রচলন ছিলনা, সুপ্রাচীনকালের বর্ণনা সমূহ তারা স্মৃতিতে বংশপরম্পরায় ধরে রাখতো। যায়িদ (রা) লিখতে জানতেন এবং তাঁর সমকালে তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখক। বিভিন্ন ফরমান, চুক্তিপত্র, চিঠিপত্র লেখা ছাড়াও সুন্দর অঙ্কনও জানতেন।

খলীফা 'উমারের (রা) সময়ে আরবের বিখ্যাত দুর্ভিক্ষ 'আম্মুর রামাদাহ' দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষ মুকাবিলার জন্য তিনি মিসরের গভর্ণর 'আমর ইবনুল 'আসকে (রা) খাদ্যশস্য পাঠাতে বলেন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) বিশটি জাহাজ বোঝাই করে খাদ্য শস্য

রাজধানী মদীনায় পাঠান। 'উমার (রা) অত্যন্ত বিচলিতভাবে জাহাজের প্রতীক্ষায় থাকেন। যায়িদ সহ আরো কিছু সাহাবীকে সংগে নিয়ে তিনি মদীনার নিকটবর্তী 'জার' নামক বন্দরে চলে যান। খাদ্যশস্য ভর্তি জাহাজ এলে সেখানে দু'টি গুদাম বানিয়ে তাতে সংরক্ষণ করেন। তিনি যায়িদকে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের একটি তালিকা ও তাদের প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দকৃত শস্যের পরিমাণ লেখা থাকে এমন একটি ফর্দ তৈরী করতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের ভিত্তিতে যায়িদ একটি রেজিস্টার তৈরী করেন, প্রত্যেককে একটি কাগজের চাকতি দেন যার নীচে 'উমারের (রা) সীল-মোহর লাগানো ছিল। চাকতি তৈরী ও তাতে মোহর লাগানোর ঘটনা ইসলামে ছিল এটাই প্রথম। আর এর রূপকার ছিলেন যায়িদ (রা)।

ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হলো মহোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধন। তাঁর চরিত্রে যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা হলো, হুব্বে রাসূল, ইত্তেবায়ে রাসূল, আমর বিল মারূফ, শাসকদের প্রতি উপদেশ-নসীহত ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা।

রাসূলের প্রতি প্রবল ভালোবাসার কারণে অধিকাংশ সময় তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে যেতেন। কোন কোন সময় এত সকালে যেতেন যে, রাসূলের (সা) সাথেই সেহরী খেতেন। রাসূল (সা) তাঁকে স্বীয় কক্ষে ডেকে নিতেন।[৯৪]

একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে দেখতে পান, তিনি খেজুর দিয়ে সেহরী খাচ্ছেন। তাঁকেও আহারে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। যায়িদ বললেন, আমি রোযা রাখার ইরাদা করেছি। রাসূল (সা) বললেন, আমারও তো এটাই ইরাদা। সেদিন হযরত যায়িদ রাসূলের (সা) সঙ্গে সেহরী খান। কিছুক্ষণ পর নামাযের ওয়াকত হলে তিনি রাসূলের (সা) সাথে মসজিদে যান এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করেন।[৯৫]

যায়িদ (রা) অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে যেতেন। রাসূল (সা) তাঁর সাথে এতখানি খোলামেলা ছিলেন যে কখনো কখনো নিজের হাঁটু যায়িদের রানের ওপর রেখে দিতেন। একদিন তো এ অবস্থায় ওহী নাযিল হয়। যায়িদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটু এ সময় এত ভারী মনে হচ্ছিল যে তার ভার সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছিল, আমার রান ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু বেয়াদবী হয়, এ ভয়ে তিনি 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। চুপ করে বসে থাকেন।[৯৬]

রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ পালনে বিন্দুমাত্র হেরফের বরদাশত করতেন না। একবার শামে গেলেন আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নিকট। তাঁর কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। মু'য়াবিয়া (রা) এক ব্যক্তিকে হাদীসটি লিখে রাখার জন্য বললেন। যায়িদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি তাঁর লিখিত অংশটুকু মুছে দেন।[৯৭]

আমীর-'উমারাদের সামনেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের প্রচারের ব্যাপারে চুপ থাকতেন না। মারওয়ান ইবনুল হাকাম তখন মদীনার গভর্ণর। তিনি মাগরিব নামাযে ছোট ছোট সূরা পড়তেন। যায়িদ বললেন, এমনটি করেন কেন? রাসূল (সা) তো বড় বড় সূরাও পড়তেন।[৯৮]

সাহাবা ও তাবেঈনদের কেউ কখনো অজ্ঞতাবশত সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কাজ করে বসলে যায়িদ তাঁকেও সতর্ক করে দিতেন। একবার শুরাহবীল ইবন সা'দ (রা) বাজারে একটি পাখি ধরেন। যায়িদ তা দেখে ফেলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এক থাপ্পড় মারেন এবং পাখিটি ছিনিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দেন। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, ওরে নিজের শত্রু, তোমার জানা নেই যে, রাসূল (সা) মদীনাকে 'হারাম' ঘোষণা করেছেন![৯৯]

একবার তিনি শুরাহবীলকে বাগানে জাল পাততে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন- 'এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ।'[১০০]

শাম থেকে এক ব্যক্তি মদীনায় এলো যয়তুনের তেল বিক্রী করতে। অনেক ব্যবসায়ী কথাবার্তা বললো। আবদুল্লাহ ইবন উমার কথাবার্তা বলে তেল খরীদ করে নিলেন। মাল সেখানে থাকতেই দ্বিতীয় ক্রেতা পাওয়া গেল। সে আবদুল্লাহ ইবন উমারকে বললেন, আমি আপনাকে এত লাভ দিচ্ছি। আমার কাছে বিক্রী করে দিন। ইবন উমার রাজী হয়ে গেলেন। তিনি কথা পাকাপাকি করার জন্য তার হাতের ওপর স্বীয় হাত রাখবেন, এমন সময় পিছন থেকে একজন তাঁর হাত টেনে ধরেন। তিনি তাকিয়ে দেখেন যায়িদ ইবন সাবিত। তিনি ইবন উমারকে বললেন, এখন বেচো না। প্রথমে মাল এখান থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, রাসূল (সা) এমনভাবে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।[১০১]

একবার তিনি দুপুরের সময় মদীনার গভর্ণর মারওয়ানের বাড়ী থেকে বের হলেন। শিষ্য-শাগরিদরা তা দেখে ফেলে। তারা মনে করলো, হয়তো বিশেষ কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। তারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো। যায়িদ বললেন, এ সময় তিনি কয়েকটি হাদীস জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছি, তিনটি অভ্যাসের ব্যাপারে মুসলমানের অন্তরে বিরূপ ভাব জন্মাবে না। তাহলো আল্লাহর জন্য কাজ করা, শাসকদের নসীহত করা জামায়াতের সাথে থাকা।[১০২]

'উবাদা ইবন সামিত ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সাহাবী। একবার তিনি বায়তুল মাকদাস গেলেন। সেখানে একজন থাবাতী ব্যক্তিকে তাঁর বাহনটি একটু ধরতে বললেন। সে ধরতে অস্বীকৃতি জানালো। 'উবাদা তাকে খুব ধমকালেন এবং মারলেন। কথাটি খলীফা 'উমারের কানে গেল। তিনি 'উবাদাকে বললেন, আপনি এ কেমন কাজ করলেন? 'উবাদা বললেন, আমি তাঁকে ঘোড়াটি একটু ধরতে বললাম, আর সে অস্বীকার করলো। আমার মেজাজটা একটু গরম। আমি তাকে মেরে বসলাম। 'উমার বললেন, আপনি বদলা বা কিসাসের জন্য প্রস্তুত হোন। সেখানে যায়িদ ইবন সাবিত উপস্থিত ছিলেন।

তিনি এভাবে একজন সাহাবীর অপমান সহ্য করতে পারলেন না। 'উমারকে বললেন, আপনি একজন গোলামের বদলায় নিজের ভাইকে মারবেন? তাঁর একথার পর 'উমার কিসাসের পরিবর্তে শুধু দিয়াত ধার্য করেন। 'উবাদাকে (রা) দিয়াত আদায় করতে হয়।[১০৩]

এমনি আর একটি ঘটনা। 'উমার (রা) যখন শামে ছিলেন তখন একদিন খবর পেলেন যে, একজন মুসলমান একজন জিম্মীকে হত্যা করেছে। 'উমার হত্যাকারী মুসলমানকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। যায়িদ অতিকষ্টে খলীফাকে বুঝালেন এবং কিসাসের পরিবর্তে দিয়াতে রাজী করান।[১০৪]

স্বভাবগত ভাবেই তিনি চুপচাপ থাকতে ভালোবাসতেন। খলীফাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। খলীফা 'উমারের অন্যতম সঙ্গী ও পারিষদ ছিলেন। খলীফা 'উসমানের (রা) সাথে তাঁর এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, লোকে তাঁকে 'উসমানী বলতো। 'উসমান শাহাদাত বরণ করলে তিনি খুব কেঁদেছিলেন। 'উসমান (রা) তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। 'আলী-মু'য়াবিয়ার (রা) দ্বন্দ্বে আলীর (রা) পক্ষে কোন যুদ্ধে অংশ নেননি, তা সত্ত্বেও তিনি আলীকে দারুণ ভালোবাসতেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার প্রবক্তা ছিলেন। আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) সাথেও সুসম্পর্ক ছিল। শামে গেলে তাঁর গৃহেই উঠতেন।[১০৫]

মারওয়ান ছিলেন তৎকালীন আরব বিশ্বের একজন অতি বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। যায়িদের (রা) ছিল তাঁর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন না। একদিন যায়িদ ইবন সাবিতকে ডেকে রাজনীতি বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করেন। যায়িদ জবাব দিচ্ছেন, এমন সময় তিনি বুঝতে পারলেন কিছু লোক পর্দার আড়াল থেকে তাঁর বক্তব্য লিখে নিচ্ছে। যায়িদ তক্ষুণি বলে উঠলেন, মাফ করবেন, এতক্ষণ আমি যা কিছু বলেছি তা সবই আমার ব্যক্তিগত মতামত।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। একদিন যায়িদ (রা) যখন ঘোড়ায় চড়তে যাবেন, ইবন 'আব্বাস তাঁর জিনটি ধরে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। যায়িদ (রা) বললেন ঃ আপনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। দয়া করে আপনি সরে যান। তিনি বললেন ঃ আমাদের 'উলামা ও বড়দের সাথে এমন আচরণ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যায়িদ বললেন ঃ আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন। ইবন 'আব্বাস (রা) হাত বাড়িয়ে দিলে যায়িদ হাতে চুমু দিয়ে বললেন ঃ আমাদেরকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবীর (সা) পরিবার-পরিজনদের সাথে এমন আচরণ করার জন্য।[১০৬]

যে মারওয়ান ইবনুল হাকাম, আবু সা'ঈদ আল-খুদরীর (রা) মত একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবীকে মারার জন্য ছড়ি উঠিয়েছিলেন, তিনিও যায়িদকে (রা) অত্যন্ত সম্মান করতেন। দরবারে গেলে মারওয়ান তাঁকে নিজের আসনের পাশেই বসাতেন।

যায়িদ (রা) অন্যান্য সাহাবী ও তাবে'ঈদেরকে মাঝে মধ্যে চিঠির মাধ্যমে উপদেশ দিতেন। প্রখ্যাত সাহাবী উবাই ইবন কা'বকে (রা) তিনি এমনি একটি উপদেশমূলক চিঠি লিখেছিলেন। সীরাত ও হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে।[১০৭]

সত্য কথা বলতে কাকেও পরোয়া করতেন না। তাবারানী বর্ণনা করেছেন। খলীফা 'উমার (রা) একদিন গোপনে খবর পেলেন, আবু মিহ্জান আস-সাকাফী নামক একব্যক্তি তার এক বন্ধুর সাথে ঘরের মধ্যে মদ পান করছে। তিনি তৎক্ষণাত রওয়ানা দিলেন এবং সোজা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেখানে আবু মিহ্জানকে ছাড়া আর কাউকে পেলেন না। আবু মিহ্জান তখন ক্ষুব্ধ হয়ে আমীরুল মুমিনীনকে বললেন ঃ একাজটি আপনি ঠিক করেননি। কারণ, আল্লাহ্ আপনাকে গুপ্তচরগিরি করতে নিষেধ করেছেন। 'উমার (রা) সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ এ কি বলে? যায়িদ ইবন সাবিত ও আবদুর রহমান ইবন আল-আরকান (রা) বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, সে ঠিক বলেছে। এ এক ধরনের গুপ্তচরবৃত্তি। 'উমার (রা) তাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসেন।[১০৮]

যায়িদ (রা) পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। ঘুমানোর সময় দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পরিবার-পরিজনের স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্য কামনা করি। আর কোন আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার বদ দু'আ থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' পরিবার-পরিজনদের মধ্যে তিনি খুব রসিক হতেন যেমন মজলিসে হতেন অত্যন্ত গম্ভীর।[১০৯]

তাঁকে নিয়ে তাঁর নিজ গোত্র খাযরাজীদের গর্বের অন্ত ছিলনা। মদীনার চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোত্র আউস ও খাযরাজ। ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা মাঝে মাঝে নানা বিষয় নিয়ে একে অপরের ওপর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করত। এমনিভাবে একবার খাযরাজীরা বললো, 'আমাদের মধ্যে এমন চার ব্যক্তি আছেন, যাঁদের সমকক্ষ কেউ তোমাদের মধ্যে নেই। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় গোটা কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের একজন যায়িদ ইবন সাবিত।'[১১০]

যায়িদের (রা) জীবন ও কর্ম ছোট কোন প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা-১/৫৬১; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/২২৩
২. উসুদুল গাবা-২/৩৩১; তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল-১০/২৫
৩. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫১; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৩
৪. প্রাগুক্ত-২/২২৪
৫. তাহজীবুল কামাল-১০/২৮; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯০; উসুদুল গাবা-২/৩৩১
৬. তাহজীবুল কামাল-১০/২৭; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫১

৭. আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮; আল-ইসাবা-১/৫৬১
৮. আল-ইসাবা-১/৫৬১
৯. তাহজীবুল কামাল-১০/৩০; আল-ইসাবা-১/৫৬১
১০. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৬,৩৪৪
১১. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৭
১২. তাহজীবুল কামাল-১০/২৯
১৩. প্রাগুক্ত-১০/৩০
১৪. আল-ইসাবা-১/৫৬১
১৫. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৪
১৬. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫২; আল-ইসাবা-১/৫৬১
১৭. উসুদুল গাবা-২/৩৩১; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫২
১৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫৮;
১৯. তাবাকাত-৩/৪৮; হায়াতুস সাহাবা-২/৩৯৭
২০. তারীখুত তামাদ্দুন আল-ইসলামী-১/২৪৪
২১. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩০
২২. আল-ইসাবা-১/৫৬১
২৩. রিজানুল হাওলার রাসূল-৩৯২
২৪. বুখারী ঃ বাবু জাম'য়িল কুরআন; মুসনাদ-৫/১৮৮
২৫. বুখারী ঃ বাবুল কুররা'; মুসনাদ-৫/১৮৫
২৬. মুসনাদ-৫/১৮৩
২৭. বুখারী ঃ বাবু জাম'য়িল কুরআন; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫২
২৮. বুখারী ঃ বাবু জাম'য়িল কুরআন
২৯. প্রাগুক্ত ঃ মুসনাদ-৫/১৮৯; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩
৩০. বুখারী ঃ বাবু কাতিবিল ওহী
৩১. মুসনাদ-৫/১৯১
৩২. কানযুল 'উম্মাল-৩/১৩১; মুসনাদ-৫/১৯১; হায়াতুস সাহাবা-১/৪০৯;
৩৩. মুসনাদ-৫/১৮৬
৩৪. তাবাকাত-২/৩৫৮; তাহজীবুল কামাল-১০/২৮; মুসনাদ-৫/১৮২; উসুদুল গাবা-২/৩৩২; আল-ইসাবা-১/৫৬১; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯০-১৯১
৩৫. তাহজীবুল কামাল-১০/৩০
৩৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৫৩১
৩৭. সীয়ারে আনসার-১/৩৮৬
৩৮. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩১
৩৯. বুখারী ও মুসলিম; কানযুল 'উম্মাল-৩/১৭৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৯৪
৪০. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩
৪১. তাবাকাত-৪/১৭৪; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯২
৪২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৬
৪৩. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫২; উসুদুল গাবা-২/৩৩২
৪৪. কিতাবুল খারাজ-৬৬
৪৫. তাহজীবুল কামাল-১০/২৬,২৭
৪৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৮
৪৭. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৬; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৪

৪৮. আল-ইসাবা-১/৫৬২
৪৯. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৪
৫০. তারীখুল ইসলাম ও তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৫
৫১. হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯২
৫২. তাবাকাত-২/২৬১, ২৬২; তাহজীবুল কামাল-১০/৩২৫
৫৩. আল-ইসাবা-১/৫৬২
৫৪. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩১; আল-ইসাবা-১/৫৬২
৫৫. উসুদুল গাবা-২/৩৩২
৫৬. তাবাকাত-৪/১৬৭ আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৮, ২৫৯
৫৭. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৫
৫৮. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩০
৫৯. বুখারী ঃ বাবুল কুররা মিন্ আসহাবিল নাবী (সা)।
৬০ হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯৩
৬১. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩০; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৪
৬২. মুসনাদ-৫/১৮২
৬৩. প্রাগুক্ত-৫/১৮৫
৬৪. প্রাগুক্ত
৬৫. তাহজীবুল কামাল-১০/২৫; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৪
৬৬. তাহজীবুল কামাল-১০/২৫,২৬; আল-ইসাবা-১/৫৬১
৬৭. তাবাকাত-৪/১৬০; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৪
৬৮. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩২
৬৯. কানযুল 'উম্মাল-৩/১৩৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৬
৭০. তাবাকাত-৪/১৭৫; আল-ইসাবা-১/৫৬২; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৪
৭১. তাবাকাত-৪/১৭৪; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯২
৭২. প্রাগুক্ত
৭৩. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩২
৭৪. তাবাকাত-৪/১৭৫
৭৫. উসুদুল গাবা-২/৩৩২
৭৬. আ'লামুল মওয়াক্কি'ঈন-২/১২
৭৭. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩২; হায়াতুস সাহাবা-৩/২২৩
৭৮. মুসনাদ-৫/৮৬
৭৯. হায়াতুস সাহাবা-৩/৮৭
৮০. মুসনাদ-৫/৮৬
৮১. প্রাগুক্ত-৫/১৮২
৮২. প্রাগুক্ত-৫/১৯২
৮৩. মুসনাদ-৩/১৮৪; তাহজীবুল কামাল-১০/২৯; ইবন মাজা এবং তিরমিজিও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
৮৪. হায়াতুস সাহাবা-৩/২০২
৮৫. তাহজীবুল কামাল-১০/২৯; তাহজীব ইবন আসাকির-৫/৪৪৯
৮৬. কানযুল 'উম্মাল-৬/৬
৮৭. প্রাগুক্ত
৮৮. প্রাগুক্ত-৬/১৫

৮৯. প্রাগুক্ত
৯০. বুখারী ঃ বাবু মীরাসুল জাদ্দে,
৯১. কানযুল্ 'উম্মাল-৬/১৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৫১৮; ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (১৮৯) গ্রন্থেও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।
৯২. কিতাবুত তানবীহ্ ওয়াল ইশরাফ-১/৪০৩
৯৩. আল-ইসাবা-১/৫৬১; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৪; তাবাকাত-১/১১০
৯৪. মুসনাদ-৫/১৮২
৯৫. প্রাগুক্ত-৫/১৯২
৯৬. প্রাগুক্ত-৫/১৮২, ১৯২
৯৭. প্রাগুক্ত-৫/১৮২
৯৮. বুখারী ঃ বাবুল কিরামাহ্ ফিল মাগরিব
৯৯. মুসনাদ-৫/১৮১, ১৯২
১০০. প্রাগুক্ত-৫/১৯০
১০১. প্রাগুক্ত-৫/১৯১
১০২. প্রাগুক্ত-৫/১৮৩
১০৩. কানযুল 'উম্মাল-৭/২৯৯; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩১; হায়াতুস সাহাবা-২/১৯
১০৪. কানযুল 'উম্মাল-৭/৩০৪
১০৫. মুসনাদ-৫/১৮২; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৪
১০৬. কানযুল 'উম্মাল-৭/৩৭; আল-ইসাবা-১/৫৬১; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৫৪, ৪৫৫
১০৭. কানযুল 'উম্মাল-৮/২২৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৯
১০৮. কানযুল 'উম্মাল-২/১৪১; হায়াতুস সাহাবা-২/৪২২
১০৯. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩
১১০. আল-আ'লাম-২/৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৯৫

'আমর ইবন আল-জামূহ (রা)

হযরত 'আমর ইবন আল-জামূহের (রা) পিতার নাম আল-জামূহ্ ইবন যায়িদ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার সন্তান। একজন আনসারী সাহাবী।[১] জন্ম সন ও প্রথম জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইবন ইসহাক তাঁর মাগাযীতে বলেন ঃ তিনি বনু সালামা তথা গোটা আনসার সম্প্রদায়ের একজন নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।[২] তাছাড়া জাহিলী আমলে তিনি তাদের ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। তাদের মূর্তি উপাসনা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক বা মুতাওয়াল্লীও ছিলেন।[৩]

তাঁর ঘরে কাঠের নির্মিত একটি বিগ্রহ ছিল তার নাম ছিল 'মানাত'। বিগ্রহটিকে তিনি সীমাহীন তা'জীম করতেন। অন্তরের সবটুকু ভক্তি ও শ্রদ্ধা এর পদতলে নিবেদন করতেন।[৪] এর মধ্যে মক্কায় ইসলামের ধ্বনি উত্থিত হলো। কিছু লোক মদীনা থেকে মক্কায় আসলেন এবং 'আকাবার দ্বিতীয় শপথে অংশগ্রহণ করে আবার মদীনায় ফিরে গেলেন। এই দলে 'আমরের ছেলে মু'য়াজও ছিলেন।

মদীনায় ফিরে এসে তাঁরা খুব জোরেশোরে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করলেন এবং অতি দ্রুত তথাকার অলি-গলি তাকবীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। এরই মধ্যে বনু সালামার কিছু তরুণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যে কোন ভাবে তাঁদের সম্মানিত নেতা 'আমরকে ইসলামের সুশীলত ছায়ায় আনতে হবে। তাঁর ছেলে মু'য়াজ চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। এক পর্যায়ে তাঁদের মাথায় নতুন এক খেয়াল চাপলো।

তাঁর ছেলে মু'য়াজ বন্ধু মু'য়াজ ইবন হায়সাম, মতান্তরে মু'য়াজ ইবন জাবাল ও অন্যদের সংগে করে রাতে বাড়ীতে আসতেন এবং সকলের অগোচরে অতি সন্তর্পণে 'আমরের অতিপ্রিয় বিগ্রহটি তুলে নিয়ে দূরে কোন ময়লা-আবর্জনার গর্তে ফেলে আসতে লাগলেন। সকালে 'আমর তাঁর প্রিয় বিগ্রহটির এমন করুণ দশা দেখে দারুণ দুঃখ পেতেন। আবার সেটা কুড়িয়ে এনে ধুয়ে মুছে সুগন্ধি লাগিয়ে পূর্ব স্থানে রেখে দিতেন। এ প্রক্রিয়া কিছু দিন যাবত চলতে লাগলো। অবশেষে একদিন নিরুপায় হয়ে বিগ্রহটির কাঁধে একখানি তরবারি ঝুলিয়ে বললেন, কারা তোমার সাথে এমন অশোভন আচরণ করছে আমার তা জানা নেই। যদি জানতে পারতাম, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতাম। এই থাকলো তরবারি। তুমি কিছু করতে পারলে কর।

তরুণরা তখন আর একটি নতুন খেলা খেললেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে বিগ্রহটি উঠিয়ে নিয়ে তরবারিটি সরিয়ে নিলেন এবং তার সাথে একটি মরা কুকুর বেঁধে ময়লার গর্তে ফেলে রাখলেন। সকালে 'আমর তাঁর উপাস্যের এমন অবমাননা দেখে ক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে সঠিক পথের দিশা পেলেন। প্রকৃত সত্য তাঁর চোখে ধরা পড়লো। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর তখনকার সেই অনুভূতি তিনি একটি কবিতায় ধরে

রেখেছেন। এখানে তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ

১. আল্লাহর নামের শপথ! যদি তুমি ইলাহ হতে তাহলে ময়লার গর্তে এভাবে কুকুরের সাথে এক রশিতে বাঁধা থাকতে না।

২. সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি দানশীল, সৃষ্টির রিযিকদাতা ও দ্বীনের বিধান দানকারী।

৩. তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন কবরের অন্ধকারে বন্দী হওয়ার পূর্বে।

অন্য একটি কবিতায় তিনি বলেন ঃ

১. আমি পূতঃ পবিত্র আল্লাহর নিকট তাওবা করছি। আমি আল্লাহর আগুন থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

২. প্রকাশ্য ও গোপনে আমি তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসা করছি।[৫]

ইবন ইসহাক 'আমর ইবন আল-জামূহের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ভিন্ন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বনু সালামার তরুণদের সাথে 'আমরের স্ত্রী-পুত্রও ইসলাম গ্রহণ করলেন। একদিন 'আমর স্ত্রীকে বললেন, এ সব যুবক কি করে তার শেষ না দেখা পর্যন্ত তুমি তোমার পরিবারের কাউকে তাদের দলে ভিড়তে দিওনা। স্ত্রী বললেন ঃ আমি না হয় তা করলাম; কিন্তু আপনার ছেলে এই ব্যক্তি[৬] সম্পর্কে কি সব কথাবার্তা বলে তাকি আপনি শোনেন? 'আমর বললেন ঃ সম্ভবত সে ধর্মত্যাগী হয়েছে। স্ত্রী বললেন ঃ না। সে তার গোত্রীয় লোকদের সাথে ছিল। তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। 'আমর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এই লোকটির কোন কথা শুনেছো? বললেন ঃ হ্যাঁ, শুনেছি। এরপর সূরা আল-ফাতিহার প্রথম থেকে পাঠ করে শোনালেন। 'আমর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এভাবে ঃ 'একি মিষ্টিমধুর বাণী! তার সব বাণীই কি এমন? স্ত্রী বললেন ঃ হায়রে আমার কপাল! এর চেয়েও ভালো। আপনার গোত্রীয় লোকদের মত আপনিও কি বাই'য়াত বা শপথ করতে চান? বললেন ঃ না, আমি তা করছি না। আমি একটু 'মানাত' দেবীর সাথে পরামর্শ করতে চাই। দেখি সে কি বলে। আরবদের প্রথা ছিল, তারা মানাতের কথা শুনতে চাইলে একজন বৃদ্ধা তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার পক্ষে উত্তর দিত। 'আমর মানাতের কাছে আসলে বৃদ্ধাটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি মানাতের সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন ঃ শোন মানাত! এই লোকটি (মুস'য়াব) তোমার সম্পর্কে কত কথা বলে বেড়াচ্ছে, আর তুমি নীরব শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। এ ব্যক্তি তোমার ইবাদাত করতে নিষেধ করছে, তোমাকে পরিত্যাগ করতে বলছে। আমি তোমার পরামর্শ ব্যতীত তার হাতে বাইয়াত করতে চাইনা। বল, আমি কি করতে পারি। তিনি দীর্ঘক্ষণ পরামর্শ চাইলেন; কিন্তু মানাত কোন সাড়া দিল না। তারপর তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন ঃ সম্ভবত তুমি রাগ করেছো। ঠিক আছে এখন থেকে তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মানাতের মূর্তিটি ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেললেন।[৭]

হযরত 'আমরের ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে আরো কিছু অপ্রসিদ্ধ মতামত আছে। ইবনুল আসীর বলেন, একটি বর্ণনা মতে তিনি আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত ও বদরে অংশ গ্রহণ করেন। তবে ইবন ইসহাক তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে তাঁকে 'আকাবা ও বদরের তাবকা বা স্তরে উল্লেখ করেননি।[৮] কালবী বলেছেন, তিনি আনসারদের মধ্যে সর্বশেষ ইসলাম গ্রহণকারী।[৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে আনসার-মুহাজিরদের মধ্যে যে দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন, একটি বর্ণনা মতে, তাতে 'উবাইদা ইবনুল হারেস ও 'আমরের মধ্যে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০]

বদর যুদ্ধে হযরত 'আমরের (রা) যোগদানের ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে সঠিক মত এই যে, তিনি বদরে যোগদান করেননি। কোন কারণে তিনি পায়ে আঘাত পান এবং খোঁড়া হয়ে যান। এ অবস্থায়ও তিনি যুদ্ধে যেতে চাইলে ছেলেরা রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে বিরত রাখেন। তাঁরা বোঝান যে, এ অবস্থায় তাঁর ওপর জিহাদ ফরজ নয়।

উহুদের রণ-দামামা বেজে উঠলো। 'আমর ছেলেদের ডেকে বললেন, তোমরা আমাকে বদরে যেতে দাওনি। এবার আমি তোমাদের কোন নিষেধ মানবো না। এ যুদ্ধে আমি যাবই। ইবন ইসহাক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ 'আমর ইবন আল-জামূহ ছিলেন মারাত্মক ধরনের খোঁড়া। সিংহের মত তাঁর চার ছেলে ছিল। সকল কাজ ও ঘটনায় তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থাকতেন। উহুদের দিনে তাঁরা তাঁদের পিতাকে যুদ্ধে গমন থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে মা'জুর (অক্ষম) করেছেন। আপনার যুদ্ধে যাওয়ার দরকার নেই। 'আমর (রা) খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন ঃ আমার ছেলেরা আমাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করছে। আল্লাহর কসম! এ খোঁড়া পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমি জান্নাতে যেতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তো আপনাকে মা'জুর করেছেন। জিহাদ আপনার ওপর ফরজ নয়।' একথার পরও 'আমরকে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল দেখে রাসূল (সা) তাঁর ছেলেদের বললেনঃ তোমরা আর তাঁকে বাধা দিওনা। আল্লাহ্ পাক হয়তো তাঁকে শাহাদাত দান করবেন।[১১]

ইমাম সুহাইলী বলেন ঃ অন্যরা আরো বলেছেন, 'আমর বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় অন্তরে সবটুকু বিনীত ভাব ঢেলে দিয়ে দু'আ করেন ঃ

'ইলাহী! তুমি আর আমাকে মদীনায় ফিরিয়ে এনো না।' আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর এ আকুল আবেদন কবুল হয়ে যায়। তিনি শহীদ হন।[১২]

উহুদে যুদ্ধ শুরু হলো। 'আমরও প্রাণপণ করে যুদ্ধ করছেন। প্রচন্ড যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। তখন তিনি ছেলে খাল্লাদকে সাথে নিয়ে পৌত্তলিক বাহিনীর ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালান। দারুণ সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে পিতা-পুত্র

এক সাথে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত 'আমরের (রা) তীব্র বাসনা ও রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলো। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে জান্নাতে পৌছে গেলেন। এটা হিজরী ৩য়/খ্রীঃ ৬২৫ সনের ঘটনা।[১৩]

যুদ্ধ ক্ষেত্রে হযরত 'আমরের (রা) প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। রাসূল (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। লাশটি দেখে চিনতে পেরে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ 'আল্লাহ তাঁর কোন কোন বান্দার কসম পূরণ করেন। 'আমর তাদেরই একজন। আমি তাঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জান্নাতে হাঁটতে দেখতে পাচ্ছি।' 'আমর ও খাল্লাদের (রা) ঘাতক আল-আসওয়াদ ইবন জা'উনা।[১৪]

'আমরের (রা) শাহাদাতের খবর তাঁর স্ত্রীর কাছে পৌছলে তিনি একটি উট নিয়ে আসেন এবং স্বামী ও ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (জাবিরের (রা) পিতা)-এর লাশ দু'টি উটের পিঠে উঠিয়ে বাড়ীতে নিয়ে যান। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হয়, উহুদের রণ-ক্ষেত্রেই সকল শহীদকে দাফন করা হবে। রাসূল (সা) 'আমরের স্ত্রীর নিকট থেকে লাশ দু'টি ফিরিয়ে আনেন এবং উহুদের সকল শহীদের সাথে দাফন করেন[১৫]। ইবন ইসহাক বনু সালামার কতিপয় সম্মানীয় বৃদ্ধ ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) উহুদের শহীদদের দাফনের সময় বলেন ঃ তোমরা 'আমর ইবন জামূহ ও আবদুল্লাহ ইবন হারামের দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। দুনিয়াতে তারা একই সারিতে সারিবদ্ধ ছিল। তাদেরকে একই কবরে দাফন কর।[১৬] তাদেরকে এক কবরে একই সাথে দাফন করা হয়।

তবে ইমাম সুহাইলী বর্ণনা করেন যে, 'আমরের ছেলেরা তাঁর লাশ মদীনায় আনার জন্য একটি উটের ওপর উঠান। উট অবাধ্য হয়ে যায়। শত চেষ্টা করেও তাঁরা উটটি মদীনার দিকে আনতে পারলেন না। তখন তাদের স্মরণ হলো পিতার অন্তিম দু'আটির কথা ঃ 'প্রভু হে, আমাকে আর মদীনায় ফিরিয়ে এনো না।' তারা আর অহেতুক চেষ্টা করলেন না। পিতাকে তাঁরা তাঁর নিহত হওয়ার স্থলেই দাফন করেন।[১৭]

ইমাম মালিক 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উহুদে শাহাদাত প্রাপ্ত 'আমর ইবন জামূহ ও আবদুল্লাহ ইবন 'আমরকে পানির নালার ধারে এক সাথে কবর দেওয়া হয়। বহু বছর পর স্রোতে কবরটি ভেঙ্গে যায় এবং লাশ দু'টি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। যেন তাঁরা গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যত্র কবর দেওয়ার জন্য লাশ দু'টি তোলা হলো। আবদুল্লাহ ছিলেন আহত। তাঁর একটি হাত ক্ষত স্থানটির ওপর রাখা ছিল। সেখান থেকে হাতটি সরিয়ে দিলে আবার ক্ষত স্থানটির ওপর গিয়ে পড়ছিল। এভাবেই তাঁদেরকে আবার দাফন করা হয়। উহুদের যুদ্ধ ও এই ঘটনার মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ছিল প্রায় ৪৬ (ছেচল্লিশ) বছর।

জাবির বলেন ঃ কবর থেকে তোলার পর আমি আমার পিতাকে দেখলাম তিনি যেন কবরে ঘুমিয়ে আছেন। দেহের কোন অংশ বিন্দুমাত্র বিকৃত হয়নি। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, তাঁদের কাফনের অবস্থা কিরূপ দেখেছিলেন? বললেন ঃ এক টুকরো কাপড় দিয়ে

মুখসহ উপর দিক ঢাকা ছিল। আর পায়ের দিকে ছিল 'হারমাল' নামক এক প্রকার ঘাস। এ দু'টি বস্তুও অক্ষত ছিল।[১৮]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমরের (রা) ছিল চার ছেলে। তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাথে সকল যুদ্ধ ও ঘটনায় শরীক ছিলেন। সীরাত গ্রন্থ সমূহে দুইজনের নাম পাওয়া যায়। মু'য়াজ ও খাল্লাদ। মু'য়াজ (রা) পিতার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 'আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত বা শপথে অংশ গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেন। খাল্লাদ (রা) উহুদের অন্যতম শহীদ। এছাড়া 'আমরের (রা) আবু আয়মান নামক এক দাসও এ যুদ্ধে শহীদ হন।[১৯] একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে বড় গৌরব ও সম্মানের আর কি হতে পারে?

'আমরের (রা) গর্বিত স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দা বিনতু 'আমর। বনু সালামার এক নেতা, উহুদের শহীদ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারামের বোন এবং প্রখ্যাত সাহাবী জাবির ইবন 'আবদিল্লাহর (রা) আপন ফুফু।

'আমর (রা) ছিলেন দীর্ঘদেহী, উজ্জ্বল গৌর বর্ণের। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। পা ছিল খোঁড়া।[২০] অতিথি সেবা ও দানশীলতা হচ্ছে 'আরবদের প্রাচীন ঐতিহ্য। তাঁর দানশীলতার জন্য রাসূল কারীম (সা) তাঁকে বনু সালামার নেতা ঘোষণা করেন। ঘটনাটি এই রকম। একবার বনু সালামার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্র (সা) নিকট আসলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের নেতা কে? তারা বললো ঃ জাদ্দ ইবন কায়স। সে একজন কৃপণ ব্যক্তি। তাদের কথা শুনে রাসূল বললেন ঃ কৃপণতার চেয়ে নিকৃষ্ট রোগ আর নেই। তোমাদের নেতা বরং 'আমর ইবন আল-জামূহ।[২১] অবশ্য ইমাম যুহরীর একটি বর্ণনা বিশর ইবন আল-বারার নামটি এসেছে।[২২] এ ঘটনাকে আনসারদের একজন কবি কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন।[২৩] তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

১. রাসূল (সা) বললেন- আর তাঁর কথাইতো সত্য-তোমাদের নেতা কে?
২. তারা বললো ঃ জাদ্দ ইবন কায়স। যদিও সে আমাদের নেতৃত্ব দেয়, সে একজন কৃপণ।
৩. সে এমন এক যুবক যে পৃথিবীবাসীর প্রতি কোন পদক্ষেপ নেয়না এবং কারো প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায় না।
৪. অতএব, তিনি 'আমর ইবন জামূহকে নেতা বানালেন তাঁর দানশীলতার জন্য। দানশীলতার কারণে নেতৃত্ব দানের অধিকার 'আমরেরই।
৫. কোন সাহায্যপ্রার্থী তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁর সম্পদ তাকে দেন। আর বলেন, এগুলি লও এবং আগামীকাল আবার এসো।

রাসূল কারীমের প্রতি ছিল তাঁর প্রচন্ড ভক্তি ও ভালোবাসা। রাসূল (সা) যখন কোন শাদী

করতেন তিনি নিজ উদ্যোগে তার ওলীমা করতেন।[২৪]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-আ'লাম- ৫/৭৫
২. আল-ইসাবা- ২/৫২৯
৩. সীয়ারে আনসার- ২/১১২
৪. সিফাতুস সাফওয়া- ১/২৬৫
৫. উসুদুল গাবা-৪/৯৪; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫২; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর- ১/১৮৫; আল-ইসাবা-২/৫২৯।
৬. ব্যক্তি দ্বারা এখানে হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের (রা) প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'আকাবার শপথের পর মদীনাবাসীদের অনুরোধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মুবাল্লিগ হিসাবে তাঁকে মক্কা থেকে মদীনায় পাঠান। তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।
৭. হায়াতুস সাহাবা-১/২৩১
৮. উসুদুল গাবা-৪/৯৩
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৩; আল-আ'লাম-৫/৭৫
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২৭০
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯০-৯১; উসুদুল গাবা-৪/৯৪
১২. সীরাতু ইবন হিশাম ঃ টীকা-২/৯১
১৩. আল-আ'লাম-৫/৭৫; উসুদুল গাবা-৪/৯৪
১৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৩
১৫. উসুদুল গাবা-৪/৯৩
১৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৮
১৭. সীরাতু ইবন হিশাম ঃ টীকা-২/৯১
১৮. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৬৩; তাবাকাত-৩/৫৬২
১৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১২৬
২০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৩
২১. আল-আ'লাম-৫/৭৫; আল-ইসাবা-২/৫২৯
২২. উসুদুল গাবা-৪/৯৩
২৩. প্রাগুক্ত-৪/৯৩
২৪. আল-ইসাবা-২/৫২৯; আল-ইসতী'য়াব-২/৫০৩

'আমর ইবন হায্ম (রা)

'আমর (রা) এর ডাকনাম আবু আদ-দাহ্হাক। মতান্তরে আবু মুহাম্মদ। পিতা হায্ম ইবন যায়িদ মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার ছেলে এবং মাতা বনু সায়িদা শাখার মেয়ে।[১] হযরত আম্মারা ইবন হায্ম (রা)- যিনি 'আকাবার বাইয়াতে শরীক ছিলেন, 'আমরের বৈমাত্রীয় ভাই।[২]

ইসলামের সূচনাপর্বে ও হিজরাতের সময় পর্যন্ত আমর ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এ কারণে তিনি যে কখন ইসলাম গ্রহণ করেন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবতঃ নিজের পরিবারের লোকদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

যুদ্ধে যাওয়ার বয়স না হওয়ার কারণে বদর ও উহুদ যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। ইবন হিশাম বলেনঃ রাসূল (সা) বয়স কম হওয়ায় উমামা ইবন যায়িদ, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার ইবন আল খাত্তাব, যায়িদ ইবন সাবিত, আল-বারা' ইবন 'আমির, 'আমর ইবন হায্ম ও উসাইদ ইবন জুহাইরকে উহুদ যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেননি। তাঁরা যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রাসূল (সা) তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেন। খন্দক যুদ্ধের সময় যোগদানের অনুমতি দেন।[৪] ইবন ইসহাক বলেনঃ 'আমর পনেরো বছর বয়সে খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন।[৫] খন্দক পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধ খন্দক।[৬]

ইবন ইসহাক বলেনঃ রাসূল (সা) হিজরী দশ সনের রাবীউল আওয়াল অথবা জামাদিউল আওয়াল মাসে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে নাজরানের বনু আল হারিস ইবন কা'ব-এর নিকট পাঠান। যাওয়ার সময় তাঁকে নির্দেশ দেন, তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার আগে তিনবার তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করলে তুমি তা মেনে নেবে। প্রত্যাখ্যান করলে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। খালিদ সেখানে পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা গ্রহণ করে। খালিদের আপ্রাণ চেষ্টায় নাজরানের অধিবাসীরা ইসলাম কবুল করে। খালিদ সেখানে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাত শিক্ষা দিতে থাকেন।

এক পর্যায়ে খালিদ (রা) নাজরানের সঠিক অবস্থা বর্ণনা করে রাসূলকে (সা) পত্র লেখেন। উত্তরে রাসূলও (সা) একটি পত্র খালিদকে (রা) পাঠান। তাতে তিনি বনু আল-হারিসের একটি প্রতিনিধিদল সংগে করে মদীনায় আসার জন্য খালিদকে নির্দেশ দেন। খালিদ একটি প্রতিনিধি দল সাথে নিয়ে মদীনায় আসেন। প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ইবন হিশাম বলেনঃ এ দলটি শাওয়াল মাসের শেষ অথবা জুল কা'দাহ মাসের প্রথম দিকে স্বদেশ ফিরে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার পর রাসূল (সা) মাত্র চার মাস জীবিত ছিলেন।

ইবন হিশাম আরো বলেন, প্রতিনিধিদলটি ফিরে যাওয়ার পর রাসূল (সা) তাদেরকে দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানদান, ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের শিক্ষা দান এবং যাকাত ও সাদাকা আদায়ের জন্য আমর ইবন হায্মকে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে তাদের কাছে পাঠান। যাত্রার পূর্বে তাঁর দায়িত্বের পরিধি এবং কর্ম পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে রাসূল (সা) তাঁকে একখানি লিখিত অঙ্গীকারপত্র দান করেন।[৭] এখানে পত্রটির ভাবার্থ দেওয়া হলোঃ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ আল্লাহ ও রাসূলের ঘোষণা, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর।' এটা আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে 'আমর ইবন হায্মের প্রতি অঙ্গীকার- যখন তাকে ইয়ামন পাঠানো হচ্ছে। তিনি তাকে সকল ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা, তাঁকে যারা ভয় করে ও মানুষের উপকার করে, তাদের সংগে থাকেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহর নির্দেশ মত সত্যসহকারে মানুষের অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করার।

তুমি মানুষের কল্যাণের সুসংবাদ দেবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে। কুরআন শিক্ষা দেবে, তাদের সামনে কুরআনের গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে এবং তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। কেউ পবিত্র অবস্থায় ছাড়া কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। মানুষের অধিকার ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য তাদেরকে অবহিত করবে। মানুষ হক বা সত্যের ওপর থাকলে তাদের প্রতি কোমল হবে, তারা অত্যাচারী হলে কঠোর হবে। কারণ, আল্লাহ অত্যাচার অপসন্দ করেন এবং অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ 'সাবধান! অত্যাচারীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' মানুষকে জান্নাত ও জান্নাতের কাজসমূহের সুসংবাদ দেবে। তেমনিভাবে জাহান্নাম ও জাহান্নামের কাজগুলি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে।

মানুষের সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। যাতে তারা দ্বীন বুঝতে পারে। হজ্জের নিদর্শনসমূহ, সুন্নাত ও ফরজসমূহ এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ যা বর্ণনা করেছেন তা তাদেরকে অবহিত করবে। হজ্জে আকবর সম্পর্কে জানাবে। হজ্জ দুই প্রকার ঃ হজ্জে আকবর ও হজ্জে আসগর। 'উমরা হচ্ছে হজ্জে আসগর। মানুষকে একখানা ছোট কাপড়ে নামায পড়তে নিষেধ করবে। দুই কাঁধের ওপর আর একখানা কাপড় পেঁচানো থাকতে হবে। মানুষকে একখানা কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে পরতে নিষেধ করবে যেন একটি ছিদ্র দিয়ে মাথাটি আকাশের দিকে উঁচু হয়ে আছে। মাথার পেছন দিকে চুলের বেনী বাঁধতে নিষেধ করবে।

উত্তেজিত হয়ে গোত্র ও সম্প্রদায়কে আহবান জানাতে মানুষকে নিষেধ করবে। তাদের আহবান হবে কেবল আল্লাহর দিকে। কেউ আল্লাহর দিকে না ডেকে গোত্র ও সম্প্রদায়ের দিকে আহবান জানালে তরবারি দিয়ে মাথাটি কেটে ফেলবে। যাতে, তাদের আহবান হয় এক আল্লাহর দিকে। মানুষকে পরিপূর্ণরূপে অজু করতে আদেশ করবে। আল্লাহ যেমন মুখমন্ডল, কনুই পর্যন্ত দুই হাত, গিরা পর্যন্ত দুই পা ধুইতে এবং মাথা মসেহ করতে

বলেছেন, সেইভাবে। সঠিক সময়ে নামায আদায় করতে ও যথাযথভাবে রুকু-সিজদা করতে আদেশ করবে। সকালের নামায অন্ধকারে, জুহরের নামায সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে গেলে, আসরের নামায সূর্য পৃথিবীর দিকে পিছন দিলে এবং মাগরিবের নামায রাতের আগমন ঘটলে আদায় করতে মানুষকে আদেশ করবে। মাগরিবের নামায আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় এমন সময় পর্যন্ত দেরী করবে না। রাতের প্রথম ভাগে ঈশার নামায আদায় করতে বলবে। জুম'আর নামাযের আজান হলে সব কাজ বন্ধ করে জুম'আর নামাযে যেতে বলবে। যাওয়ার আগে গোসল করতে বলবে।

গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর। ভূ-সম্পত্তির উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত আল্লাহ ফরজ করেছেন। বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচযোগ্য ভূমির উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ। প্রতি দশটি উটে দুইটি বকরী ও প্রতি বিশটিতে চারটি বকরী। প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি গরু এবং প্রতি তিরিশটি গরুতে একটি বাছুর যাকাত দিতে হবে। প্রতি চল্লিশটি ছাগলে একটি বকরী দিতে হবে। এ যাকাত আল্লাহ মুমিনদের ওপর ফরজ করেছেন। যে এর অতিরিক্ত দেবে, তা তার জন্য হবে কল্যাণকর।

যে কোন ইয়াহুদী অথবা নাসারা নিষ্ঠাসহকারে মুসলমান হবে এবং ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলবে সে সত্যিকার মুমিন বলে বিবেচিত হবে। মুমিনদের সমান অধিকার যেমন সে ভোগ করবে, তেমনি সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যও তার ওপর বর্তাবে। আর যে ইয়াহুদী ও নাসারা তার নিজ ধর্মে থেকে যাবে তাকে কোন রকম বাধা দেওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, স্বাধীন ও দাস নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের ওপর পূর্ণ এক দীনার অথবা তার পরিবর্তে কাপড় দিতে হবে। যারা তা ঠিকমত দেবে তাদের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। যে তা দিতে অস্বীকার করবে সে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও মুমিন সকলের শত্রু। মুহাম্মাদের ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। ওয়াস সালামু 'আলাইহি ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।'

নাজরানে সরকার পরিচালনার পাশাপাশি ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। তিনি শিক্ষাদান ও তাবলীগের দায়িত্বও পালন করতেন। ইবনুল আসীর বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নাজরানবাসীদেরকে ফিকাহ ও কুরআন শিক্ষা দান ও তাদের নিকট থেকে যাকাত ও সাদাকা আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৮]

ইবন হাজার বলেনঃ রাসূল (সা) 'আমরকে যখন নাজরানে পাঠান তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। ইবন সা'দও এ কথা বলেছেন।[৯] কিন্তু তাঁদের এ কথা সঠিক নয় বলে মনে হয়। কারণ সীরাত ও ইতিহাসের সকল গ্রন্থে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হিজরী দশ সনে নাজরানে যান। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে খন্দক যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল পনেরো বছর। ইবন হাজার তাঁর 'তাহজীবুত তাহজীব' (৮/৯) গ্রন্থেও বলেছেন তিনি পনেরো বছর বয়সেই খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন। আর একথা তো সত্য যে খন্দক যুদ্ধ হয় হিজরী পঞ্চম সনে। অতএব হিজরী দশ সনে কোন অবস্থাতে তাঁর বয়স বিশ বছরের কম হতে পারে না।

হযরত 'আমর (রা) মদীনা থেকে নাজরান যাওয়ার সময় স্ত্রীকেও সংগে নিয়ে যান। স্ত্রীর নাম ছিল 'উমরা। নাজরান পৌছার পর সেই বছরই তাঁদের এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। পিতা-মাতা সন্তানের নাম রাখেন মুহাম্মাদ এবং ডাক নাম আবু সুলায়মান। এ খবর মদীনায় রাসূলের (সা) নিকট পৌছালে তিনি সন্তানের নাম মুহাম্মাদ ও ডাকনাম আবু আবদিল মালিক রাখার জন্য লিখে পাঠান।[১০] ইমাম আল হাযেমী এই মুহাম্মাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ যাদেরকে ইয়ামনের নাজরানের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আবু আবদিল মালিক মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হায্ম তাদের একজন। তাঁকে নাজরানী বলা হয়। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে হিজরী দশ সনে সেখানে জন্ম গ্রহণ করেন। মদীনার আনসাররা 'আল-হাররা'-এর দিনে তাঁকেই ওয়ালী মনোনীত করেন এবং হিজরী ৬৩ সনে তিনি আল হাররা'র ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন।[১১]

হযরত আমরের (রা) দুই স্ত্রী। প্রথমার নাম 'উমরা। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিস আল- গাস্সানীর কন্যা। এই আবদুল্লাহ ছিলেন মদীনায় বহিরাগত এবং মদীনার সায়িদা গোত্রের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ।[১২] দ্বিতীয়ার নাম সাওদা বিনতু হারিসা।[১৩] 'আমরের (রা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

'আমরের (রা) সন্তানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে ছেলে মুহাম্মাদ, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করেন, খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তিনি 'উমার (রা)ও অন্যদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতাকে দেওয়া রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠিটি তিনি লোকদের দেখিয়ে বলতেন, এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চিঠি। তিনি 'আমর ইবন হায্মকে ইয়ামনে পাঠানোর সময় তাঁকে দিয়েছিলেন।[১৪] প্রখ্যাত মুজতাহিদ ও ফকীহ কাজী আবুবকর ছিলেন এই মুহাম্মাদের পুত্র।[১৫]

গভীর জ্ঞান, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা এবং শরীয়াতের বিধি-বিধানে অপরিসীম দখল ছিল তাঁর। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল (সা) কর্তৃক তাঁকে নাজরানের ওয়ালী নিয়োগের মাধ্যমে। মাত্র বিশ বছর বয়সে শাসন পরিচালনার মত গুরুদায়িত্ব পালন এবং কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদান তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত নাজরান যাওয়ার প্রাক্কালে রাসূলে করীম (সা) যে লিখিত পুস্তিকাটি তাঁকে দান করেন তা আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন হিব্বান, দারেমী প্রমুখ মুহাদ্দিসীন বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের কয়েক জনের নাম এখানে দেওয়া হলোঃ

স্ত্রী সাওদা, পৌত্র আবু বকর, পুত্র মুহাম্মদ, নাদার ইবন আবদুল্লাহ সালামী এবং যিয়াদ ইবন নু'য়াইম আল- হাদরামী।[১৬]

'আমরের (রা) চরিত্রের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো সততা ও সত্যবাদিতা। কারও রক্তচক্ষু কখনো তাঁকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। প্রখ্যাত সাহাবী 'আম্মার ইবন

ইয়াসির (রা) সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) ভবিষ্যৎদ্বাণী করেন যে, একটি বিদ্রোহী দল তাঁকে হত্যা করবে। সিফফীন যুদ্ধে 'আম্মার (রা) 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করে মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর হাতে শহীদ হন। আম্মারের শাহাদাতের পর আমর যান মু'য়াবিয়ার (রা) পৃষ্ঠপোষক 'আমর ইবনুল আসের (রা) নিকট এবং বলেনঃ 'আম্মার তো নিহত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী আছেঃ 'তাঁকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।' এরপর তিনি যান মু'য়াবিয়ার (রা) নিকট। বলেনঃ আম্মার তো নিহত হয়েছে। মু'য়াবিয়া (রা) বললেনঃ 'আম্মার নিহত হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? 'আমর বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। মু'য়াবিয়া (রা) বললেনঃ তুমি তোমার যুক্তিতে ভুল করছো। আমরা কি তাকে হত্যা করেছি? তাকে হত্যা করেছে আলী ও তাঁর সংগী সাথীরা। তাঁরাই তাঁকে আমাদের বর্শা ও তরবারির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।[১৭]

মু'য়াবিয়া (রা) তখন খলীফা। একবার 'আমর (রা) গেলেন খলীফার দরবারে এবং তাঁর শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস শোনালেন। তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনেছি, কিয়ামতের দিন রাজাকে তার প্রজাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।[১৮]

মুসনাদে আবু ই'য়ালা গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'য়াবিয়া (রা) যখন স্বীয় পুত্র ইয়াযিদের জন্য বা'ইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেন তখন একবার তাঁর সাথে 'আমরের (রা) শক্ত বাকযুদ্ধ হয়।[১৯]

'আমরের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে মতবিরোধ আছে। হিজরী ৫১, ৫৩ ও ৫৪ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে। আবু নু'য়াইম বলেন, 'আমর ইবন হাযম 'উমারের (রা) খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীম ইবন মুনজিরও তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। তবে হিজরী পঞ্চাশ সনের পর মারা গেছেন বলে যে সকল মত বর্ণিত হয়েছে, ইবন হাজার তার কোন একটি সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ, মু'য়াবিয়ার (রা) সাথে তাঁর যে ঝগড়া হয় তা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না। তিনি মদীনায় মারা যান।[২০]

'আমর ইবন হাযম বলেনঃ রাসূল (সা) একদিন আমাকে একটি কবরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেনঃ নেমে এসো। কবরে শায়িত ব্যক্তিকে কষ্ট দিও না।[২১]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাহজীবুত তাহজীব- ৮/১৮; উসুদুল গাবা- ৪/৯৯; অ'ল-আ'লাম -৫/২৪৪, তারীখলিজ জাহাবী- ২/৩০৯,
২. আনসাবুল আশরাফ- ১/২৪২
৩. সীয়ারে আনসার- ২/১১৭
৪. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৬৬; তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা- ১/৪৩৫; আল ইসতীয়াব-২/৫১৭; আল-ইসাবা-২/৫৩২
৫. তাহজীবুত তাহজীব ৮/১৯

৬. উসুদুল গাবা-৪/৯৯

৭. আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবন হিব্বান, দারেমীসহ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে রাসূলুল্লাহর (সা) এ অঙ্গীকার পত্র সহ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া দেখুনঃ সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৯২-৫৯৬; ইবন কাসীরের আস সীরাতুন নাবাবিয়া-২/৩৫০-৩৫১; আনসাবুল আশরাফ-১/৫২৯; উসুদুল গাবা-৪/৯৯; তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৪৩৫; ফুতুহুল বুলদান লিল বালাজুরী-৭৭; সুবহুল আ'শা-১০/৯; তারীখুত তাবারী-৩/১৫৭; জামহারাতু রাসায়িল আল-আরাব-১/৬৪; কিতাবুল খিরাজলি আবী ইউসুফ-৮৫

৮. উসুদুল গাবা-৪/৯৯; আল-ইসতীয়াব-২/৫১৭

৯. তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৯; তারীখ লিজ জাহাবী-২/৩০৯,

১০. তাবাকাত-৫/৫০

১১. মু'জামুল বুলদান-৫/২৭০

১২. তাবাকাত -৫/৫০

১৩. তাহজীবুত তাহজীব-৮/২০

১৪. হায়াতুস সাহাবা- ৩/১৯৪

১৫. মু'জামুল বুলদান-৫/২৭০

১৬. তাহজীবুত তাহজীব- ৮/১৯; উসুদুল গাবা-৪/৯৯, আল ইসতী'য়াব-২/৫১৭; তারীখ লিজ জাহাবী-২/৩০৯.

১৭. সীয়ারু আ'লামিন নুবালা-১/৩০০,৩০৫,

১৮. উসুদুল গাবা- ৪/৯৯

১৯. তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৯; উসুদুল গাবা-৪/৯৯

২০. আল আ'লাম-৫/২৪৪; তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৯; আল ইসতীয়াব-২/৫১৭; আল ইসাবা-২/৫৩২

২১. আল ইসাবা-২/৫৩২

কা'ব ইবন মালিক (রা)

কা'ব (রা) ইতিহাসের সেই তিন ব্যক্তির একজন যাঁরা আলস্যবশতঃ তাবুক যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকেন এবং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) ও মু'মিনদের বিরাগভাজনে পরিণত হন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁদের তাওবা কবুলের সুসংবাদ দিয়ে আয়াত নাযিল করেন।[১] হিজরাতের ২৫ বছর পূর্বে ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইয়াসরিবে জন্ম গ্রহণ করেন।[২] তাঁর অনেকগুলি কুনিয়াত বা ডাকনাম ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ আবূ 'আবদিল্লাহ, আবূ আবদির রহমান, আবূ মুহাম্মদ ও আবু বাশীর।[৩] ইবনে হাজারের একটি বর্ণনায় জানা যায়, জন্মের পর তাঁর পিতা মালিক ইবন আবী কা'ব 'আমর ছেলের ডাকনাম রাখেন আবূ বাশীর। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলে কারীম (সা) রাখেন আবূ আবদিল্লাহ। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান।[৪] মাতার নাম লায়লা বিনতু যায়িদ। পিতামাতা উভয়ে মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সালিমা শাখার সন্তান।[৫] তিনি একজন আকাবী ও উহুদী সাহাবী। ইবন আবী হাতেম বলেনঃ তিনি ছিলেন 'আহলুস সুফ্ফা'রও অন্যতম সদস্য।[৬] পঁচিশ বছর বয়সে গোত্রীয় লোকদের সাথে বাই'য়াতে 'আকাবায় শরীক হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭]

ইবনুল আসীর বলেনঃ প্রায় সকল সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, কা'ব 'আকাবার শেষ বাই'য়াতে শরীক ছিলেন।[৮] উরওয়া সেই সত্তর জনের মধ্যে তাঁর নামটি উল্লেখ করেছেন যাঁরা 'আকাবায় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন।[৯] বুখারী ও মুসলিমে এসেছে কা'ব বলেছেনঃ আমি বাই'য়াতে আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ইসলামের ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। তবে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে । তিনি বলেন, আমি লায়লাতুল আকাবার বাই'য়াত থেকে বঞ্চিত হই।[১০]

কা'ব ইবন মালিক যে 'আকাবার শেষ বাই'য়াতে শরীক ছিলেন তা ইবন ইসহাকের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে জানা যায়। এ বাই'য়াতের বিস্তারিত বিবরণ কা'ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে। সীরাতু ইবন হিশামে কা'বের জবানীতে তা হুবহু এসেছে। সংক্ষেপে তার কিছু এখানে তুলে ধরছি।

ইবন ইসহাক কা'ব-এর ছেলে আবদুল্লাহ ও মা'বাদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কা'ব মদীনা থেকে স্বগোত্রীয় পৌত্তলিক হাজীদের একটি কাফেলার সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। এ কাফেলার সাথে পূর্বেই ইসলাম গ্রহণকারী কিছু মুসলমানও ছিলেন। তারা দ্বীন বুঝেছিলেন এবং নামাযও পড়তেন। এ কাফেলায় তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা আল-বারা' ইবন মা'রূরও ছিলেন। চলার পথে তিনি একদিন বললেন, আমি আর এই কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে নামায পড়তে চাইনে। এখন থেকে কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়বো। কা'ব ও অন্যরা তাঁর এ কথায় আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমাদের নবী (সা) তো শামের বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে থাকেন। তাঁর

বিরোধিতা হয়, আমরা এমনভাবে নামায পড়তে চাইনা। এরপরও আল-বারা' তাঁর মতে অটল থাকলেন।

পথে নামাযের সময় হলে আল-বারা' কা'বার দিকে, কা'ব ও অন্যরা শামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে করতে মক্কায় পৌঁছলেন। তাঁরা আল-বারা'কে তাঁর এ কাজের জন্য তিরস্কার করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলোনা, তিনি স্বীয় মতে অনড় থাকলেন।

মক্কায় পৌঁছে আল-বারা' কা'ব কে বললেনঃ তুমি আমাকে একটু রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে চলো। আসার পথে আমি যে কাজ করেছি সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমাদের বিরোধিতা করে আমার মনটা ভালো যাচ্ছে না। কা'ব তাঁকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে চললেন। দুইজনের কেউই এর আগে রাসূলুল্লাহকে (সা) চিনতেন না এবং দেখেননি। পথে মক্কার দুই ব্যক্তির সাথে তাঁদের দেখা হলো। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁরা বললো: আপনারা কি তাঁকে চেনেন? কা'ব ও আল বারা' বললেনঃ না। তারা আবার প্রশ্ন করলোঃ তাঁর চাচা 'আব্বাসকে চেনেন? তাঁরা জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, 'আব্বাসকে চিনি। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি আমাদের ওখানে যাতায়াত করেন। তখন তারা বললোঃ আপনারা মসজিদে ঢুকে দেখবেন আব্বাসের সাথে একটি লোক বসে আছেন। তিনি সেই ব্যক্তি।

কা'ব ও আল-বারা' লোক দুইটির কথামত মসজিদে হারামে ঢুকে 'আব্বাসকে এবং তাঁর পাশে রাসূলুল্লাহকে (সা) বসা দেখতে পেলেন। সালাম দিয়ে তাঁদের পাশে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) 'আব্বাসকে বললেনঃ আবুল ফাদল! আপনি কি এ দুই ব্যক্তিকে চেনেন? আব্বাস বললেনঃ হাঁ। ইনি আল-বারা' ইবন মা'রূফ। তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা। আর ইনি কা'ব ইবন মালিক। কা'ব বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সেই প্রশ্নবোধক শব্দটি আজও ভুলিনি- 'কবি?' অর্থাৎ রাসূল (সা) আব্বাসকে প্রশ্ন করেনঃ একি সেই কবি কা'ব ইবন মালিক? আব্বাস জবাব দেনঃ হাঁ, ইনি সেই কবি কা'ব। এরপর কা'ব বর্ণনা করেছেন, কিভাবে কেমন করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো এবং কোন কথার ওপর তাঁরা বাই'য়াত করলেন।[১১] রাসূল (সা) যে বারোজন নাকীব মনোনীত করেন, কা'ব একটি কবিতায় তাঁদের পরিচয়ও ধরে রেখেছেন। ইবন হিশাম সে কবিতাটিও বর্ণনা করেছেন।[১২]

রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে দ্বীনী মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। 'আশারা মুবাশ্শারার সদস্য তালহা ইবন উবাইদুল্লাহর (রা) সাথে কা'বের এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। একথা ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন।[১৩] তবে উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) যুবাইর ও কা'বের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১৪] উহুদের দিন কা'ব আহত হলে যুবাইর তাঁকে মুমূর্ষ অবস্থায় কাঁধে বহন করে নিয়ে আসেন। সেদিন কা'ব মারা গেলে যুবাইর হতেন তাঁর উত্তরাধিকারী। পরবর্তীকালে সূরা আল আনফালের ৭৫ নং আয়াত -'বস্তুতঃ যারা উলুল আরহাম' বা

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তাঁরা পরস্পর বেশী হকদার- নাযিল করে এ বিধান রহিত করা হয়।[১৫]

একমাত্র বদর ও তাবুক ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলে কারীমের (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেন। ইবনুল কালবীর মতে, তিনি বদরে যোগদান করেন।[১৬] তবে অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞের নিকট এ মতটি স্বীকৃত হয়নি। আসল ঘটনা হলো, যে তাড়াহুড়ো ও দ্রুততার সাথে বদর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় তাতে অনেকের মত কা'বও অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকেন। এ কারণে রাসূল (সা) কাউকে কিছুই বলেননি।

কা'ব বলেনঃ তাবুক পর্যন্ত একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেছি। বদরে যাঁরা যাননি, রাসূল (সা) তাঁদেরকে কোন প্রকার তিরস্কার করেননি। মূলতঃ রাসূল (সা) মদীনা থেকে বের হন আবু সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফিলার উদ্দেশ্যে। আর এদিকে কুরাইশরা মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে আবূ সুফইয়ানের কাফেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মককায় পৌছার সুযোগ করে দিতে। বদরে উভয় পক্ষ মুখোমুখী হয় কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই। কা'ব আরও বলেন, বদর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বলে মানুষের নিকট বিবেচিত। তবে 'লাইলাতুল 'আকাবা'- যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) হাতে ইসলামের ওপর বাই'য়াত (অঙ্গীকার) করেছিলাম, তার পরিবর্তে বদর আমার নিকট মোটেই প্রাধান্যযোগ্য নয়। এরপর একমাত্র তাবুক ছাড়া আর কোন যুদ্ধ থেকে পিছনে থাকিনি।[১৭]

তবে কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় কা'ব বদরে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইবন ইসহাক কা'বের নামটি বদরে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।[১৮] তাছাড়া একটি বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বলেছেন: আমি মুসলমানদের সাথে বদরে যাই। যুদ্ধ শেষে দেখলাম পৌত্তলিক যোদ্ধাদের বিকৃত লাশ মুসলিম শহীদদের সাথে পড়ে আছে। আমি ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন পৌত্তলিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুসলিম শহীদদের অতিক্রম করছে। একজন অস্ত্রসজ্জিত যোদ্ধাও যেন তার অপেক্ষা করছিল। আমি একটু এগিয়ে এ দুইজনের ভাগ্য দেখার জন্য তাদের পিছনে দাঁড়ালাম। পৌত্তলিকটি ছিল বিরাট বপুধারী। আমি তাকিয়ে থাকতেই মুসলিম সৈনিকটি তার কাঁধে তরবারির এমন এক শক্ত কোপ বসিয়ে দেয় যে, তা তার নিতম্ব পর্যন্ত পৌঁছে তাকে দুইভাগ করে ফেলে। তারপর লোকটি মুখের বর্ম খুলে ফেলে বলেঃ কা'ব কেমন দেখলে? আমি আবূ দুজানা।[১৯] তবে অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁর বদরে অনুপস্থিত থাকার বর্ণনাগুলি সঠিক বলে মনে করেছেন।

উহুদ যুদ্ধে কা'ব তাঁর দ্বীনী ভাই তালহার (রা) সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই যুদ্ধে তিনি পরেন রাসূলুল্লাহর (সা) বর্ম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) পরেন তাঁর বর্ম। রাসূল (সা) নিজ হাতে তাঁকে বর্ম পরিয়ে দেন। এই উহুদে তাঁর দেহে মোট এগারো স্থানে যখম হয়।[২০] তবে বহু মুহাদ্দিস তাঁর দেহে সতেরোটি আঘাতের কথা বর্ণনা করেছেন।[২১]

এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলে কারীম (সা) শাহাদাত বরণ করেছেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একটা দারুণ হৈ চৈ পড়ে যায়। এ অবস্থায় কা'বই সর্বপ্রথম রাসূলকে (সা) দেখতে পান এবং গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন- রাসূল (সা) এই যে, এখানে। তোমরা এদিকে এসো। কা'ব তখন উপত্যকার মধ্যস্থলে। রাসূল (সা) তখন তাঁর হলুদ বর্ণের বর্ম দ্বারা তাঁকে ইঙ্গিত করে চুপ থাকতে বলেন।[২২]

উহুদের পরে যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে কা'ব (রা) দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহকারে যোগদান করেছেন। তবে ভাবতে অবাক লাগে যে, নবীর (সা) জীবনের প্রথম যুদ্ধ বদরের মত শেষ যুদ্ধ তাবুকেও তিনি যোগদান করতে ব্যর্থ হন। তাবুক ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ অভিযান। নানা কারণে একে কষ্টের যুদ্ধও বলা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) রীতি ছিল, যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে স্পষ্টভাবে কিছু বলতেন না। কিন্তু এবার রীতি বিরুদ্ধ কাজ করলেন। এবার তিনি ঘোষণা করে দিলেন। যাতে দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের জন্য মুসলমানরা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। কা'ব এই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দুইটি উট প্রস্তুত করেন। তাঁর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পূর্বের কোন যুদ্ধেই এতখানি সচ্ছল ও সক্ষম ছিলেন না, যতখানি এবার ছিলেন।

এ যুদ্ধের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) এতখানি গুরুত্বদান ও সতর্কতা অবলম্বনের কারণ এই ছিল যে, মূলতঃ সংঘর্ষটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার প্রবল পরাক্রমশালী রোমান বাহিনীর সাথে। সাজ-সরঞ্জাম, সংখ্যা, ঐক্য ও অটুট মনোবলের দিক দিয়ে তাদের বাহিনী ছিল বিশ্বের সেরা ও শক্তিশালী বাহিনী।

নবম হিজরীর রজব মাস শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের মওসুম। রাসূল (সা) তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন এবং সকলকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশও দিলেন।[২৩] সংগত ও অসংগত নানা অজুহাতে মোট তিরাশিজন (৮৩) সক্ষম মুসলমান এ যুদ্ধে গমন থেকে বিরত থাকেন। তাদের কিছু ছিল মুনাফিক (কপট মুসলমান)। কারও বাগানের ফল পাকতে শুরু করেছিল, তা ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা হয়নি। কেউ ভয় পেয়েছিল প্রচণ্ড গরম ও দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার। আবার কেউ ছিল অতি দরিদ্র, যার কোন বাহন ছিল না।[২৪]

ইবন ইসহাক বলেনঃ যাঁরা সন্দেহ সংশয় বশতঃ নয়; বরং আলস্যবশতঃ যোগদানে ব্যর্থ হন তারা মোট চার জন। কা'ব ইবন মালিক, মুরারা ইবন রাবী, হিলাল ইবন উমাইয়্যা ও আবূ খায়সামা। তবে আবূ খায়সামা একেবারে শেষ মুহূর্তে তাবুকে পৌঁছেন ও রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন।[২৫] কারও কারও মতে প্রচণ্ড গরমের কারণে তাঁরা তাবুক গমনে বিরত থাকেন।[২৬] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। কা'ব (রা) প্রতিদিনই যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেন; কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তাঁর সময় বয়ে যায়। তিনি প্রতিদিনই মনে মনে বলতেন

আমি যেতে পারবো। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাল্টে যেত। যাত্রার উদ্যোগ নিয়ে আবার থেমে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন মদীনায় খবর এলো, রাসূল (সা) তাবুক পৌঁছে গেছেন।

মদীনা ও তার আশ-পাশের সকল সক্ষম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাবুক চলে যান। কা'ব (রা) যখন মদীনা শহরে বের হতেন তখন শুধু শিশু, বৃদ্ধ ও কিছু মুনাফিক ছাড়া আর কোন মানুষের দেখা পেতেন না। লজ্জা ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতেন। সুস্থ, সবল ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেন পিছনে থেকে গেলেন, সারাক্ষণ এই অনুশোচনার অনলে দগ্ধিভূত হতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সেনা বাহিনীর কোন দফতর ছিলনা। সুতরাং এত মানুষের মধ্যে কা'বের মত একজন লোক এলো কি এলো না, তা তাঁর জানা থাকার কথা নয়। একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ওহীই ছিল তাঁর জানার মাধ্যম। তাবুক পৌঁছে একদিন তিনি কা'ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কোন এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার এত সময় কোথায় যে সে এখানে আসবে? মু'য়াজ ইবন জাবাল কাছেই ছিলেন। তিনি প্রতিবাদের সুরে বললেন, আমরা তো তাঁর মধ্যে খারাপ কোন কিছু দেখিনি। একথা শুনে রাসূল (সা) চুপ থাকলেন।

রোমানদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন মারাত্মক সংঘর্ষ হলো না। উত্তর আরবের অনেক গোত্র জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধি করলো। রাসূল (সা) মদীনায় ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ফিরে আসার খবর কা'ব পেলেন। তাঁর অন্তরে তখন নানা রকম চিন্তার ঢেউ খেলছে। রাসূলুল্লাহর (সা) অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায় কি, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন পরিবারের লোকদের কাছে। কখনও এমন চিন্তাও তাঁর মনে উদয় হলো যে, সত্য অসত্য মিলিয়ে কিছু কারণ রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে তুলে ধরবেন। কিন্তু পরক্ষণেই এ চিন্তা যেন কোথায় হাওয়া হয়ে যেত। এ রকম দ্বিধা দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, কপালে যা আছে তাই হোক, কোনরকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় তিনি নেবেন না। যা সত্য তাই বলবেন।

এর মধ্যে দলে দলে আশি জনের মত লোক রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখলো। রাসূল (সা) তাদের সকলের ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য মনে করলেন। সকলের অপরাধ ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন এবং পুনরায় তাদের বা'ই'য়াত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

কা'ব (রা) আসলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। তাঁকে দেখে রাসূল (সা) মৃদু হেসে বললেনঃ এসো। কা'ব সামনে এসে বসার পর প্রশ্ন করলেনঃ যুদ্ধে যাওনি কেন? কা'ব বললেনঃ আপনার কাছে কী আর গোপন করবো? দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাহ হলে নানারকম কথার জাল তৈরী করে তাকে খুশী করতাম। সে শক্তি আমার আছে। আমি তো একজন বাগ্মী ও তর্কবাগিশ। আমি আপনার নিকট সত্য গোপন করবো না। এতে

হতে পারে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু মিথ্যা বললে এ মুহূর্তে আপনি খুশী হয়ে যাবেন। তবে আল্লাহ আপনাকে আমার ব্যাপারে নাখোশ করে দেবেন। আর তা আমার জন্য মোটেই সুখকর নয়। মূলতঃ আমার না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। আমি ছিলাম সুস্থ সবল এবং অর্থে-বিত্তেও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে সমর্থ। তবুও আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি যেতে পরিনি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেনঃ সত্য বলেছো। তুমি এখন যাও। দেখা যাক আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দান করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে উঠে আসার পর বনু সালেমার কিছু লোক তাঁকে বললো, আপনি এর আগে আর কোন অপরাধ করেননি। এটাই আপনার প্রথমবারের মত একটি অপরাধ। অথচ এর জন্য ভালোমত কোন ওজর ও আপত্তি উপস্থাপন করতে পারলেন না। অন্যদের মত আপনিও কিছু ওজর পেশ করতেন, রাসূল (সা) আপনার গোনাহ মাফের জন্য দু'আ করতেন, আর আল্লাহ মাফ করে দিতেন। কিন্তু তা আপনি পারলেন না। তাদের কথা শুনে কা'বের ইচ্ছা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে গিয়ে পূর্বের বর্ণনা প্রত্যাহার করেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি প্রশ্ন করলেনঃ আমার মত আর কেউ কি আছে? তিনি জানতে পেলেন, আরও দুইজন আছেন। তাঁরা হলেনঃ মুরারা ইবন রাবী ও হিলাল ইবন উমাইয়্যা। তাঁরা দুইজনই অতি নেক্‌কার বান্দা ও বদরী সাহাবী। তাঁদের নাম শুনে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এবং নতুন করে ওজর পেশ করার ইচ্ছা দমন করলেন।

রাসূলে কারীম (সা) পূর্বে উল্লেখিত তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকে। মানুষ তাঁদের প্রতি আড় চোখে তাকিয়ে দেখতো। কোন কথা বলতো না। মুরারা ও হিলাল নিজেদেরকে আপন আপন গৃহে আবদ্ধ করে রাখেন। দিন রাত তাঁরা শুধু কাঁদতেন। কা'ব ছিলেন যুবক। ঘরে বসে থাকা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল? পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই তিনি মসজিদে আসা যাওয়া করতেন, হাটে-বাজারেও ঘোরাঘুরি করতেন। কিন্তু কোন মুসলামান ভুলেও তাঁর সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না।

কা'ব মসজিদে যেতেন এবং নামাযের পর রাসূলকে (সা) সালাম করতেন। রাসূল (সা) জায়নামাযে বসে থাকতেন। রাসূল (সা) সালামের জবাব দিচ্ছেন কিনা বা তাঁর ঠোঁট নড়ছে কিনা, কা'ব তা গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। তারপর আবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। চোখ আড় করে একটু একটু করে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে তাকাতেন এবং রাসূলও (সা) তাকে আড় চোখে দেখতেন। যখন কা'ব নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে ফিরতেন তখন তিনি কা'বের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

কা'বের (রা) সাথে তাঁর পরিবারের সদস্যদের আচরণও ছিল অভিন্ন। আবূ কাতাদাহ (রা) ছিলেন কা'বের চাচাতো ভাই। একদিন কা'ব তাঁর বাড়ীর প্রাচীরের ওপর উঠে তাঁকে সালাম করলেন; কিন্তু কাতাদাহ জবাব দিলেন না। কা'ব তিনবার কসম খেয়ে

বললেন, তুমি তো জান আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কত ভালোবাসি। শেষবার কাতাদাহ্ শুধু মন্তব্য করলেন- বিষয়টি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

কাতাদাহর (রা) এমন জবাবে কা'ব (রা) দারুণ হতাশ হলেন। আপন মনে বললেন, এখন তো আমার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষী দেওয়ারও কেউ নেই। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বাজারের দিকে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে বাজারে তখন শামের এক নাবাতী ব্যক্তি তাঁকে খুঁজছিলেন। কা'বকে দেখে লোকেরা ইঙ্গিত করে বললো, ঐ যে তিনি আসছেন। লোকটি কা'বের নামে লেখা গাস্সানীয় রাজার একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলো। তাঁর নিকট থেকে চিঠিটি নিয়ে কা'ব পড়লেন। তাঁতে লেখা ছিল- 'তোমার বন্ধু (রাসূল (সা) তোমার প্রতি খুব অবিচার করেছেন। তুমি তো কোন সাধারণ ঘরের সন্তান নও। তুমি আমার কাছে চলে এসো।' চিঠিটি পড়ে তিনি মন্তব্য করলেন, এটাও এক পরীক্ষা। চিঠিটি তিনি জ্বলন্ত চুলায় ফেলে দিলেন।

এভাবে চল্লিশ দিন কেটে গেল। চল্লিশ দিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট গিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ হলো, তোমার স্ত্রী থেকে তুমি দূরে থাকবে। কা'ব জানতে চাইলেন, আমি কি তাঁকে তালাক দেব? তিনি বললেনঃ না। শুধু পৃথক থাকবে।

কা'ব (রা) বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার কাছে চলে যাও। আমার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত সেখানেই থাক। অন্য দুইজন- হিলাল ও মুরারাকেও (রা) একই নির্দেশ দেওয়া হয়। হিলাল ছিলেন বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বামী সেবার বিশেষ অনুমতি নিয়ে আসেন। কা'বের পরিবারের লোকেরা তাঁর স্ত্রীকেও বললেন, তুমিও রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেয়ে স্বামী সেবার অনুমতি নিয়ে এসো। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। বললেনঃ আমি যাব না। না জানি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি বলবেন।'

পঞ্চাশ দিনের মাথায় ফজরের নামায আদায় করে কা'ব (রা) ঘরের ছাদে বসে আছেন। ভাবছেন, এখন তো আমার জীবনটাই বোঝা হয়ে উঠেছে। আসমান-যমীন আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এ ধরনের আকাশ-পাতাল চিন্তা করছেন, এমন সময় সালা' পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এলোঃ 'কা'ব শোন! তোমার জন্য সুসংবাদ'! তিনি বুঝলেন, তাঁর দু'আ ও তাওবা কবুল হয়েছে। সাথে সাথে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। নিজের ভুলের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। কিছুক্ষণ পর দুই ব্যক্তি-যাদের একজন ছিল ঘোড় সাওয়ার, এসে তাঁকে সুসংবাদ দান করেন। কা'ব নিজের গায়ের কাপড় খুলে তাদেরকে দান করেন। অতিরিক্ত কাপড় ছিল না তাই সেই দান করা কাপড় আবার চেয়ে নিয়ে পরেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে যান।

ইতিমধ্যে খবরটি মদীনায় ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে মানুষ তাঁর বাড়ীর দিকে আসতে শুরু করেছে। পথে যার সাথেই দেখা হচ্ছে, তাঁকে মুবারকবাদ দিচ্ছে। তিনি মসজিদে

নববীতে পৌছে রাসূলকে (সা) সাহাবীদের মাঝে বসা অবস্থায় পেলেন।। মসজিদে ঢুকতেই তালহা (রা) দৌড়ে এসে হাত মেলালেন। তবে অন্যরা নিজ নিজ স্থানে বসে থাকলেন। কা'ব (রা) এগিয়ে গিয়ে রাসূলে কারীমকে (সা) সালাম করলেন। তাবারানী বর্ণনা করেছেন: তাওবা কবুল হওয়ার পর কা'ব রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে তাঁর দুইখানি পবিত্র হাত ধরে চুমু দিয়েছিলেন।[২৭] তখন রাসূলে কারীমের চেহারা মুবারক চাঁদের মত দীপ্তিমান দেখাচ্ছিল। তিনি কা'বের (রা) উদ্দেশ্যে বললেন: 'তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি। তোমার জন্মের পর থেকে আজকের দিনটির মত এত ভালো দিন তোমার জীবনে আর আসেনি।'

আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন? রাসূল (সা) বললেনঃ 'আমি কেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন।' এ কথা বলে তিনি তাদের সম্পর্কে সদ্য নাযিল হওয়া সূরা তাওবার ১১৭ নং আয়াতটি পাঠ করে শোনান। 'আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি, এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যাঁরা কঠিন মুহূর্তে নবীর সংগে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।' তিলাওয়াত শেষ হলে আনন্দের আতিশয্যে কা'ব বলে উঠলেন, 'আমি আমার সমস্ত ধন সম্পদ সাদাকা করে দিচ্ছি।' রাসূল (সা) বললেনঃ 'সব নয়, কিছু দান কর।' কা'ব তাঁর খাইবারের সম্পত্তি দান করেন। এরপর তিনি মন্তব্য করেনঃ 'আল্লাহ আমার সততার জন্যই মুক্তি দিয়েছেন। আমি অঙ্গীকার করছি, বাকী জীবনে আমি শুধু সত্যই বলবো।'

সত্য বলার জন্য কা'ব ও তাঁর অপর দুই সঙ্গীকে যে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, ইসলামের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। এত বড় বিপদেও তাঁদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে তাঁদের সেই করুণ অবস্থা অতি চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছেঃ

"এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই- অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরা তাওবা ১১৮-১১৯)

এ আয়াতে-যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল-বলা হয়েছে। এর অর্থ যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে যাওয়া নয়। বরং এর অর্থ যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন।

কা'ব বলেনঃ আমাদের তাওবাহ কবুল সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে। উম্মু সালামা তখন বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা কি কা'বকে সুসংবাদটি জানিয়ে দেব? রাসূল (সা) বললেনঃ 'তাহলেতো মানুষের ঢল নামবে এবং তোমরা আর ঘুমাতে পারবে না।[২৮]

কা'বের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি আলীর (রা) শাহাদাতের সময়কালে মারা যান। ইবন আবী হাতেম বলেন, মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে তিনি অন্ধ হয়ে যান। ইমাম বুখারী তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি 'উসমানের মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেছেন এবং মু'য়াবিয়া ও আলীর (রা) দ্বন্দ্বে তাঁর ভূমিকার বিষয়ে আমরা কোন তথ্য পাইনি। ইমাম বাগাবী বলেন, আমি জেনেছি, তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফত কালে শামে মারা যান। আবুল ফারাজ আল ইসপাহানী 'কিতাবুল আগানী' গ্রন্থে একটি দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন যে, হাস্সান ইবন সাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও আন-নূ'মান ইবন বাশীর (রা) একবার আলীর (রা) কাছে যান এবং উসমানের (রা) হত্যার বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হন। তখন কা'ব (রা) উসমানের (রা) শানে তাঁর রচিত একটি শোকগাথা আবৃত্তি করে আলীকে শোনান। তারপর তাঁরা সেখান থেকে উঠে সোজা মু'য়াবিয়ার কাছে চলে যান। মু'য়াবিয়া (রা) তাঁদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করেন।[২৯]

আল-হায়সাম ও আল-মাদায়িনীর মতে কা'ব হিজরী ৪০ সনে মারা যান। তবে তাঁর থেকে হিজরী ৫১ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, হিজরী ৫০ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণিত আছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সঠিক মত এই যে, হিজরী ৫০ থেকে ৫৫ (৬৭০-৬৭৩ খ্রীঃ)-এর মধ্যে প্রায় ৭৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান।[৩০]

সীরাত গ্রন্থসমূহে তাঁর পাঁচ ছেলের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন ঃ আবদুল্লাহ, 'উবায়দুল্লাহ, আবদুর রহমান, মা'বাদ ও মুহাম্মাদ। শেষ জীবনে কা'ব (রা) অন্ধ হয়ে যান।[৩১] ছেলেরা তাঁকে হাত ধরে নিয়ে বেড়াতেন।[৩২] ইবন ইসহাক তাঁর ছেলে আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ শেষ জীবনে আমার পিতা অন্ধ হয়ে গেলে আমি তাঁকে নিয়ে বেড়াতাম। আমি যখন তাঁকে জুম'আর নামাযের জন্য নিয়ে বের হতাম তখন আজান শোনার সাথে সাথে তিনি আবু উমামা আস'য়াদ ইবন খুরারার জন্যে মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতেন। জুমআর আজান শুনলেই তাঁকে আমি সব সময় এ কাজটি করতে দেখতাম। বিষয়টি আমার কাছে রহস্যজনক মন হলো। আমি একদিন জুম'আর দিনে তাঁকে নিয়ে বের হয়েছি, পথে আজানের ধ্বনি শোনার সাথে সাথে তিনি আবু উমামার জন্য দু'আ করতে শুরু করেন। আমি বললাম ঃ আব্বা, জুম'আর আজান শুনলেই আপনি এভাবে আবু উমামার জন্য দু'আ করেন কেন? বললেনঃ বাবা, রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার আগে সেই আমাদেরকে সমবেত করে সর্বপ্রথম জুম'আর জামায়াত কায়েম করে। সেটি অনুষ্ঠিত হতো হাররার বনু বায়দার 'হাযমুন নাবীত' পাহাড়ের 'নাকী আল-খাদিমাত' নামক স্থানে। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ তখন আপনারা কতজন ছিলেন? বললেন ঃ চল্লিশজন।[৩৩]

হাদীসের গ্রন্থসমূহে কা'বের (রা) বর্ণিত মোট আশিটি (৮০) হাদীস পাওয়া যায়।[৩৪] তবে ইমাম জাহাবী বলেন ঃ তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ত্রিশে পৌছবে। তারমধ্যে

তিনটি মুত্তাফাক আলাইহি। একটি বুখারী ও দুইটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৫] তিনি খোদ রাসূল (সা) ও উসাইদ ইবন হুদাইর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৬]

কা'ব (রা) থেকে যে সকল মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কতিপয় ব্যক্তি হলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ ও আবু ইমামা আল-বাহিলী। উল্লেখিত তিনজনই হলেন সাহাবী। আর তাবেঈদের মধ্যে ইমাম বাকের, 'আমর ইবন হাকাম ইবন সাওবান, 'আলী ইবন আবী তালহা, 'উমার ইবন কাসীর ইবন আফলাহ, 'উমার ইবন আল-হাকাম ইবন রাফে, কা'বের পাঁচ পুত্র ও পৌত্র আবদুর রহমান ইবন আবদিল্লাহ প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৭]

বালাজুরীর বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলে কারীম (সা) আসলাম, গিফারী ও জুহাইনা গোত্রের যাকাত-সাদাকা আদায়ের জন্য কা'বকে নিয়োগ করেন।[৩৮]

'উসমানের (রা) শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনায় কা'ব (রা) একটি মারসিয়া (শোকগাথা) রচনা করেন এবং 'আলীকে (রা) আবৃত্তি করে শোনান। তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ[৩৯]

১. 'উসমান তাঁর হাত দু'টি গুটিয়ে নিলেন, তারপর দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করলেন, আল্লাহ উদাসীন নন।
২. গৃহে যারা ছিল তাদের বললেন, তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। যারা যুদ্ধ করেনি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন।
৩. বন্ধুত্ব সৃষ্টির পর আল্লাহ কেমন করে তাঁদের অন্তরে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিলেন ?
৪. আর কল্যাণ কিভাবে তাঁদের দিকে পশ্চাদ্দেশ ফিরিয়ে উট পাখীর মত দৌড় দিল?

'আলী (রা) কবিতাটি শোনার পর মন্তব্য করলেন ঃ 'উসমান আত্মত্যাগ করেছেন। আর এ ত্যাগ ছিল অতীব দুঃখজনক। আর তোমরা তখন ভীত হয়ে পড়েছিলে। সে ভীতি ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরনের।

আলী ও মু'য়াবিয়ার (রা) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেছিল তাতে কা'ব (রা) কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে উভয়ের থেকে দূরে থাকেন।

সততা ও সত্য বলা ছিল কা'বের (রা) চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যকে যেভাবে তিনি ধারণ করেন সেভাবে অনেকেই ধারণ করতে পারেননি। দু'আ কবুল হওয়ার পর জীবনে কোন দিন বিন্দুমাত্র মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'আল্লাহর কসম! যে দিন আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) সেই কথাগুলি বলেছিলাম সেদিন থেকে আজকের দিনটি পর্যন্ত আর কোন প্রকার মিথ্যা বলিনি।[৪০] তাবুক যুদ্ধের পূর্বের জীবনটি ছিল তাঁর অতি পরিচ্ছন্ন। এ কারণে তার জীবনে যখন তাবুকের বিপর্যয় নেমে এলো তখন তাঁর নিজ গোত্র বনু সালেমা তাঁকে বলতে পেরেছিল— 'আল্লাহর কসম! তোমাকে তো আমরা এর পূর্বে আর কোন অপরাধ করতে দেখিনি।[৪১]

কা'ব (রা) ছিলেন তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তৎকালীন আরব কবিদের মধ্যে যাঁরা বেশী বেশী কবিতা রচনা করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। জাহিলী আমলেও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তাঁর কবিতা খুবই উন্নতমানের।[৪২] মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে যে তিনজন কবি কুরাইশ ও তাদের স্বগোত্রীয় কবিদের মুকাবিলায় দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেন, কা'ব (রা) সেই ত্রয়ীর অন্যতম। তাঁরা ইসলামবিদ্বেষী কবিদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।[৪৩] ইবন সীরীন বলেন ঃ এ তিন কবি হলেন, হাস্‌সান ইবন সাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন মালিক। তাঁরাই রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।[৪৪]

কা'ব ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের দেব-দেবীর সমালোচনা করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তিনি একটি শ্লোকে বলেছেন ঃ[৪৫]

'আমরা আল-লাত, আল 'উয্‌যা ও উদ্দাকে ভুলে যাব। তাদের গলার হার ও কানের দুল ছিনিয়ে নেব।'

রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারের প্রধান তিন কবির কবিতার বিষয় ছিল ভিন্ন। কা'বের কবিতার মূল বিষয় ছিল যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে কাফিরদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করে তাদেরকে অটল ও দৃঢ় করা। ইবন সীরীন বলেন ঃ[৪৬] কা'ব তো কবিতায় যুদ্ধের কথা বলে কাফিরদের ভয় দেখাতেন। বলতেন ঃ আমরা এমন করেছি, এমন করছি বা করবো। হাস্‌সান তাঁর কবিতায় কাফিরদের দোষ-ত্রুটি এবং তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বর্ণনা করতেন। আর ইবন রাওয়াহা কুফরী এবং আল্লাহ ও রাসূলের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার উল্লেখ করে তাদেরকে ধিক্কার ও নিন্দা জানাতেন।

কা'বের (রা) ছেলে আবদুর রহমান বলেন, আমার পিতা একদিন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ তো যা নাযিল করার তা করেছেন। উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ঃ একজন প্রকৃত মুজাহিদ তার তরবারি ও জিহবা-উভয়টি দিয়ে জিহাদ করে। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তার নামের শপথ! তোমরা তো শত্রুদের দিকে (জিহবা দিয়ে) তীরের ফলাই ছুড়ে মারছো।

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। যখন সূরা আশ-শু'য়ারার ২২৪ থেকে ২২৬ নং আয়াত-বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফেরে? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করেনা—নাযিল হলো তখন তিন কবি-হাস্‌সান, আবদুল্লাহ ও কা'ব কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ যখন এ আয়াত নাযিল করেছেন তখন তো অবশ্যই জেনেছেন, আমরা কবি। রাসূল (সা) তখন তাঁদেরকে আয়াতের ব্যতিক্রমী অংশ—তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে—পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন ঃ এ হচ্ছো তোমরা।[৪৮]

কা'ব (রা) ইসলামের প্রতিপক্ষ কুরাইশদের নিন্দায় বহু শ্লোক রচনা করেছেন। আল্লাহর দরবারে অন্ততঃ তার একটি শ্লোক যে গৃহীত হয়েছে, সে কথা খোদ রাসূল (সা) বলেছেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একদিন রাসূল (সা) কা'বকে বললেন ঃ তুমি যে শ্লোকটি বলেছো, তাতে তোমার রব তোমাকে ভোলেননি। কা'ব জানতে চাইলেন ঃ কোন শ্লোকটি? রাসূল (সা) তখন আবু বকরকে বললেন ঃ আপনি শ্লোকটি একটু আবৃত্তি করুন তো। আবু বকর তখন শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনান।[৪৯] প্রাচীন আরবী সূত্রসমূহে শ্লোকটি সংকলিত হয়েছে।[৫০] শ্লোকটির অনুবাদ এখানে দেওয়া হলোঃ

'সাখীনা ধারণা করেছে, সে তার রবকে (প্রভু) পরাভূত করবে। সকল বিজয়ীদের ওপর বিজয়ী (আল্লাহ) অবশ্যই জয়ী হবেন।'

এখানে 'সাখীনা' অর্থ আটা ও ঘি অথবা আটা ও খোরমা দিয়ে তৈরী এক প্রকার খাবার। এটি ছিল কুরাইশদের খুবই প্রিয় খাদ্য। তারা খেতও খুব বেশী বেশী। এ কারণে কবি কুরাইশদেরকে 'সাখীনা' বলেছেন। এ দ্বারা মূলতঃ তাদেরকে হেয় ও অপমান করা হয়েছে।[৫১]

কা'ব (রা) কবিতা রচনা করে রাসূলকে (সা) শোনাতেন। মাঝে মাঝে রাসূল (সা) তাতে কিছু শব্দ রদ-বদল করে সংশোধন করে দিতেন। কা'ব তা সবিনয়ে গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।[৫২]

সমকালীন আরব সমাজে কা'বের (রা) কবিতা এক অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। রাসূলে কারীম (সা) হুনাইন যুদ্ধ শেষ করে যখন তায়েফের দিকে যাত্রা করেন তখন কা'ব দু'টি শ্লোক রচনা করেন। শ্লোক দু'টি দাউস গোত্রের ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলে যে, তারা তা শুনেই ইসলাম গ্রহণ করে। শ্লোক দু'টির অর্থ নিম্নরূপ ঃ

'তিহামা ও খায়বার থেকে আমরা সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত করে তরবারি কোষে আবদ্ধ করে ফেলেছি।

এখন আবার আমরা তাকে যে কোন দু'টির মধ্যে একটি স্বাধীনতা দিচ্ছি। যদি তরবারি কথা বলতে পারতো তাহলে বলতো এবার দাউস অথবা সাকীফের পালা।'

ইবনে সীরীন বলেন ঃ দাউস গোত্র যখন উক্ত পংক্তি দু'টি শুনলো তখন তারা ভীত হয়ে পড়লো। তারা বললো, এখন মুসলমান হয়ে যাওয়াই উচিত। তা না হলে আমাদের দশাও হবে অন্যদের মত। এরপর তারা একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে।[৫৩]

কা'ব (রা) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বীয় কাব্য প্রতিভাকে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় নিয়োগ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি যেমন তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন তেমনিভাবে ভাষার যুদ্ধও চালিয়েছেন। তাঁর জীবনকালের ইসলামের ইতিহাসের সকল ঘটনা তিনি তাঁর কবিতায় ধরে রেখেছেন। বদর যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। বদরে 'উবায়দাহ ইবনুল হারেস শহীদ হন। তাঁর স্মরণে রচনা করেন এক শোকগাথা।[৫৪] উহুদ যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধের

শহীদদের সম্পর্কে বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। এ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা সায়্যিদুশ্ শুহাদা হামযার (রা) স্মরণে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। এ সময় মক্কার পৌত্তলিক কবিদের সাথে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সীরাতে ইবন হিশামে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়।[৫৫]

হামযার (রা) শানে রচিত একটি মরসিয়াতে তিনি হামযার বোন সাফিয়্যা বিনতু আবদিল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ[৫৬]

১. ওঠো সাফিয়্যা, ভেঙ্গে পড়োনা। হামযার স্মরণে বিলাপের জন্য নারীদের প্রতি আহবান জানাও।

২. মানুষের অন্তর কাঁপানো যে বিপদ আল্লাহর সিংহের ওপর আপতিত হয়েছে, সেজন্য দীর্ঘ ক্রন্দনে ক্লান্ত হয়ো না।

৩. তিনি ছিলেন পিতৃ-মাতৃহীনদের জন্য মর্যাদার প্রতীক। অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিলেন সিংহের মত।

৪. তাঁর সকল কর্ম দ্বারা তিনি শুধু আহমাদের সন্তুষ্টি এবং আরশ ও ইজ্জতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর খুশীই কামনা করতেন।

বীরে মা'উনায় রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধিদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কবি কা'বের যবান সোচ্চার হয়ে ওঠে। তিনি হত্যাকারীদের নিন্দায় অনেক কবিতা রচনা করেন।[৫৭] মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের নির্বাসন ও ইহুদী নেতা কা'ব ইবন আশরাফের হত্যার চিত্র তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতায় ধরা পড়েছে। এ ঘটনা লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ কবিদের নিন্দাবাদের জবাবও তিনি দিয়েছেন।[৫৮]

খন্দক যুদ্ধের চিত্রও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। প্রতিপক্ষের বাহিনী ও কবিদের নিন্দায় তিনি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন।[৫৯] বনু লিহইয়ানের যুদ্ধও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে।[৬০] জ্বি-কারাদের ঘটনায়ও তাঁকে সোচ্চার দেখা যায়।[৬১] খায়বার বিজয়ের চিত্রও তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে।[৬২] মূতার যুদ্ধের শহীদরা তাঁর হৃদয়ে দারুণ ছাপ ফেলেছে। তাঁদের স্মরণে তিনি রচনা করেছেন আবেগ-ভরা এক কাসীদা।[৬৩] এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) এ মহান কবির জিহ্বা ইসলামের প্রথম পর্বের সকল ঘটনা ও যুদ্ধে সোচ্চার থেকে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভার যথাযথ ব্যবহার করে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর কিছু কিছু পংক্তি আরবী ভাষা সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে। রাওহ ইবন যান্‌বা বলেন, কা'বের নিজ গোত্রের এক ব্যক্তির প্রশংসায় রচিত তাঁর একটি শ্লোক আরবী কাব্য জগতে সর্বাধিক বীরত্বব্যঞ্জক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[৬৪]

তথ্যসূত্র ঃ

১. শাজারাতুজ জাহাব- ১/৫৬

২. ডঃ উমার ফাররূখ- তারীখ- আল- আদাব আল আরবী- ১/৩২৩

৩. তাহজীবুত তাহজীব- ৮/৩৯৪; আজ-জাহাবী-তারীখ- ২/২৪৩

৪. আল-ইসাবা- ৩/৩০২

৫. উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৩, ৫২৪
৭. 'উমার ফাররূখ: তারীখ আল-আদাব- ১/৩২৩
৮. উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/২২২,২২৩; আল-ইসাবা- ৩/৩০২
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৭
১১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৪৩৯-৪৪৩
১২. প্রাগুক্ত- ১/৪৪৫
১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৪, ৫২৭; শাজারাতুজ জাহাব- ১/৫৬; উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
১৪. তাবাকাত- ৩/১০২; আজ-জাহাবী: তারীখ- ২/২৪৩; আনসাবুল আশরাফ- ১/২৭১
১৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৪,৫২৬
১৬. সুয়ূতী: আসবাব আন-নুযুল-৩৭৭; তাহজীবুত-তাহজীব- ৮/৩৯৫; উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
১৭. উসুদুল গাবা-৪/২৪৭,২৪৮; আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮, ২৮৯; সহীহ বুখারী- ২/৬৩৪
১৮. সীরাতু ইবন হিশাম -১/৪৬২
১৯. হায়াতুস সাহাবা- ১/৫৫৮
২০. উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
২১. জাহাবী তারীখ-২/২৪৩; সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৪; আল মুসতাদরিক- ৩/৪৪১
২২. তাবাকাত: মাগাযী-৩২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২২
২৩. ইবন কাসীর:আস সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-২/২৬৬
২৪. 'উমার ফাররূখ- তারীখ- ১/৩২৩
২৫. আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ- ২/২৭০
২৬. উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
২৭. হায়াতুস সাহাবা- ২/৪৯৭
২৮. হযরত কা'ব ও তাঁর সঙ্গীদের এ ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৭-৫৩০; সীরাতু ইবন হিশাম- ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩১; মুসনাদে ইমাম আহমাদ- ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ; ৩৮৭, ৩৯০; হায়াতুস সাহাবা- ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৪-৪৬৮; উসুদুল গাবা- ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৮; ইবন কাসীরের আস-সীরাহ- ২য় খণ্ড পৃ: ২৬৬-২৭০। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এবং ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এই তিনজনের ঘটনাটি একটি পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করেছেন।
২৯. আল ইসাবা- ৩/৩০২; তাহজীবুত তাহজীব - ৮/৩৯৯
৩০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: শাজারাতুজ জাহাব-১/৫৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৬- আজ-জাহাবী: তারীখ- ২/২৪৩; ডঃ উমার ফাররূখ: তারীখুল আদাব-১/৩২৪; আনসাবুল আশরাফ- ১/২২৮
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন- নুবালা- ২/৫২৪; শাজারুতুজ জাহাব- ১/৫৬; তাহজীবুত তাহজীব- ৮/৩৯৫.
৩২. বুখারী - ২/৬৩২
৩৩. সীরাতু ইবন হিশাম - ১/৪৩৫; হায়াতুস সাহাবা - ৩/৩৮৭
৩৪. আল- আ'লাম- ৫/২২৮
৩৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৩
৩৬. তাহজীবুত তাহজীব- ৮/৩৯৫
৩৭. আজ-জাহাবী: তারীখ - ২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৩; আল-ইসাবা - ২/১৫৩; তাহজীবুত তাহজীব - ৮/৩৯৫
৩৮. আনসাবুল আশরাফ- ১/৫৩১

৩৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৭
৪০. সহীহ মুসলিম- ২/৪৫৪
৪১. বুখারী - ২/৬৩৫
৪২. ডঃ ফাররূখ - তারীখুল আদাব-১/৩২৪
৪৩. শাজারাতুজ জাহাব-১/৫৬.
৪৪. আজ- জাহাবী তারীখ- ২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; উসুদুল গাবা-৪/২৪৮
৪৫. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৭৮
৪৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; উসুদুল গাবা -৪/২৪৮
৪৭. আজ-জাহাবী : তারীখ - ২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; মুসনাদ- ৬/৩৮৭
৪৮. তাফসীর ইবন কাসীর - ৩/৩৫৪
৪৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; আয-জাহাবী: তারীখ -২/২৪৩
৫০. দেখুন: কানযুল উম্মাল- ১৩/৫৮১; শাজারাতুজ জাহাব- ১/৫৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৬
৫১. দেখুন: টীকা: সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৬; কানযুল উম্মাল- ১৩/৫৮১
৫২. সীরাতু ইবন হিশাম - ২/১৩৬
৫৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৪৭৯; উসুদুল গাবা- ৪/২৪৮; আল ইসাবা- ৩/৩০২;সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; আয-জাহাবী: তারীখ - ২/২৪৩
৫৪. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৭১৪; ২/১৪,২৪,২৫,২১০
৫৫. প্রাগুক্ত- ২/১৩২,১৩৮,১৩৯,১৪৪,১৪৭,১৫৬,১৫৮,১৬১,১৬৩
৫৬. ডঃ উমার ফাররূখ- তারীখ: ১/৩২৪-৩২৫; কিতাবুল আগানী- ১৬/২২৬
৫৭. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১৮৯
৫৮. প্রাগুক্ত- ২/৫৭; ১৯৮-২০২
৫৯. প্রাগুক্ত - ২/২৫৫-২৫৮; ২৫৯-২৬৬
৬০. প্রাগুক্ত - ২/২৮০;২৮১
৬১. প্রাগুক্ত - ২/২৮৭;২৮৮
৬২. প্রাগুক্ত- ২/৩৩৩; ৩৪৮; কিতাবুল আগানী- ১৬/২২৬
৬৩. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৩৮৫
৬৪. কিতাবুল আগানী- ১৫/২৯; আল-আ'লাম- ৫/২২৮

হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা)

সীরাতের গ্রন্থসমূহে হাস্‌সানের (রা) অনেকগুলি ডাকনাম বা কুনিয়াত পাওয়া যায়। আবুল ওয়ালীদ, আবুল মাদরাব, আবুল হুসাম ও আবূ আবদির রহমান। তবে আবুল ওয়ালীদ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[১] তাঁর লকব বা উপাধি 'শায়িরু রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহর (সা) কবি। তাঁর পিতার নাম সাবিত ইবন আল-মুনজির এবং মাতার নাম আল-ফুরাই'য়া বিন্‌তু খালিদা।[২] ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে তাঁর মায়ের নাম আল-ফুরাইয়া বিন্‌ত হুরাইস বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] তাঁরা উভয়ে মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) মাতুল গোত্র বনু নাজ্জারের সন্তান হওয়ার কারণে রাসূলে পাকের (সা) সাথে আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক ছিল।[৪] মা আল-ফুরাইয়া ইসলামের আবির্ভাব কাল পেয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিয়্যাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।[৫] তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বিখ্যাত নেতা সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) চাচাতো বোন।[৬] হযরত হাস্‌সান (রা) তাঁর কবিতার একটি চরণে মা আল-ফুরাইয়া'র নামটি ধরে রেখেছেন।[৭] প্রখ্যাত সাহাবী শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) ছিলেন হাস্‌সানের (রা) ভাতিজা।[৮] হাস্‌সান (রা) একজন সাহাবী, রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারী কবি, দুনিয়ার সকল ঈমানদার কবিদের ইমাম এবং তাঁর কাব্য প্রতিভা রুহুল কুদুস জিবরীল দ্বারা সমর্থিত।[৯]

ইবন সাল্লাম আল-জামহী বলেন : হাস্‌সানের পিতা সাবিত ইবন আল-মুনজির ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের একজন নেতা ও সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁর দাদা আল-মুনজির প্রাক-ইসলামী আমলে 'সুমাইহা' যুদ্ধের সময় মীদনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বিচারক হয়ে তাদের মধ্যে ফায়সালা করেছিলেন। কবি হাস্‌সানের কবিতায় তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার মুযানিয়্যা গোত্র কবির পিতাকে বন্দী করেছিল। কবির গোত্র তাঁকে ছাড়িয়ে আনার জন্য ফিদিয়ার প্রস্তাব দিলে তারা প্রত্যাখ্যান করে। দীর্ঘদিন বন্দী থাকার পর তাঁর পিতার প্রস্তাবেই বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি মুক্ত হন।[১০] হাস্‌সানের দাদা আল-মুনজির ছিলেন খুবই উদার ও শান্তিপ্রিয় মানুষ।

হাস্‌সান হিজরাতের প্রায় ষাট বছর পূর্বে ৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইয়াসরিবে (মদীনা) জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নির্মিত মসজিদে নব্বীর পশ্চিম প্রান্তে বাবে রহমতের বিপরীত দিকে অবস্থিত 'ফারে' কিল্লাটি ছিল তাঁদের পৈত্রিক আবাসস্থল। হাস্‌সানের কবিতায় এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[১১] কবি হিসেবে বেড়ে ওঠেন এবং কবিতাকে জীবিকার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রাচীন আরবের জিল্লাক ও হীরার রাজপ্রাসাদে যাতায়াত ছিল। তবে গাস্‌সানীয় সম্রাটদের প্রতি একটু বেশী দুর্বল ছিলেন। হাস্‌সানের সাথে তাঁদের একটা গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি তাঁদের প্রশংসায় বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। তার কিছু অংশ সাহিত্য সমালোচকগণ হাস্‌সানের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে

গণ্য করেছেন।[১২] সম্রাটগণও প্রতিদানে তাঁর প্রতি যথেষ্ট বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের এ সম্পর্ক ইসলামের পরেও বিদ্যমান ছিল।[১৩]

গাস্‌সানীয় সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট জাবালা ইবন আল-আয়হাম। তাঁর প্রশংসায় কবি হাস্‌সান অনেক কবিতা রচনা করেছেন। খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে গোটা শামে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পরাজয়ের পর জাবালা ইবন আল-আয়হাম ইসলাম গ্রহণ করে কিছুকাল হিজাযে বসবাস করেন। এ সময় একবার হজ্জ করতে যান। কা'বা তাওয়াফের সময় ঘটনাক্রমে তাঁর কাপড়ের আঁচল এক আরব বেদুঈনের পায়ের তলায় পড়ে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তার গালে থাপ্পড় বসিয়ে দেন। বেদুঈন খলীফা 'উমারের (রা) নিকট বিচার দাবী করে। খলীফা ছিলেন সাম্যের প্রতীক। তিনি বেদুঈনকে একইভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। জাবালা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন ঃ আমি একজন রাজা। একজন বেদুঈন কিভাবে আমাকে থাপ্পড় মারতে পারে? 'উমার (রা) বললেন ঃ ইসলাম আপনাকে ও তাকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। জাবালা বিষয়টি একটু ভেবে দেখার কথা বলে সময় চেয়ে নিলেন। এরপর রাতের আঁধারে রোমান সাম্রাজ্যে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[১৪]

এই রোমান সাম্রাজ্যে অবস্থানকালে পরবর্তীকালে একবার মু'য়াবিয়া (রা) প্রেরিত এক দূতের সাথে জাবালার সেখানে সাক্ষাৎ হয়। জাবালা তাঁর নিকট হাস্‌সানের কুশল জিজ্ঞেস করেন। দূত বলেন ঃ তিনি এখন বার্দ্ধক্যে জর্জরিত। অন্ধ হয়ে গেছেন। হাস্‌সানকে দেওয়ার জন্য জাবালা তাঁর হাতে এক হাজার দীনার দান করেন। দূত মদীনায় ফিরে আসলেন এবং কবিকে মসজিদে নববীতে পেলেন। তিনি কবিকে বললেন ঃ আপনার বন্ধু জাবালা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। কবি বললেন ঃ তাহলে তুমি যা নিয়ে এসেছো তা দাও। দূত বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আমি কিছু নিয়ে এসেছি তা আপনি কি করে জানলেন? বললেন ঃ তাঁর কাছ থেকে যখনই কোন চিঠি আসে, সাথে কিছুনা কিছু থাকেই।[১৫]

আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন। একবার এক গাস্‌সানীয় সম্রাট দূত মারফত কবি হাস্‌সানের নিকট পাঁচ শো দীনার ও কিছু কাপড় পাঠিয়েছিলেন। দূতকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যদি জীবিত না থাকেন তাহলে কাপড়গুলি কবরের ওপর বিছিয়ে দেবে এবং দীনারগুলি দ্বারা একটি উট খরীদ করে তার কবরের পাশে জবেহ্ করবে। দূত মদীনায় এসে কবির সাক্ষাৎ পেলেন এবং কথাগুলি বললেন। কবি বললেন ঃ তুমি আমাকে মৃতই পেয়েছো।[১৬]

গাস্‌সানীয় রাজ দরবারের মত হীরার রাজ দরবারেও কবি হাস্‌সানের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। জুরজী যায়দান বলেন ঃ 'প্রাক-ইসলামী আমলে যে সকল খ্যাতিমান আরব কবির হীরার রাজ দরবারের আসা-যাওয়া ছিল এবং আপন কাব্য-প্রতিভা বলে সেখানে মর্যাদার আসনটি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাস্‌সান অন্যতম।[১৭]

ইসলাম-পূর্বকালে কবি হাস্‌সান ইয়াসরিবের চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোত্র আউস ও খাযরাজের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ হতো তাতে নিজ গোত্রের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন। আর এখান থেকেই প্রতিপক্ষ আউস গোত্রের দুই শ্রেষ্ঠ কবি কায়স ইবন খুতাইম ও আবী কায়স ইবন আল-আসলাত-এর সাথে কাব্য-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।[১৮]

হাস্‌সানের চার পুরুষ অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। প্রত্যেকে একশো বিশ বছর করে বেঁচে ছিলেন। আরবের আর কোন খান্দানের পরপর চার পুরুষ এত দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি। হাস্‌সানের প্রপিতামহ হারাম, পিতামহ আল-মুনজির, পিতা সাবিত এবং তিনি নিজে-প্রত্যেকে ১২০ বছর বেঁচে ছিলেন।[১৯]

হাস্‌সান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর জীবনে বার্দ্ধক্য এসে গেছে। মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বে তিনি মুসলমান হন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের সময় হাস্‌সানের বয়স হয়েছিল ষাট বছর।[২০] ইবন ইসহাক হাস্‌সানের পৌত্র আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিজরাতের সময় তাঁর বয়স ষাট, এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স তিপ্পান্ন বছর ছিল। ইবন সা'দ আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ষাট বছর জাহিলিয়্যাতের এবং ষাট বছর ইসলামের জীবন লাভ করেন।[২১]

রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাব বিষয়ে ইবন ইসহাক হাস্‌সানের একটি বর্ণনা নকল করেছেন। হাস্‌সান বলেন ঃ আমি তখন সাত/আট বছরের এক চালাক-চতুর বালক। যা কিছু শুনতাম, বুঝতাম। একদিন এক ইহুদীকে ইয়াসরিবের একটি কিল্লার ওপর উঠে চিৎকার করে মানুষকে ডাকতে শুনলাম। মানুষ জড় হলে সে বলতে লাগলো ঃ আজ রাতে আহমাদের নক্ষত্র উদিত হয়েছে। আহমাদকে আজ নবী করে দুনিয়ায় পাঠানো হবে।[২২]

ইবনুল কালবী বলেন ঃ হাস্‌সান ছিলেন একজন বাগ্মী ও বীর। কোন এক রোগে তাঁর মধ্যে ভীরুতা এসে যায়। এরপর থেকে তিনি আর যুদ্ধের দিকে তাকাতে পারতেন না এবং কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেননি।[২৩] তবে ইবন 'আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনায় জানা যায়, তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লামাহ ইবন হাজার 'আসকালানী লিখেছেন ঃ একবার ইবন আববাসকে বলা হলো 'হাস্‌সান আল-লা'ঈন' (অভিশপ্ত হাস্‌সান) এসেছে। তিনি বললেন ঃ হাস্‌সান অভিশপ্ত নন। তিনি জীবন ও জিহ্‌বা দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদ করেছেন।[২৪] আল্লামাহ্ জাহাবী বলেন, এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।[২৫]

হাস্‌সানের (রা) যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে সবকথা প্রচলিত আছে তা এই বর্ণনার বিপরীত। খন্দক মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) মুসলিম মহিলাদেরকে হাস্‌সানের 'ফারে' দূর্গে নিরাপত্তার জন্য রেখে যান। তাদের সাথে হাস্‌সানও ছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিবও ছিলেন। একদিন এক ইহুদীকে তিনি কিল্লার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করতে দেখলেন। তিনি প্রমাদ

শুণলেন যদি সে মহিলাদের অবস্থান জেনে যায় তাহলে ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারণ রাসূল (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তখন প্রত্যক্ষ জিহাদে লিপ্ত। তিনি হাস্‌সানকে বললেন, এই ইহুদীকে হত্যা কর। তা না হলে সে আমাদের অবস্থানের কথা ইহুদীদেরকে জানিয়ে দেবে। হাস্‌সান বললেন, আপনার জানা আছে আমার নিকট এর কোন প্রতিকার নেই। আমার মধ্যে যদি সেই সাহসই থাকতো তাহলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই থাকতাম। সাফিয়্যা তখন নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে ইহুদীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর হাস্‌সানকে বলেন, যাও, এবার তার সঙ্গের জিনিসগুলি নিয়ে এসো। যেহেতু আমি নারী, আর সে পুরুষ, তাই একাজটি আমার দ্বারা হবে না। এ কাজটি তোমাকে করতে হবে। হাস্‌সান বললেন, ঐ জিনিসের প্রয়োজন নেই।[২৬]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। সাফিয়্যা লোকটিকে হত্যার পর মাথাটি কেটে এনে হাস্‌সাকে বলেন, ধর, এটা দূর্গের নীচে ইহুদীদের মধ্যে ফেলে এসো। তিনি বললেন ঃ এ আমার কাজ নয়। অতঃপর সাফিয়্যা নিজেই মাথাটি ইহুদীদের মধ্যে ছুড়ে মারেন। ভয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।[২৭]

হাস্‌সান (রা) সশরীরে না হলেও জিহবা দিয়ে রাসূলে কারীমের সাথে জিহাদ করেছেন। বনু নাদীরের যুদ্ধে রাসূল (সা) যখন তাদেরকে অবরুদ্ধ করেন এবং তাদের গাছপালা জ্বালিয়ে দেন তখন তার সমর্থনে হাস্‌সান কবিতা রচনা করেন। বনু নাদীর ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সাহায্য ও সহযোগিতা চুক্তি ছিল। তাই তিনি কবিতায় কুরাইশদের নিন্দা করে বলেন, মুসলমানরা বনু নাদীরের বাগ-বাগিচা জ্বালিয়ে ছিল, তোমরা তো তাদের কোন উপকারে আসনি। এ কবিতা মক্কায় পৌঁছালে কুরাইশ কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস বলেন ঃ আল্লাহ সর্বদা তোমাদের এমন কর্মশক্তি দান করুন, যাতে আশে-পাশের আগুনে খোদ মদীনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর আমরা দূরে বসে তামাশা দেখবো।[২৮]

হিজরী পঞ্চম সনে 'আল-মুরাইসী' যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। সুযোগ সন্ধানী মুনাফিকরা তিলকে তাল করে ফেলে। তারা 'আয়িশার (রা) পূতঃপবিত্র চরিত্রের ওপর অপবাদ দেয়। মুনফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল এ ব্যাপারে সকলের অগ্রগামী। কতিপয় প্রকৃত মুসলমানও তাদের এ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকে পড়েন। যেমন হাস্‌সান, মিসতাহ ইবন উসাসা, হামনা বিন্‌ত জাহাশ প্রমুখ। যখন আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষণা করে আল কুরআনের আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূল (সা) অপবাদ দানকারীদের ওপর কুরআনের নির্ধারিত 'হদ' (শাস্তি) আশি দুররা জারি করেন। ইমাম যুহরী থেকে সাহীহাইনে একথা বর্ণিত হয়েছে।[২৯] অবশ্য অনেকে 'হদ' জারির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।[৩০]

অনেকে অবশ্য হাস্‌সানের জীবন, কর্মকাণ্ড এবং তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করে এ মত পোষণ করেছেন যে, কোনভাবেই তিনি 'ইফ্‌ক' বা অপবাদের ঘটনায় জড়িত ছিলেন

না। যেহেতু তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে দাঁড়িয়ে মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশদের আভিজাত্যের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন এবং আরববাসীর নিকট তাদের হঠকারিতার স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন, একারণে পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণকারী কুরাইশরা নানাভাবে তাঁকে নাজেহাল করেছেন। তাঁরা মনে করেন, 'ইফ্‌ক'-এর ঘটনায় হাস্‌সানের নামটি জড়ানোর ব্যাপারে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন, তাদের পুরোধা সাফওয়ান ইবন মু'য়াত্তাল। হাস্‌সান 'আয়িশার (রা) শানে অনেক অনুপম কবিতা রচনা করেছেন। একটি চরণে তিনি 'ইফ্‌ক'-এর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অন্য একটি চরণে যারা তাঁর নামটি জড়ানোর ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছেন, সেই সব কুরাইশ মুহাজিরদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৩১]

'ইফ্‌ক'-এর ঘটনায় তাঁর জড়িয়ে পড়ার যত বর্ণনা পাওয়া যায়, সীরাত বিশেষজ্ঞরা সেগুলিকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। একারণে পরবর্তীকালে বহু সাহাবী ও তাবে'ঈ তাঁকে ভালো চোখে দেখেননি। অনেকে তাঁকে নিন্দা-মন্দ করেছেন। তবে খোদ 'আয়িশা (রা) ও রাসূল (সা) তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। একথা বহু বর্ণনায় জানা যায়। 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাস্‌সানকে মুমিনরাই ভালোবাসে এবং মুনফিকরাই ঘৃণা করে। তিনি আরো বলেছেন ঃ হাস্‌সান হচ্ছে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রতিবন্ধক।[৩২] কেউ আয়িশার (রা) সামনে হাস্‌সানকে (রা) খারাপ কিছু বললে তিনি নিষেধ করতেন।

হাস্‌সান (রা) শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একবার আয়িশার (রা) গৃহে আসেন। তিনি গদি বিছিয়ে হাস্‌সানকে (রা) বসতে দেন। এমন সময় 'আয়িশার (রা) ভাই আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত হন। তিনি বোনকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আপনি তাঁকে গদির ওপর বসিয়েছেন? তিনি কি আপনার চরিত্র নিয়ে এসব কথা বলেননি? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে কাফিরদের জবাব দিতেন শত্রুদের জবাব দিয়ে রাসূলুল্লাহর (রা) অন্তরে শান্তি দিতেন। এখন তিনি অন্ধ হয়েছেন। আমি আশা করি, আল্লাহ্ আখিরাতে তাঁকে শাস্তি দেবেন না।[৩৩]

প্রখ্যাত তাবে'ঈ মাসরূক বলেন ঃ একবার আমরা 'আয়িশার (রা) কাছে গিয়ে দেখলাম হাস্‌সান সেখানে বসে বসে 'আয়িশার (রা) প্রশংসায় রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে এই পংক্তিটিও ছিল ঃ

'হাস্‌সানুল রাযানুন মা তুযানু বিরীবাতিন'- অর্থাৎ তিনি পূতঃপবিত্র, শক্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ভদ্রমহিলা, তাঁর আচরণে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। পরনিন্দা থেকে মুক্ত অবস্থায় তাঁর দিনের সূচনা হয়।

পংক্তিটি শোনার পর 'আয়িশা (রা) মন্তব্য করলেন ঃ 'কিন্তু আপনি তেমন নন।' আয়িশাকে (রা) বললাম ঃ আপনি তাকে এখানে আসার অনুমতি দেন কেন? আল্লাহ তা'য়ালা তো ঘোষণা করেছেন, ইফ্‌ক-এ যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, তার জন্য রয়েছে

বিরাট শাস্তি। (সূরা ঃ আন-নূর-১১) 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর কাজের শাস্তি তো তিনি লাভ করেছেন। অন্ধত্বের চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি রাসূলুল্লাহর (রা) পক্ষ থেকে কুরাইশদের প্রতিরোধ করেছেন এবং তাদের কঠোর নিন্দা করেছেন।[৩৪]

'উরওয়া বলেন ঃ একবার আমি ফুরাই'য়ার ছেলে হাস্‌সানকে 'আয়িশার (রা) সামনে গালি দিই। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ ভাতিজা, তুমি কি এমন কাজ থেকে বিরত হবে না? তাঁকে গালি দিওনা। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে কুরাইশদের জবাব দিতেন।[৩৫]

একবার কতিপয় মহিলা 'আয়িশার (রা) উপস্থিতিতে হাস্‌সানকে নিন্দামন্দ করে। আয়িশা (রা) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা তাঁকে নিন্দামন্দ করোনা। আল্লাহ তা'য়ালা যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দানের অঙ্গিকার করেছেন, তিনি তা পেয়ে গেছেন। তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি আশা করি তিনি কুরাইশ কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিসের কবিতার জবাবে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় যে কবিতা রচনা করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন। একথা বলে তিনি হাস্‌সানের 'হাজাওতা মুহাম্মাদান ফা আজাবতু আনহু' কবিতাটির কয়েকটি লাইন পাঠ করেন।[৩৬]

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) কবি হাস্‌সানকে ক্ষমা করেছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'আয়িশার (রা) সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হাস্‌সান (রা) দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সময় নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। ইবন ইসহাকের মতে তিনি হিজরী ৫৪ সনে মারা যান। আল হায়সাম ইবন 'আদী বলেন ঃ হিজরী ৪০ সনে মারা যান। ইমাম জাহাবী বলেন ঃ তিনি জাবালা ইবন আল-আয়হাম ও আমীর মু'য়াবিয়ার দরবারে গিয়েছেন। তাই ইবন সা'দ বলেছেন ঃ মু'য়াবিয়ার খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, তিনি হিজরী ৫৪/ খ্রীঃ ৬৭৪ সনে ১২০ বছর বয়সে মারা যান।[৩৭]

আবু 'উবায়েদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম বলেন ঃ হিজরী ৫৪ সনে হাকীম ইবন হিযাম' আবু ইয়াযীদ হুয়াইতিব ইবন 'আব দিল 'উয্‌যা, সা'ঈদ ইবন ইয়ারবু আল মাখযুমী ও হাস্‌সান ইবন সাবিত আল-আনসারী মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের প্রত্যেকে ১২০ বছর জীবন লাভ করেছিলেন।[৩৮]

হাস্‌সানের (রা) স্ত্রীর নাম ছিল সীরীন। তিনি একজন মিসরীয় কিবতী মহিলা। আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। রাসূলে কারীম (সা) সাহাবী হয়রত হাতিব ইবন বালতা'য়াকে (রা) ইস্‌কান্দারিয়ার শাসক 'মাকুকাস'-এর নিকট দূত হিসেবে পাঠান। মাকুকাস রাসূলুল্লাহর (রা) দূতকে যথেষ্ট সমাদর করেন। ফেরার সময় তিনি রাসূলুল্লাহর (রা) জন্য কিছু উপহার পাঠান। এই উপহার সামগ্রীর মধ্যে তিনটি কিবতী দাসীও ছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে ইবরাহীমের মা মারিয়্যা আল কিবতিয়্যা (রা) এই দাসী ক্রয়ের একজন। অন্য দুইজন দাসীর মধ্যে রাসূল (সা) হাস্‌সান ইবন সাবিত ও মুহাম্মাদ ইবন কায়স আল-আবদীকে একটি করে দান করেন। হাস্‌সানকে প্রদত্ত দাসীটি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন মারিয়্যা আল-কিবতিয়্যার বোন। নাম ছিল সীরীন। তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হাস্‌সানের (রা) ছেলে 'আবদুর রহমান। এই আবদুর রহমান এবং রাসূলুল্লাহর (রা) ছেলে ইবরাহীম ছিলেন পরস্পর খালাতো ভাই।[৩৯]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'ফারে' পর্বতের দূর্গ ছিল হাস্‌সানের (রা) পৈতৃক বাসস্থান। আবু তালহা (রা) যখন 'বীরহা' উদ্যান তাঁর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে সাদাকা হিসেবে বন্টন করে দেন তখন সেখান থেকে একটি অংশ লাভ করেন। এরপর তিনি এখানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। স্থানটি আল-বাকী'র নিকটবর্তী। পরে আমীর মু'য়াবিয়া (রা) তাঁর নিকট থেকে সেটি খরীদ করে সেখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যা পরে কাসরে বনী হুদায়লা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারো কারো ধারণা যে, রাসূল (সা) এ ভূমি তাঁকে দান করেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। উপরে উল্লেখিত আমাদের বক্তব্য সাহীহ বুখারীর বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত।

হাস্‌সানের (রা) মাথার সামনের দিকে এক গোছা লম্বা চুল ছিল। তিনি তা দুই চোখের মাঝখানে সব সময় ছেড়ে রাখতেন। ভীষণ বাক্‌পটু ছিলেন। এ কারণে বলা হতো, তিনি তাঁর জিহবার আগা নাকের আগায় ছোঁয়াতে পারতেন। তিনি বলতেন, আরবের কোন মিষ্টভাষীই আমাকে তুষ্ট করতে পারে না। আমি যদি আমার জিহ্বার আগা কারো মাথার চুলের ওপর রাখি তাহলে সে মাথা ন্যাড়া হয়ে যাবে। আর যদি কোন পাথরের ওপর রাখি তাহলে তা বিদীর্ণ হয়ে যাবে।[৪০]

হাস্‌সান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ আল-বারা' ইবন 'আযিব, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, 'উরওয়া ইবন খুরাইর, আবুল হাসান মাওলা বনী নাওফাল, খারিজা ইবন যায়িদ ইবন সাবিত, ইয়াহইয়া ইবন 'আবদির রহমান ইবন হাতিব, আয়িশা, আবু হুরাইরা, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, আবদুর রহমান ইবন হাস্‌সান প্রমুখ।[৪১] ইবন সা'দ হাস্‌সানকে (রা) দ্বিতীয় তাবকায় (স্তর) উল্লেখ করেছেন।[৪২]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর প্রথম দুই খলীফা— আবূ বকর ও 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হাস্‌সানের (রা) কোন রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায় না। 'উসমানের (রা) খিলাফতের সময় তাঁর মধ্যে আবার 'আসাবিয়্যাতের (অন্ধ পক্ষপাতিত্ব) কিছু লক্ষণ দেখা যায়। তিনি খলীফা 'উসমানের (রা) পক্ষ নিয়ে বনু উমাইয়্যাকে 'আলীর (রা) বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। খলীফা 'উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করলে তিনি বনু হাশিম, বিশেষতঃ 'আলীকে (রা) ইঙ্গিত করে কিছু কবিতা রচনা করেছেন।[৪৩]

হাস্‌সানের (রা) জীবনে কবিত্ব একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম। কাব্য প্রতিভা সর্বকালে সকল জাতি-গোষ্ঠীর নিকট সমাদৃত। বিশেষ করে প্রাক-ইসলামী আরবে এ গুণটির আবার সবচেয়ে বেশী কদর ছিল। কবিতা চর্চা ছিল সেকালের আরববাসীর এক বিশেষ রুচি। তৎকালীন আরবে কিছু গোত্র ছিল কবির খনি বা উৎস বলে খ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ কায়স, রাবী'য়া, তামীম, মুদার, য়ামন প্রমুখ গোত্রের নাম করা যায়। এ সকল গোত্রে অসংখ্য আরবী কবির জন্ম হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ছিল শেষোক্ত য়ামন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। হাস্‌সানের (রা) পৈত্রিক বংশধারা উপরের দিকে এদের সাথে মিলিত হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত গোত্রসমূহের মধ্যে আবার কিছু খান্দানে কবিত্ব বংশানুক্রমে চলে আসছিল। হাস্‌সানের (রা) খান্দানটি ছিল তেমনই। উপরের দিকে তাঁর পিতামহ ও পিতা, নীচের দিকে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান, পৌত্র সা'ঈদ ইবন 'আবদির রহমান এবং তিনি নিজে সকলেই ছিলেন তাঁদের সমকালে একেকজন শ্রেষ্ঠ কবি।[৪৪] হাস্‌সানের (রা) এক মেয়েও একজন বড় মাপের কবি ছিলেন। হাস্‌সান (রা) তাঁর বার্দ্ধক্যে এক রাতে কবিতা রচনা করতে বসেছেন। কয়েকটি শ্লোক রচনার পর আর ছন্দ মিলাতে পারছেন না। তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরে মেয়ে বললেন ঃ বাবা, মনে হচ্ছে আপনি আর পারছেন না। বললেন ঃ ঠিকই বলেছো। মেয়ে বললেন ঃ আমি কি কিছু শ্লোক মিলিয়ে দেব? বললেন ঃ পারবে? মেয়ে বললেন ঃ হাঁ, তা পারবো। তখন বৃদ্ধ একটি শ্লোক বললেন, আর তার সাথে মিল রেখে একই ছন্দে মেয়েও একটি শ্লোক রচনা করলেন। তখন হাস্‌সান বললেন ঃ তুমি যতদিন জীবিত আছ আমি আর একটি শ্লোকও রচনা করবো না। মেয়ে বললেন ঃ তা হয় না; বরং আমি আর আপনার জীবদ্দশায় কোন কবিতা রচনা করবো না।[৪৫]

প্রাক-ইসলামী 'আমলের অগণিত আরব কবির অনেকে ছিলেন 'আসহাবে মুজাহ্‌হাবাত' নামে খ্যাত। 'মুজাহ্‌হাবাত' শব্দটি 'জাহাব' থেকে নির্গত। 'জাহাব' অর্থ স্বর্ণ। যেহেতু এ সকল কবিদের কিছু অনুপম কবিতা স্বর্ণের পানি দ্বারা লিখিত হয়েছিল, এজন্য সেই কবিতাগুলিকে 'মুজাহ্‌হাবাত' বলা হতো। আর 'আসহাব' শব্দটি 'সাহেব' শব্দের বহুবচন। যার অর্থ 'অধিকারী, মালিক।' সুতরাং 'আসহাবে মুজাহ্‌হাবাত' অর্থ স্বর্ণ দ্বারা লিখিত কবিতা সমূহের অধিকারী বা রচয়িতাগণ। পরবর্তীকালে প্রত্যেক কবির সর্বোত্তম কবিতাটিকে 'মুজাহ্‌হাব' বলা হতে থাকে। হাস্‌সানের (রা) 'মুজাহ্‌হাবার' প্রথম পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[৪৬]

لَعَمْرُ أَبِيْكَ الْخَيْرُ حَقًّا لِمَا بِنَا عَلَى لِسَانِى فِى
الْخُطُوبِ وَلَا يَدِى -

(লা'আমরু আবীকাল খায়রু হাক্‌কান লিমা বিনা..............)

আরবী কবিদের চারটি তাবকা বা স্তর। ১. জাহিলী বা প্রাক-ইসলামী কালের কবি, ২.

মুখাদরাম— যে সকল কবি জাহিলী ও ইসলামী উভয় কাল পেয়েছেন, ৩. ইসলামী— যারা ইসলামের অভ্যুদয়ের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং কবি হয়েছেন, ৪. মুহদাস— আব্বাসী বা পরবর্তীকালের কবি। এ দিক দিয়ে হযরত হাস্‌সান দ্বিতীয় স্তরের কবি। তিনি জাহিলী ও ইসলাম— উভয়কালই পেয়েছেন।[৪৭]

কাব্য প্রতিভায় হাস্‌সান (রা) ছিলেন জাহিলী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন ঃ হাস্‌সানের জাহিলী আমলের কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের অন্তর্গত।[৪৮]

হাস্‌সানের (রা) কাব্য জীবনের দুইটি অধ্যায়। একটি জাহিলী ও অন্যটি ইসলামী। যদিও দুইটি ভিন্নধর্মী অধ্যায়, তথাপি একটি অপরটি থেকে কোন অংশে কম নয়। জাহিলী জীবনে তিনি গাস্‌সান ও হীরার রাজন্যবর্গের স্তুতি ও প্রশংসাগীতি রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামী জীবনে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা, তাঁর পক্ষে প্রতিরোধ ও কুরাইশদের নিন্দার জন্য। তিনি সমকালীন শহুরে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত। বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় অতি দক্ষ। আবু উবায়দাহ্ বলেন ঃ 'অন্য কবিদের ওপর হাস্‌সানের মর্যাদা তিনটি কারণে। জাহিলী আমলে তিনি আনসারদের কবি, রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াতের সময়কালে 'শা'য়িরুর রাসূল' এবং ইসলামী আমলে গোটা য়ামনের কবি।[৪৯]

জাহিলী আরবে উকাজ মেলায় প্রতি বছর সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎসব ও প্রতিযোগিতা হতো। এ প্রতিযোগিতায় হাস্‌সানও অংশগ্রহণ করতেন। একবার তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি আন-নাবিগা আয্-যুবইয়ানী (মৃতঃ ৬০৪ খ্রীঃ) ছিলেন এ মেলার কাব্য বিচারক। কবি হাস্‌সান ছিলেন একজন প্রতিযোগী। বিচারক আন-নাবিগা, আল-আ'শাকে হাস্‌সানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কবি বলে রায় দিলে হাস্‌সান তার প্রতিবাদ করেন এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে দাবী করেন।[৫০]

আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী বলেন ঃ আল-আ'শা আবু বাসীর প্রথমে কবিতা পাঠ করেন। তারপর পাঠ করেন হাস্‌সান ও অন্যান্য কবিরা। সর্বশেষে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি আল-খান্‌সা বিন্‌ত 'আমর তাঁর কবিতা পাঠ করেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে বিচারক আন-নাবিগা বলেন ঃ আল্লাহর কসম! একটু আগে পঠিত আবু বাসীর আল-আ'শার কবিতাটি যদি আমি না শুনতাম তাহলে অবশ্যই বলতাম, তুমি জিন ও মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর এ রায় শোনার সাথে সাথে হাস্‌সান উঠে দাঁড়ান এবং বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি আপনার পিতা ও আপনার চেয়ে বড় কবি। আন-নাবিগা তখন নিজের দুইট চরণ আবৃত্তি করে বলেনঃ ভাতিজা! তুমি এ চরণ দুইটির চেয়ে সুন্দর কোন চরণ বলতে পারবে কি? তখন হাস্‌সান তাঁর কথার জন্য লজ্জিত হন।[৫১] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আন-নাবিগার কথার জবাবে হাস্‌সান তাঁর —

'لنا الجفنات الغر يلمعن بالدجى الخ

(লানা আল-জাফানাতুল গুররু ইয়াল মা'না বিদদুজা) পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করেন। আন-নাবিগা তখন পংক্তি দুইটির কঠোর সমালোচনা করে হাস্‌সানের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।[৫২]

হাস্‌সান (রা) জাহিলী জীবনেই কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেন। গোটা আরবে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ দরবারসমূহে তিনি খ্যাতিমান কবিদের তালিকায় নিজের নামটি লেখাতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে তাঁর জীবনের ষাটটি বছর পেরিয়ে গেছে। এরপর তিনি ইসলামের দা'ওয়াত লাভ করলেন। রাসূল (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসলেন। হাস্‌সানের কাব্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হলো। তিনি স্বীয় কাব্য প্রতিভার যথাযথ হক আদায় করে 'শা'য়িরুর রাসূল' খিতাব অর্জন করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসার পর মক্কার কুরাইশরা এ আশ্রয়স্থল থেকে তাঁকে উৎখাতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এক দিকে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়, অন্যদিকে তারা তাদের কবিদের লেলিয়ে দেয়। তারা আল্লাহর রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করতো এবং আরববাসীদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো। এ ব্যাপারে মক্কার কুরাইশ কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেস ইবন আবদিল মুত্তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন যাব'য়ারী, 'আমর ইবনুল 'আস ও দাররার ইবনুল খাত্তাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও নিন্দাসূচক কবিতা রাসূল (সা) সহ মুসলমানদেরকে অস্থির করে তোলে।

এ সময় মদীনায় মুহাজিরদের মধ্যে আলী (রা) ছিলেন একজন নামকরা কবি। মদীনার মুসলমানরা তাঁকে অনুরোধ করলো মক্কার কবিদের জবাবে একই কায়দায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনার জন্য। আলী (রা) বললেন, রাসূল (সা) আমাকে অনুমতি দিলে আমি তাদের জবাব দিতে পারি। একথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেলে তিনি বললেন, আলী একাজের উপযুক্ত নয়। যারা আমাকে তরবারি দিয়ে সাহায্য করেছে, আমি আলীকে তাদের সাহায্যকারী করবো। হাস্‌সান উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের জিহ্বা টেনে ধরে বললেন ঃ আমি সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তাঁর জিহ্বাটি ছিল সাপের জিহ্বার মত, এক পাশে কালো দাগ। তিনি সেই জিহ্বা বের করে স্বীয় চিবুক স্পর্শ করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি কুরাইশদের হিজা (নিন্দা) কিভাবে করবে? তাতে আমারও নিন্দা হয়ে যাবে না? আমিও তো তাদেরই একজন। হাস্‌সান বললেন ঃ আমি আমার নিন্দা ও ব্যঙ্গ থেকে আপনাকে এমনভাবে বের করে আনবো যেমন আটা চেলে চুল ও অন্যান্য ময়লা বের করে আনা হয়। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি নসবনামার (কুষ্ঠি বিদ্যা) ব্যাপারে আবু বকরের সাহায্য নেবে। তিনি কুরাইশদের নসব বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি আমার নসব তোমাকে বলে দেবেন।[৫৩]

জাবির (রা) বলেন। আহযাব যুদ্ধের সময় একদিন রাসূল (সা) বললেন ঃ কে মুসলমানদের মান-সম্মান রক্ষা করতে পারে? কা'ব ইবন মালিক বললেন ঃ আমি। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন ঃ আমি। হাস্‌সান বললেন ঃ আমি। রাসূল (সা)

হাস্‌সানকে বললেন ঃ হাঁ, তুমি। তুমি তাদের হিজা (নিন্দা) কর। তাদের বিরুদ্ধে রুহুল কুদুস জিবরীল তোমাকে সাহায্য করবেন।[৫৪]

হাস্‌সান (রা) আবু বকরের (রা) নিকট যেতেন এবং কুরাইশ বংশের বিভিন্ন শাখা, ব্যক্তির নসব ও সম্পর্ক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতেন। আবু বকর বলতেন, অমুক অমুক মহিলাকে মুক্ত রাখবেন। তাঁরা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) দাদী। অন্য সকল মহিলাদের সম্পর্কে বলবেন। হাস্‌সান সে সময় কুরাইশদের নিন্দায় একটি কাসীদা রচনা করেন। তাতে তিনি কুরাইশ সন্তান আবদুল্লাহ, যুবাইর, হামযা, সাফিয়্যা, আব্বাস ও দাররার ইবন আবদিল মুত্তালিবকে বাদ দিয়ে একই গোত্রের তৎকালীন মুশরিক নেতা ও কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেস-এর মা সুমাইয়্যা ও তার পিতা আল-হারেসের তীব্র নিন্দা ও ব্যঙ্গ করেন।

উল্লেখ্য যে, এই আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেস ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ও দুধ ভাই। ইসলামপূর্ব সময়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর খুবই ভাব ছিল। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর তার সাথে দুশমনি শুরু হয়। তিনি ছিলেন একজন কবি। রাসূল (সা) ও মুসলমানদের নিন্দায় কবিতা রচনা করতেন। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুনাইন যুদ্ধে যোগদান করেন। এই আবু সুফইয়ানের নিন্দায় হাস্‌সান রচনা করেন এক অনবদ্য কাসীদা। তার কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ[৫৫]

১. তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছো, আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আর এর প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে।

২. তুমি নিন্দা করেছো একজন পবিত্র, পুণ্যবান ও সত্যপন্থী ব্যক্তির। যিনি আল্লাহর পরম বিশ্বাসী এবং অঙ্গিকার পালন করা যাঁর স্বভাব।

৩. তুমি তাঁর নিন্দা কর? অথচ তুমি তো তাঁর সমকক্ষ নও। অতএব, তোমাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা তোমাদের উৎকৃষ্টদের জন্য উৎসর্গ হোক।

৪. অতএব, আমার পিতা, তাঁর পুত্র এবং আমার মান-ইজ্জত মুহাম্মাদের মান-সম্মান রক্ষায় নিবেদিত হোক।

হাস্‌সানের (রা) এ কবিতাটি শুনে আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস মন্তব্য করেন ঃ নিশ্চয় এর পিছনে আবু বকরের হাত আছে। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় ও কাফিরদের নিন্দায় ৭০টি বয়েত (শ্লোক) রচনায় জিবরীল (আ) তাঁকে সাহায্য করেন।[৫৬]

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাব্যের প্রতিরোধ ব্যূহ রচনায় হাস্‌সানের (রা) এমন প্রয়াসে রাসূলে কারীম (সা) দারুণ খুশী হতেন। একবার তিনি বলেন ঃ 'হাস্‌সান! আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে তুমি জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে রুহুল কুদুস জিবরীলের দ্বারা সাহায্য কর।'[৫৭]

আর একবার রাসূল (সা) হাস্‌সানকে (রা) বললেন ঃ 'তুমি কুরাইশদের নিন্দা ও বিদ্রূপ করতে থাক, জিবরীল তোমার সাথে আছেন।[৫৮]

একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে কুরাইশ কবিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রত্যুত্তর করতে বললাম। সে সুন্দর প্রত্যুত্তর করলো। আমি কা'ব ইবন মালিককেও বললাম তাদের জবাব দিতে। সে উত্তম জবাব দিল। এরপর আমি হাস্‌সান ইবন সাবিতকে বললাম। সে যে জবাব দিল তাতে সে নিজে যেমন পরিতৃপ্ত হলো, আমাকেও পরিতৃপ্ত করলো।[৫৯]

হাস্‌সানের (রা) কবিতা মক্কার পৌত্তলিক কবিদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো সে সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন ঃ 'হাস্‌সানের কবিতা তাদের মধ্যে তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্র আঘাত করে।'[৬০]

'আয়িশা (রা) থেকে উরওয়া বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) তাঁর মসজিদে হাস্‌সানের জন্য একটি মিম্বর তৈরী করান। তার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কাফির কবিদের জবাব দিতেন।[৬১] তিনি এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা ও পরিচিতিমূলক কবিতা পাঠ করতেন এবং কুরাইশ কবিদের জবাব দিতেন, আর রাসূল (সা) তা শুনে দারুণ তুষ্ট হতেন।[৬২] এ কারণে 'আয়িশা (রা) একবার রাসূলুল্লাহর (সা) পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তিনি তেমনই ছিলেন যেমন হাস্‌সান বলেছে।[৬৩]

হিজরী নবম সনে (খ্রীঃ ৬৩০) আরবের বিখ্যাত গোত্র বনু তামীমের ৭০ অথবা ৮০ জনের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এলো। এই দলে বনু তামীমের আয্-যিবিরকান ইবন বদরের মত বাঘা কবি ও 'উতারিদ ইবন হাজিবের মত তুখোড় বক্তাও ছিলেন। তখন গোটা আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। তার আগের বছর মক্কাও বিজিত হয়েছে। জনসংখ্যা, শক্তি ও মর্যাদার দিক দিয়ে গোটা বনু তামীমের তখন ভীষণ দাপট। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থিত হয়ে আরবের প্রথা অনুযায়ী বললো ঃ 'মুহাম্মাদ ! আমরা এসেছি আপনার সাথে গর্ব ও গৌরব প্রকাশের প্রতিযোগিতা করতে। আপনি আমাদের কবি ও খতীব (বক্তা)দেরকে বলার অনুমতি দিন।' রাসূল (সা) বললেন ঃ আপনাদের খতীবদের অনুমতি দেওয়া হলো।' তখন বনু তামীমের পক্ষে তাদের শ্রেষ্ঠ খতীব 'উতারিদ ইবন হাজিব উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের গৌরব ও কীর্তির বর্ণনা দিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষে জবাব দিলেন প্রখ্যাত খতীব সাবিত ইবন কায়স। তারপর বনু তামীমের কবি যিবিরকান ইবন বদর দাঁড়ালেন এবং তাদের গৌরব ও কীর্তি কথায় ভরা স্বরচিত কাসীদা পাঠ করলেন। তাঁর আবৃত্তি শেষ হলে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'হাস্‌সান, ওঠো! লোকটির জবাব দাও।' হাস্‌সান দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষ কবির একই ছন্দ ও অন্তমিলে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত এক দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। তাঁর এ কবিতা পক্ষ-বিপক্ষের সকলকে দারুণ মুগ্ধ করে। বনু তামীমের শ্রোতারা এক বাক্যে সেদিন বলে, মুহাম্মাদের খতীব আমাদের খতীব অপেক্ষা এবং তাঁর কবি আমাদের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[৬৪]

হাস্‌সানের (রা) জাহিলী কবিতার বিষয়বস্তু ছিল গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত মাদাহ (প্রশংসা) ও হিজা (নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ)। তাছাড়া শোকগাঁথা, মদ পানের আড্ডা ও মদের বর্ণনা,

বীরত্ব, গর্ব ও প্রেম সংগীত রচনা করেছেন। ইসলামী জীবনের কবিতায় তিনি অন্তর দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা করেছেন, আর নিন্দা করেছেন পৌত্তলিকদের যারা আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের সাথে দুশমনী করেছে।

ইসলাম তাঁর কবিতায় সততা ও মাধুর্য দান করেছে। কবিতায় তিনি ইসলামের বহু বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কবিতায় পবিত্র কুরআনের প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এ কারণে যারা আরবী কবিতায় গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন করে অভিনবত্ব আনয়নের চেষ্টা করেছেন, হাস্‌সানকে তাদের পুরোধা বলা সঙ্গত। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা গীতি বা না'তে রাসূল রচনার সূচনাকারী তিনিই। আরবী কবিতায় জাহিলী ও ইসলামী আমলে মাদাহ (প্রশংসা গীতি) রচনায় যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, হাস্‌সান তাদের অন্যতম।[৬৫]

ইবনুল আসীর বলেন ঃ পৌত্তলিক কবিদের নিন্দা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অপপ্রচারের জবাব দানের জন্য তৎকালীন আরবের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরা হলেন হাস্‌সান ইবন সাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। হাস্‌সান ও কা'ব প্রতিপক্ষ কবিদের জবাব দিতেন তাদেরই মত বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহের জয়-পরাজয়, কীর্তি ও গৌরব তুলে ধরে। আর আবদুল্লাহ তাদের কুফরী ও দের দেবীর পূজার কথা উল্লেখ করে ধিক্কার দিতেন। তাঁর কবিতা প্রতিপক্ষের ওপর তেমন বেশী প্রভাব ফেলতো না। তবে অন্য দুইজনের কবিতা তাদেরকে দারুণভাবে আহত করতো[৬৬]

হাস্‌সান (রা) আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি কুরাইশদের অবাধ্যতা ও তাদের মূর্তিপূজার উল্লেখ করে নিন্দা করতেন না। কারণ, তাতে তেমন ফল না হওয়ারই কথা। তারা তো রাসূলকে (সা) বিশ্বাসই করেনি। আর মূর্তি পূজাকেই তারা সত্য বলে বিশ্বাস করতো। তাই তিনি তাদের বংশগত দোষ-ত্রুটি, নৈতিকতার স্খলন, যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে তাদেরকে চরমভাবে আহত করতেন। আর একাজে আবু বকর (রা) তাঁকে জ্ঞান ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন।

প্রাচীন আরবী কবিতার যতগুলি বিষয় বৈচিত্র আছে তার সবগুলিতে হাস্‌সানের (রা) পদচারণা পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে তাঁর কবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো ঃ

১. উপমার অভিনবত্ব ঃ একথা সত্য যে প্রাচীন আরবী কবিতা কোন উন্নত সভ্যতার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তবে একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, বড় সভ্যতা দ্বারা তা অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছে। আরব সভ্যতার সত্যিকার সূচনা হয়েছে পবিত্র কুরআনের অবতরণ ও রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের সময় থেকে। কুরআন আরবী বাচনভঙ্গি ও বাক্যালঙ্কারের সবচেয়ে বড় বাস্তব মুজিযা। এই কুরআন অনেক বড় বড় বাগ্মীকে হতবাক করে দিয়েছে। এ কারণে সে সময়ের যে কবি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁর

মধ্যে বাক্‌পটুতা ও বাক্যালঙ্কারের এক নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণীর কবিদের মধ্যে হাস্‌সান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এ শক্তি তাঁর মধ্যে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কিরামের গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— সিজদার চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে স্পষ্ট বিদ্যমান। হাস্‌সান উক্ত আয়াতকে উসমানের (রা) প্রশংসায় রূপক হিসেবে ব্যবহার করে হত্যাকারীদের ধিক্‌কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ৬৭

'তারা এই কাঁচা-পাকা কেশধারী, ললাটে সিজদার চিহ্ন বিশিষ্ট লোকটিকে জবাই করে দিল, যিনি তাসবীহ পাঠ ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করতেন।'

এই শ্লোকে কবি 'উসমানের চেহারাকে সিজদার চিহ্নধারী বলেছেন। তৎকালীন আরবী কবিতায় এ জাতীয় রূপকের প্রয়োগ সম্পূর্ণ নতুন।

২. চমৎকার প্রতীকের ব্যবহার ঃ আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে 'তাতবী' বা 'তাজাওয়ায' নামে এক প্রকার প্রতীকের নাম দেখা যায়। তার অর্থ হলো, কবি কোন বিষয়ের আলোচনা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু অকস্মাৎ অতি সচেতনভাবে তা ছেড়ে দিয়ে এমন এক বিষয়ের বর্ণনা করেন যাতে তাঁর পূর্বের বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। হাস্‌সানের কবিতায় এ জাতীয় প্রতীক বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আরবে অসংখ্য গোত্র দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে বসবাস করতো। তারা ছিল যাযাবর। যেখানে পানি ও পশুর চারণভূমি পাওয়া যেত সেখানেই তাঁবু গেড়ে অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলতো। পানি ও পশুর খাদ্য শেষ হলে নতুন কোন স্থানের দিকে যাত্রা করতো। এভাবে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। আরব কবিরা তাদের কাব্যে এ জীবনকে নানাভাবে ধরে রেখেছেন। তবে হাস্‌সান বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে বেশ অভিনবত্ব আছে । তিনি বলছেন ঃ 'জাফ্‌নার সন্তানরা তাদের পিতা ইবন মারিয়্যার কবরের পাশেই থাকে, যিনি খুবই উদার ও দানশীল।'

প্রশংসিত ব্যক্তি যেহেতু আরব বংশোদ্ভুত। এ কারণে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করে বলে দিলেন, এঁরা আরব হলেও যাযাবর নন, বরং রাজন্যবর্গ। কোন রকম ভীতি ও শঙ্কা ছাড়াই তাঁরা তাঁদের পিতার কবরের আশে-পাশেই বসবাস করেন। তাঁদের বাসস্থান সবুজ-শ্যামল। একারণে তাঁদের স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়ানোর প্রয়োজন পড়েনা।

৩. রূপকের অভিনবত্ব : আরব কবিরা কিছু কথা রূপক অর্থে এবং পরোক্ষে বর্ণনা করতেন। যেমন ঃ যদি উদ্দেশ্য হয় একথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি অতি মর্যাদাবান ও দানশীল, তাহলে তাঁরা বলতেন, এই গুণগুলি তার পরিচ্ছেদের মধ্যেই আছে। হাসসানের (রা) কবিতায় রূপকের অভিনবত্ব দেখা যায়। যেমন একটি শ্লোকে তিনি বলতে চান, আমরা খুবই কুলিন ও সম্ভ্রান্ত। কিন্তু কথাটি তিনি বলেছেন এভাবে : 'সম্মান

ও মর্যাদা আমাদের আঙ্গিনায় ঘর বেঁধেছে এবং তার খুঁটি এত মজবুত করে গেঁড়েছে যে, মানুষ তা নাড়াতে চাইলেও নাড়াতে পারে না।' এই শ্লোকে সম্মান ও মর্যাদার ঘর বাঁধা, সুদৃঢ় পিলার স্থাপন করা এবং তা টলাতে মানুষের অক্ষম হওয়া এ সবই আরবী কাব্যে নতুন বর্ণনারীতি।

৪. ছন্দ, অন্তমিল ও স্বর সাদৃশ্যের আশ্চর্য রকমের এক সৌন্দর্য তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শব্দের গাঁথুনি ও বাক্যের গঠন খুবই শক্ত, গতিশীল ও সাবলীল। প্রথম শ্লোকের প্রথম অংশের শেষ পদের শেষ বর্ণটি তাঁর বহু কাসীদার প্রতিটি শ্লোকের শেষ পদের শেষ বর্ণ দেখা যায়। আরবী ছন্দ শাস্ত্রে যাকে 'কাফিয়া' বলা হয়। আরবী বাক্যের এ ধরনের শিল্পকারিতা এর আগে কেবল ইমরুল কায়সের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর পরে বহু আরব কবি নানা রকম শিল্পকারিতার সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আব্বাসী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি আবুল 'আলা আল-মা'য়াররীর একটি বিখ্যাত কাব্যের নাম 'লুযুমু মালা ইয়ালযাযু'। কবিতা রচনায় এমন কিছু বিষয় তিনি অপরিহার্যরূপে অনুসরণ করেছেন, যা আদৌ কবিতার জন্য প্রয়োজন নয়। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি এ ধরনের কবিতার সমষ্টি। এটা তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

৫. হাস্‌সানের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রায়ই এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি হয়তো একটি ভাব স্পষ্ট করতে চেয়েছেন এবং সেজন্য এমন একটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন যাতে উদ্দিষ্ট বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় সুন্দরভাবে এসে গেছে।[৬৮]

৬. অতিরঞ্জন ও অতিকথন ঃ হাস্‌সানের ইসলামী কবিতা যাবতীয় অতিরঞ্জন ও অতিকথন থেকে মুক্ত বলা চলে। একথা সত্য যে কল্পনা ও অতিরঞ্জন ছাড়া কবিতা হয় না। তিনি নিজেই বলতেন, মিথ্যা বলতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ কারণে অতিরঞ্জন ও অতিকথন, যা মূলতঃ মিথ্যারই নামান্তর— আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।[৬৯]

শুধু তাই নয়, তাঁর জাহিলী আমলে লেখা কবিতায়ও এ উপাদান খুব কম ছিল। আর এ কারণে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি আন-নাবিগা কবি হাস্‌সানের একটি শ্লোকের অবমূল্যায়ন করলে দুই জনের মধ্যে ঝগড়া হয়।[৭০]

হাস্‌সানের ইসলামী কবিতার মূল বিষয় ছিল কাফিরদের প্রতিরোধ ও নিন্দা করা। কাফিরদের হিজা ও নিন্দা করে তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। তবে তাঁর সেই কবিতাকে অশ্লীলতা স্পর্শ করতে পারেনি। তৎকালীন আরব কবিরা 'হিজা' বলতে নিজ গোত্রের প্রশংসা এবং বিরোধী গোত্রের নিন্দা বুঝাতো। এই নিন্দা হতো খুবই তীর্যক ও আক্রমণাত্মক। এ কারণে কবিরা তাদের কবিতায় সঠিক ঘটনাবলী প্রাসঙ্গিক ও মনোরম ভঙ্গিতে তুলে ধরতো। জাহিলী কবি যুহাইর ইবন আবী-সুলমার 'হিজা' বা নিন্দার একটি স্টাইল আমরা তার দুইটি শ্লোকে লক্ষ্য করি। তিনি 'হিস্‌ন' গোত্রের নিন্দায় বলেছেন ঃ[৭১]

'আমি জানিনে। তবে মনে হয় খুব শিগ্‌গীর জেনে যাব। 'হিস্‌ন' গোত্রের লোকেরা পুরুষ না নারী?

যদি পর্দানশীল নারী হয় তাহলে তাদের প্রত্যেক কুমারীর প্রাপ্য হচ্ছে উপহার।'

যুহাইরের এ শ্লোকটি ছিল আরবী কবিতার সবচেয়ে কঠোর নিন্দাসূচক। এ কারণে শ্লোকটি উক্ত গোত্রের লোকদের দারুণ পীড়া দিয়েছিল। হাস্‌সানের নিন্দাবাদের মধ্যে শুধু গালিই থাকতো না, তাতে থাকতো প্রতিরোধ ও প্রতিউত্তর। তাঁর স্টাইলটি ছিল অতি চমৎকার। কুরাইশদের নিন্দায় রচিত তাঁর একটি কবিতার শেষের শ্লোকটি সেকালে এতখানি জনপ্রিয়তা পায় যে তা প্রবাদে পরিণত হয়। শ্লোকটি নিম্নরূপ ঃ

'আমি জানি যে তোমার আত্মীয়তা কুরাইশদের সংগে আছে। তবে তা এ রকম যেমন উট শাবকের সাথে উট পাখীর ছানার সাদৃশ্য হয়ে থাকে।'৭২

পরবর্তীকালে কবি ইবনুল মুফারিরগ উল্লেখিত শ্লোকটির ১ম পংক্তিটি আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিন্দায় প্রয়োগ করেছেন।৭৩ আল-হারেস ইবন 'আউফ আল-মুররীর গোত্রের বসতি এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত একজন মুবাল্লিগ নিহত হলে কবি হাস্‌সান তার নিন্দায় একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

'যদি তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে থাক তাহলে তা এমন কিছু নয়। কারণ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তোমাদের স্বভাব। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মূল থেকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ অঙ্কুরিত হয়।'

হাস্‌সানের এই বিদ্রূপাত্মক কবিতা শুনে আল-হারেসের দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন নেমে আসে। সে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে ছুটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং হাস্‌সানকে বিরত রাখার আবেদন জানায়।৭৪

হাস্‌সান (রা) চমৎকার মাদাহ বা প্রশংসা গীতি রচনা করেছেন। আলে 'ইনানের প্রশংসায় তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেছেন তার দুইটি শ্লোক এ রকম ঃ

'যারা তাদের নিকট যায় তাদেরকে তারা 'বারদী' নদীর পানি স্বচ্ছ শরাবের সাথে মিশিয়ে পান করায়।'

এই শ্লোকটিরই কাছাকাছি একটি শ্লোক রচনা করেছেন কবি ইবন কায়স মুস'য়াব ইবন যুবাইরের প্রশসংসায়। কিন্তু যে বিষয়টি হাস্‌সানের শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে তা ইবন কায়সের শ্লোকে অনুপস্থিত।৭৫

অন্য একটি শ্লোকে তিনি গাসসানীয় রাজন্যবর্গের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন চমৎকার স্টাইলে। 'তাঁদের গৃহে সব সময় অতিথিদের এত ভিড় থাকে যে তাঁদের কুকুরগুলিও তা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর তারা নতুন আগন্তুককে দেখে ঘেউ ঘেউ করে না।'

আরবী কাব্য জগতের বিখ্যাত তিন কবির তিনটি শ্লোক প্রশংসা বা মাদাহ কবিতা হিসেবে সর্বোত্তম। এ ব্যাপারে প্রায় সকলে একমত। তবে এ তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ভালো কোনটি সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কবি হুতাইয়্যা হাস্‌সানের এ শ্লোকটিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। কিন্তু অন্যরা আবুত ত্বিহান ও নাবিগার শ্লোক দুইটিকে সর্বোত্তম

বলেছেন।[৭৬] উমাইয়্যা খলীফা আবদুল মালিক ছিলেন একজন বড় জ্ঞানী ও সাহিত্য রসিক মানুষ। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো, 'আরবরা যত প্রশংসাগীতি রচনা করেছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো হাস্‌সানের শ্লোকটি।'[৭৭] তিনি রাসূলে কারীমের প্রশংসায় যে সকল কবিতা রচনা করেছেন তার স্টাইল ও শিল্পকারিতায় যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় রচিত একটি শ্লোকে তিনি বলেছেন ঃ 'অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র ললাট অন্ধকারে জ্বলন্ত প্রদীপের আলোর মত উজ্জ্বল দেখায়।'

হাস্‌সান (রা) জাহিলী ও ইসলামী জীবনে অনেক মারসিয়া বা শোকগাঁথা রচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল ছিল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় শোক ও ব্যথা। হাস্‌সান রচিত কয়েকটি মারসিয়ায় সে শোক অতি চমৎকাররূপে বিধৃত হয়েছে। ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে মারসিয়াগুলি সংকলন করেছেন।

হাস্‌সান ছিলেন একজন দীর্ঘজীবনের অধিকারী অভিজ্ঞ কবি। তাছাড়া একজন মহান সাহাবীও বটে। এ কারণে তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় প্রচুর উপদেশ ও নীতিকথা। কবিতায় তিনি মানুষকে উন্নত নৈতিকতা অর্জন করতে বলেছেন। সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিষয়ে দুইটি শ্লোক ঃ

'অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে আমি আমার মান-সম্মান রক্ষা করি। যে অর্থ-সম্পদে সম্মান রক্ষা পায়না আল্লাহ তাতে সমৃদ্ধি দান না করুন!

সম্পদ চলে গেলে তা অর্জন করা যায়; কিন্তু সম্মান বার বার অর্জন করা যায় না।'[৭৯]

মানুষের সব সময় একই রকম থাকা উচিত। প্রাচুর্যের অধিকারী হলে ধরাকে সরা জ্ঞান করা এবং প্রাচুর্য চলে গেলে ভেঙ্গে পড়া যে উচিত নয়, সে কথা বলেছেন একটি শ্লোকে ঃ

'অর্থ-সম্পদ আমার লজ্জা-শরম ও আত্ম-সম্মানবোধকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। তেমনিভাবে বিপদ-মুসবিত আমার আরাম-আয়েশ বিঘ্নিত করতে পারেনি।'[৮০]

অত্যাচারের পরিণতি যে শুভ হয় না সে সম্পর্কে তাঁর একটি শ্লোক ঃ

'আমি কোন বিষয় সম্পর্কে অহেতুক প্রশ্ন ও অনুসন্ধান পরিহার করি। অধিকাংশ সময় গর্ত খননকারী সেই গর্তের মধ্যে পড়ে।'[৮১]

তিনি একটি শ্লোকে মন্দ কথা শুনে উপেক্ষা করার উপদেশ দিয়েছেন ঃ

'মন্দ কথা শুনে উপেক্ষা কর এবং তার সাথে এমন আচরণ কর যেন তুমি শুনতেই পাওনি।'[৮২]

লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জীবন যাপন সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

'তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে তাদের চারণভূমি অন্যদের জন্য বৈধ করে দিয়েছি। তাই শত্রুরা সেখানে অপকর্ম সম্পন্ন করেছে।

তোমরা কি মৃত্যু থেকে পালাচ্ছো? দুর্বলতার মৃত্যু তেমন সুন্দর নয়।'[৮৩]

'আবদুল কাহির আল-জুরজানী বলেছেন, হাস্‌সানের রচিত কবিতার সকল পদের মধ্যে

একটা সুদৃঢ় ঐক্য ও বন্ধন দেখা যায়। এমন কি সম্পূর্ণ বাক্যকে একটি শক্তিশালী রশি বলে মনে হয়।[৮৪]

একালের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক বুটরুস আল-বুসতানী বলেন ঃ 'হাস্‌সানের কবিতার বিশেষত্ব কেবল তাঁর মাদাহ্ ও হিজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার রয়েছে এক বড় ধরনের বিশেষত্ব। আর তা হচ্ছে তাঁর সময়ের ঘটনাবলীর একজন বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের বিশেষত্ব। কারণ, তিনি বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিভিন্ন ঘটনাবলী। এ সকল যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং বিরোধী পক্ষে যারা নিহত হয়েছে তাদের অনেকের নাম তিনি কবিতায় ধরে রেখেছেন। আমরা যখন তাঁর কবিতা পাঠ করি তখন মনে হয়, ইসলামের প্রথম পর্বের ইতিহাস পাঠ করছি।"[৮৫]

প্রাচীন আরবের অধিবাসীরা দেহাতী ও শহুরে—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। মক্কা, মদীনা ও তায়েফের অধিবাসীরা ছিল শহরবাসী। অবশিষ্ট সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল দেহাতী বা গ্রাম্য। বেশীর ভাগ খ্যাতিমান কবি ছিলেন গ্রাম অঞ্চলের। এর মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু কবি শহরেও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে হাস্‌সানের স্থান সর্বোচ্চে।[৮৬]

ইবন সাল্লাম আল-জামহী বলেন ঃ 'মদীনা, মক্কা, তায়িফ, ইয়ামামাহ, বাহরাইন-এর প্রত্যেক গ্রামে অনেক কবি ছিলেন। তবে মদীনার গ্রাম ছিল কবিতার জন্য শীর্ষে। এখানকার শ্রেষ্ঠ কবি পাঁচজন। তিনজন খাযরাজ ও দুইজন আউস গোত্রের। খাযরাজের তিনজন হলেন ঃ হাস্‌সান ইবন সাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা। আউসের দুইজন হলেন ঃ কায়স ইবনুল খুতাইম ও আবু কায়স ইবন আসলাত। এঁদের মধ্যে হাস্‌সান শ্রেষ্ঠ।[৮৭] আবু 'উবায়দাহ বলেন ঃ 'শহুরে কবিদের মধ্যে হাস্‌সান সর্বশ্রেষ্ঠ।'[৮৮] একথা আবু 'আমর ইবনুল 'আলাও বলেছেন। কবি আল-হুতাইয়্যা বলেন ঃ 'তোমরা আনসারদের জানিয়ে দাও, তাদের কবিই আরবের শ্রেষ্ঠ কবি।'[৮৯] আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী বলেন ঃ হাস্‌সান শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইমরাউল কায়স হচ্ছে দোযখী কবিদের পতাকাবাহী এবং হাস্‌সান ইবন সাবিত তাদের সকলকে জান্নাতের দিকে চালিত করবে।[৯০]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন ঃ 'অকল্যাণ ও অপকর্মে কবিতা শক্তিশালী ও সাবলীল হয়। আর কল্যাণ ও সৎকর্মে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই যে হাস্‌সান, তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতার মান নেমে যায়। তাঁর জাহিলী কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা।'[৯১]

হাস্‌সানের (রা) বার্দ্ধক্যে একবার তাঁকে বলা হলো, আপনার কবিতা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং তার পর বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে। বললেন ঃ ভাতিজা! ইসলাম হচ্ছে মিথ্যার প্রতিবন্ধক। ইবনুল আসীর বলেন, হাস্‌সানের একথার অর্থ হলো কবিতার বিষয়বস্তুতে যদি অতিরঞ্জন থাকে তাহলে কবিতা চমৎকার হয়। আর যে কোন

অতিরঞ্জনই ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যাচার, যা পরিহারযোগ্য। সুতরাং কবিতা ভালো হবে কেমন করে?[৯২]

বুট্রুস আল-বুসতানী হাস্‌সানের (রা) কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন : 'আমরা দেখতে পাই হাস্‌সান তাঁর জাহিলী কবিতায় ভালো করেছেন। তবে সে কালের শ্রেষ্ঠ কবিদের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেননি। আর তাঁর ইসলামী কবিতার কিছু অংশে ভালো করেছেন। বিশেষতঃ হিজা ও ফখর (নিন্দা ও গর্ব) বিষয়ক কবিতায়। তবে অধিকাংশ বিষয়ে দুর্বলতা দেখিয়েছেন। বিশেষতঃ রাসূলের (সা) প্রশংসায় রচিত কবিতায় ও তাঁর প্রতি নিবেদিত শোকগাঁথায়। তবে ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়ে এ সকল কবিতা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ইসলামী কবিতায় এমন সব নতুন স্টাইল দেখা যায় যা জাহিলী কবিতায় ছিল না। ইসলামী আমলে হাস্‌সান একজন কবি ও ঐতিহাসিক এবং একই সাথে একজন সংস্কারবাদী কবিও বটে। রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক কবিদের পুরোধা।'[৯৩]

একবার কবি কা'ব ইবন যুহাইর একটি শ্লোকে গর্ব করে বলেন : কা'বের মৃত্যুর পর কবিতার ছন্দ ও অন্তমিলের কি দশা হবে? শ্লোকটি শোনার সাথে সাথে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি সাম্মাখের ভাই তোমরূয বলে উঠলেন : আপনি অবশ্যই সাবিতের ছেলে তীক্ষ্ণধী হাস্‌সানের মত কবি নন।[৯৪] যাই হোক, তিনি যে একজন বড় মাপের কবি ছিলেন তা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য।

হাস্‌সানের (রা) সকল কবিতা বহুদিন যাবত মানুষের মুখে মুখে ও অন্তরে সংরক্ষিত ছিল। পরে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। তাঁর কবিতার একটি দিওয়ান আছে যা ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। তবে এতে সংকলিত বহু কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ইমাম আল-আসমা'ঈ একবার বললেন : হাস্‌সান একজন খুব বড় কবি। একথা শুনে আবু হাতেম বললেন : কিন্তু তাঁর অনেক কবিতা খুব দুর্বল। আল-আসমা'ঈ বললেন : তাঁর প্রতি আরোপিত অনেক কবিতাই তাঁর নয়।[৯৫] ইবন সাল্লাম আল-জামহী বলেন : হাস্‌সানের মানসম্পন্ন কবিতা অনেক। যেহেতু তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লিখেছেন, এ কারণে পরবর্তীকালে বহু নিম্নমানের কবিতা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। মূলতঃ তিনি সেসব কবিতার রচয়িতা নন।[৯৬]

হাস্‌সানের (রা) নামে যাঁরা বানোয়াট কবিতা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন প্রখ্যাত সীরাত বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক। তিনি তাঁর মাগাযীতে হাস্‌সানের (রা) প্রতি আরোপিত বহু বানোয়াট কবিতা সংকলন করেছেন। পরবর্তীকালে ইবন হিশাম যখন ইবন ইসহাকের মাগাযীর আলোকে তাঁর 'আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ' সংকলন করেন তখন বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তখন তিনি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রাচীন আরবী কবিতার তৎকালীন পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের, বিশেষতঃ বসরার বিখ্যাত রাবী ও ভাষাবিদ আবু যায়িদ আল-আনসারীর শরণাপন্ন হন। তিনি ইবন ইসহাক বর্ণিত হাস্‌সানের কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, আর তার কিছু সঠিক বলে

মত দিতেন, আর কিছু তাঁর নয় বলে মত দিতেন। এই পন্ডিতরা যে সকল কবিতা হাস্‌সানের নয় বলে মত দিয়েছেন তাঁরও কিছু কবিতা ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। আর তা দিওয়ানেও সংকলিত হয়েছে।[৯৭]

প্রকৃতপক্ষে হাস্‌সানের (রা) ইসলামী কবিতায় যথেষ্ট প্রক্ষেপণ হয়েছে। এ কারণে দেখা যায় তাঁর প্রতি আরোপিত কিছু কবিতা খুবই দুর্বল। মূলতঃ এ সব কবিতা তাঁর নয়। আর এই দুর্বলতা দেখেই আল-আসমা'ঈর মত পণ্ডিতও মন্তব্য করেছেন যে, হাস্‌সানের ইসলামী কবিতা দারুণ দুর্বল।

হাস্‌সানের (রা) কবিতার একটি দিওয়ান ভারত ও তিউনিসিয়া থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে সেটি ১৯১০ সনে প্রফেসর গীব মেমোরিয়াল সিরিজ হিসেবে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশ পায়। লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস ও সেন্টপিটার্সবুর্গে দিওয়ানটির প্রাচীন হস্তলিখিত কপি সংরক্ষিত আছে।[৯৮]

শেষ জীবনে একবার হাস্‌সান (রা) গভীর রাতে একটি অনুপম কবিতা রচনা করেন। সাথে সাথে তিনি ফারে' দুর্গের ওপর উঠে চিৎকার দিয়ে নিজ গোত্র বনু ক্বায়লার লোকদের তাঁর কাছে সমবেত হওয়ার আহ্‌বান জানান। লোকেরা সমবেত হলে তিনি তাদের সামনে কবিতাটি পাঠ করে বলেন ঃ আমি এই যে কাসীদাটি রচনা করেছি, এমন কবিতা আরবের কোন কবি কখনও রচনা করেননি। লোকেরা প্রশ্ন করলো ঃ আপনি কি একথা বলার জন্যই আমাদেরকে ডেকেছেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভয় হলো, আমি হয়তো এ রাতেই মারা যেতে পারি। আর সে ক্ষেত্রে তোমরা আমার এ কবিতাটি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।[৯৯]

আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন ঃ সেকালে ছোট মঞ্চের ওপর গানের আসর বসতো। সেখানে বর্তমান সময়ের মত অশ্লীল কোন কিছু হতো না। বনী নাবীতে এরকম একটি বিনোদনের আসর বসতো। বার্দ্ধক্যে হাস্‌সান (রা) যখন অন্ধ হয়ে যান তখন তিনি এবং তাঁর ছেলে এ আসরে উপস্থিত হতেন। একদিন দুইজন গায়িকা তাঁর জাহিলী আমলে রচিত একটি গানে কণ্ঠ দিয়ে গাইতে থাকলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তখন তাঁর ছেলে গায়িকাদ্বয়কে বলতে থাকেন ঃ আরো গাও, আরো গাও।[১০০] তাঁর মানসপটে তখন অতীত জীবনের স্মৃতি ভেসে উঠেছিল।

হাস্‌সানের (রা) মধ্যে স্বভাবগত ভীরুতা থাকলেও নৈতিক সাহস ছিল অপরিসীম। একবার খলীফা 'উমার (রা) মসজিদে নববীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখলেন, হাস্‌সান মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছেন। 'উমার বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদে কবিতা পাঠ? হাস্‌সান গর্জে উঠলেন ঃ 'উমার! আমি আপনাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে এখানে কবিতা আবৃত্তি করেছি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'উমার (রা) বললেন ঃ সত্য বলেছো।[১০১]

হাস্‌সান (রা) ইসলাম-পূর্ব জীবনে মদ পান করতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মদ চিরদিনের জন্য পরিহার করেন। একবার তিনি তাঁর গোত্রের কতিপয় তরুণকে মদপান করতে দেখে ভীষণ ক্ষেপে যান। তখন তরুণরা তাঁর একটি চরণ আবৃত্তি করে বলে, আমরা তো আপনাকেই অনুসরণ করছি। তিনি বললেন, এটা আমার ইসলাম-পূর্ব জীবনের কবিতা। আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের পর আমি মদ স্পর্শ করিনি।[১০২]

হাস্‌সানের মধ্যে আমরা খোদাভীতির চরম রূপ প্রত্যক্ষ করি। কুরাইশ কবিদের সংগে যখন তাঁর প্রচন্ড বাক্‌যুদ্ধ চলছে, তখন কবিদের নিন্দায় নাযিল হলো সূরা আশ-শু'য়ারার ২২৪ নং আয়াত। রাসূলুল্লাহর (সা) তিন কবি হাস্‌সান, কা'ব ও আবদুল্লাহ কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াতের আওতায় তো আমরাও পড়েছি। আমরাও তো কাব্য চর্চা করি। আমাদের কি দশা হবে?' তখন রাসূল (সা) তাঁদেরকে আয়াতটির শেষাংশ অর্থাৎ ব্যতিক্রমী অংশটুকু পাঠ করে বলেন, এ হচ্ছো তোমরা।[১০৩]

হাস্‌সানের (রা) সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারের কবি ছিলেন। তিনি মসজিদে নববীতে রাসূলকে (সা) স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। এ ছিল এক বড় গৌরবের বিষয়। তাঁকে যথার্থই 'শা'য়িরুল ইসলাম' ও 'শা'য়িরুর রাসূল' উপাধি দান করা হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর পাশে থেকে কুরাইশ, ইহুদী ও আরব পৌত্তলিকদের প্রতি বিষাক্ত তীরের ফলার ন্যায় কথামালা ছুড়ে মেরে আল্লাহর রাসূলের (সা) মর্যাদা রক্ষা ও সমুন্নত করেছেন।

রাসূলে কারীম (সা) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন তাঁর সহধর্মীগণকে হাস্‌সান (রা) তাঁর সুরক্ষিত 'ফারে' দুর্গের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূল (সা) তাঁকে গণীমতের অংশ দিতেন। এমন কি উম্মুল মুমিনীন মারিয়্যা আল-কিবতিয়্যার বোন সীরীনকেও (রা) তুলে দেন হাস্‌সানের হাতে। খুলাফায়ে রাশেদীনের দরবারেও ছিল তাঁর বিশেষ মর্যাদা। খলীফাগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলতেন এবং তাঁর জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। এভাবে একটি একটি করে হাস্‌সানের (রা) সম্মান ও মর্যাদার বিষয়গুলি গণনা করলে দীর্ঘ তালিকা তৈরী হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা-১/৩২৬, তাহজীবুত তাহজীব-২/২১৬
২. উসুদুল গাবা-২/৪
৩. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২
৪. ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখুল আদাব আল-আরাবী-২/৭৭
৫. আল-ইসাবা-১/৩২৭; তাবাকাত-৮/২৭১
৬. সহীহ আল-বুখারী-২/৫৫৫
৭. আল-ইসাবা-১/৩২৬

৮. তাহজীবুল কামাল-৬/১৭; তাহজীবু ইবন 'আসাকির-৬/২৮৮
৯. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২
১০. তাবাকাতুশ শু'য়ারা-৮৪
১১. খুলাসাতুল ওয়াফা-২৯১
১২. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯; তাবাকাতুশ শু'য়ারা-৮৫
১৩. 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-১/৩২৫
১৪. প্রাগুক্ত-১/৩২৭
১৫. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যাহ-১/১০৩
১৮. কিতাবুল আগানী (দারুল কুতুব)-৩/১২
১৯. তাহজীবুল কামাল-৬/১৮; উসুদুল গাবা-২/৭; জাহাবী; তারীখুল ইসলাম-২/২৭৭
২০. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯; তাহজীবুল কামাল-৬/১৮
২১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৩; উসুদুল গাবা-২/৭
২২. তাহজীবুত তাহজীব-২/২১৭; কিতাবুল আগানী-৪/১৩৫; তাহজীবুল কামাল-৬/১৯
২৩. তাহজীবু ইবন আসাকির-৪/১৪৩; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২১
২৪. তাহজীবুত তাহজীব-১/২৪৮; তাহজীবু ইবন 'আসাকির-৪/১৩১; আল-আগানী-৪/১৪৫, ১৪৬
২৫. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবাল-২/৫১৮
২৬. উসুদুল গাবা-২/৬; কানযুল 'উম্মাল-৭/৯৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২২৮; আল-আগানী-৪/১৬৪
২৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২২; তাহজীবুল কামাল-৬/২৪
২৮. সাহীহ আল-বুখারী-২/১১৩
২৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯০
৩০. উসুদুল গাবা-২/৬
৩১. দেখুন ঃ ড. শাওকী-দায়ফঃ তারীখুল আদাব-২/৭৮
৩২. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৮
৩৩. তাহজীবু ইবন 'আসাকির-৪/১২৯
৩৪. সাহীহ বুখারী-৭/৩৩৮; ৮/৩৭৪; মুসলিম (২৪৮৮); সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৮
৩৫. বুখারী-৭/৩৩৮; মুসলিম (২৪৮৭; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৪
৩৬. মুসলিম- (২৪৯০); তাহজীবুল কামাল-৬/২০; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫
৩৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২২; আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯
৩৮. তাহজীবুল কামাল-৬/২৪
৩৯. উসুদুল গাবা-২/৬; আল-বিদায়া-৪/২৭২; হায়াতুস সাহাবা-১/১৪০
৪০. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা'-১৩৯
৪১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২; তাহজীবুল কামাল-৬/১৭; তারীখুল ইসলাম-২/২৭৭
৪২. তাহজীবুত তাহজীব-২/২১৬; তাহজীবুল কামাল-৬/১৭
৪৩. ডঃ 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-১/৩২৫
৪৪. কিতাবুল 'উমদাহ-২/২৩৫
৪৫. আশ-শি'র ওয়াশ-শু'য়ারা'-১৪০
৪৬. কিতাবুল 'উমদাহ-১/৬১; জুরজী যায়দান; তারীখুল আদাব-১/১৫০
৪৭. কিতাবুল 'উমদাহ্-১/২১
৪৮. দিওয়ানে হাস্সান-২৮
৪৯. জুরজী যায়দান ঃ তারীখুল আদাব-১/১৪৮; আল-ইসাবা-১/৩২৬

৫০. কিতাবুল আগানী-৯/৩৪০; জুরজী যায়দান-১/১০৩
৫১. আল-আগানী-১১/৬
৫২. প্রাগুক্ত-৯/৩৪০; নাকদুশ শি'র-৬২
৫৩. বুখারী-২/৯০৯; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৪, ৫১৫; তাহজীবু ইবন 'আসাকির-৪/১৩০
৫৪. আল-আগানী-১৬/২৩২; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৪
৫৫. আল-আগানী-৪/১৬৩; উসুদুল গাবা-২/৫; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫, ৫১৬
৫৬. তাহজীবুল কামাল-৬/২১৪
৫৭. সাহীহ বুখারী-৬/১২২; মুসলিম- (২৪৮৫); আহমাদ-৫/২২২, ২২৩
৫৮. বুখারী-৬/২২২, ৭/৩২১; মুসলিম- (২৪৮৬); মুসনাদ-৪/২৯৯; আল-আগানী-৪/১৩৭
৫৯. ডঃ শাওকী দায়ফ ঃ তারীখুল আদাব-২/৭৮
৬০. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০
৬১. আবু দাউদ- (৫০১৫); তিরমিজী- (২৮৪৬); তাহজীবুল কামাল-৬/২০
৬২. উসুদুল গাবা-২/৪; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫
৬৩. উসুদুল গাবা-২/৪
৬৪. আল-ইসতী'য়াব-১/১৩১; জুরজী যায়দান; তারীখ-১/১৪৯; ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখ-১/২২৯
৬৫. ড. 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখ-১/৩২৬
৬৬. উসুদুল গাবা-২/৫
৬৭. কিতাবুল 'উমদাহ-১/১৮৬
৬৮. কুদামা ইবন জা'ফার ঃ নাকদুশ শি'র-৫০
৬৯. উসুদুল গাবা-২/৫
৭০. নাকদুশ শি'র-৬২
৭১. কিতাবুল 'উমদাহ-২/১৩৯
৭২. ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখ-২/৮২
৭৩. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-
৭৪. ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখ-২/৭৮-৭৯
৭৫. কিতাবুল 'উমদাহ-২/১০২
৭৬. প্রাগুক্ত-২/১১০
৭৭. আল-ইসতী'য়াব-১/১৩০
৭৮. তাবাকাত-২/৯০, ৯১, ৯২; ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩৩০
৭৯. আবু তাম্মাম ঃ হামাসা-২/৫৮-৫৯
৮০. হামাসাতুল বুহতুরী-১১৯
৮১. প্রাগুক্ত-১১৩
৮২. প্রাগুক্ত-১৭২
৮৩. প্রাগুক্ত-২৬
৮৪. দালায়িলুল 'উজায-৭৪
৮৫. উদাবাউল 'আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম-২৭৮
৮৬. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৭০
৮৭. তাবাকাতুশ শু'য়ারা- ৮৩-৯৪
৮৮. উসুদুল গাবা-২/৫
৮৯. তাহজীবুত তাহজীব-২/২১৭
৯০. উদাবাউল 'আরাব-২৮১
৯১. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯; ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩৩৬

৯২. উসুদুল গাবা-২/৫
৯৩. উদাবাউল আরাব-২৭৮
৯৪. টীকা ঃ দিওয়ানু হাস্‌সান-২৮
৯৫. আল-ইসতী'য়াব-১/১৩০
৯৬. তাবাকাতুশ শু'য়ারা- ৮৩-৯৪
৯৭. ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখ-২/৭৯-৮০
৯৮. জুরজী যায়দান ঃ তারীখ- ১/১৫০
৯৯. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৯
১০০. প্রাগুক্ত-২/৫২০; দিওয়ান-৬৬
১০১. বুখারী-৬/২২১; মুসলিম- (২৪৮৫); আবু দাউদ- (৫০১৩), আন-নাসাঈ-২/৪৮; মুসনাদ-৫/২২২, ২২৩
১০২. আল-ইসতী'য়াব-১/১২৯
১০৩. হায়াতুস সাহাবা-৩/৭৭, ১৭২; তাফসীরে ইবন কাসীর-৩/৩৫৪।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)

আবদুল্লাহ (রা) মদীনার বিখ্যাত ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকার সন্তান। তাঁর বংশধারা উপরের দিকে ইউসুফ আলাইহিস সালামে গিয়ে মিলিত হয়েছে।[১] তাঁর উপনাম দুইটি ঃ আবু ইউসুফ ও আবুল হারেস। পিতার নাম সালাম ইবন হারেস। মদীনার খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা বনু 'আউফ। এই বনু 'আউফের একটি উপ-শাখার নাম 'কাওয়াকিল'। আবদুল্লাহ ইবন সালাম প্রাচীন জাহিলী আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী এই কাওয়াকিল গোত্রের 'হানীফ' বা চুক্তিবদ্ধ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে পরিণত হন।[২] ইসলামপূর্ব জাহিলী আমলে তাঁর নাম ছিল 'হুসাইন'। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) নামটি পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ রাখেন।[৩]

আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি হাদীস ও সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনায় যে কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি একজন বড় ইহুদী ধর্মগুরু হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাওরাতে রাসূলুল্লাহর (সা) আগমন কাল ও তাঁর পরিচয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা তাঁর জানা ছিল। অনেকের মত তিনিও শেষ নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে সর্বপ্রথম কুবার বনু 'আমর ইবন 'আউফ গোত্রে যখন ওঠেন তখন তিনি একটি খেজুর গাছের মাথায়। এক ব্যক্তি তাঁকে রাসূলের (সা) আগমন খবর দিলে তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেন এবং প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারেন তিনি নবী। তারপর রাসূল (সা) যখন মদীনার মূল ভূখণ্ডে এসে আবু আইউব আল-আনসারীর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন তখন আবদুল্লাহ আবার আসেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে। এই সাক্ষাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর অনেক কথা হয়। বিভিন্ন বর্ণনায় নানা ভাবে এ সব কথা এসেছে।[৪] এখানে আমরা কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলতেন ঃ আমার পিতার নিকট আমি তাওরাতের পাঠ ও ব্যাখ্যা শিখেছিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) পরিচয়, নিদর্শন, গুণাবলী ও তাঁর কর্মকাণ্ডসম্পর্কিত একটি আয়াত তিনি পড়ালেন। তারপর বললেন ঃ তিনি যদি হারূনের বংশধর হন তাহলে তাঁর অনুসরণ করবে, অন্যথায় নয়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পূর্বে মারা যান।

অতঃপর একদিন রাসূল (সা) মদীনায় আসলেন। আমি তখন বাগানে খেজুর পাড়ছিলাম আর আমার ফুফু খালেদা বিনতুল হারেস খেজুর কুড়াচ্ছিলেন। এই সময় ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ আরবের অধিকারী ব্যক্তি আজ এসে গেছেন। একথা শুনে আমি কাঁপতে শুরু করলাম এবং জোরে তাকবীর দিলাম।

আমার বৃদ্ধা ফুফু আমার এ অবস্থা দেখে বললেন ঃ ওরে খবীছ, তোমার যা হাল হয়েছে, মুসা ইবন ইমরানও যদি আসতেন তাহলেও এর চেয়ে বেশী হতোনা। আমি বললাম ঃ ফুফু! তিনি মুসারই ভাই এবং তাঁরই দ্বীনের ওপর আছেন। তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন ইনিও তাই নিয়ে এসেছেন।

আমি গাছ থেকে নেমে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম। তাঁর অবয়ব প্রত্যক্ষ করলাম এবং তাঁকে চিনলাম। আমি তাঁকে আমার পিতার কথা বললাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। পরে আমার ফুফুও ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫]

আবদুল্লাহ ইবন সালাম আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় পদার্পণ করলে মানুষ তাঁর কাছে ভীড় করলো। আমিও গেলাম। আমি দেখেই বুঝলাম এই চেহারা কোন ভণ্ড-মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি তাঁর মুখ থেকে সর্বপ্রথম এই কথাগুলি শুনলাম ঃ 'ওহে জনমণ্ডলী! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখ এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড় - তাহলে নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৬]

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে কুবা পৌঁছার পর আবদুল্লাহ ইবন সালামের প্রথম যে সাক্ষাৎ হয় উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সম্ভবত সেই সাক্ষাতের কথা বলেছেন। রাসূল (সা) তিনদিন কুবায় বিশ্রাম নেওয়ার পর মদীনার মূল ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করেন। পথে সকলের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে আবু আইউব আল-আনসারীর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম এ সময় আবার রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। আর এ সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন আনাস (রা)।

আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পর আবদুল্লাহ ইবন সালাম সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি আপনাকে এমন তিনটি প্রশ্ন করতে চাই যার উত্তর কেবল নবীরাই জানেন।

১. কিয়ামতের প্রথম আলামত বা নিদর্শন কি?

২. জান্নাতের অধিবাসীদের প্রথম খাবার কি?

৩. সন্তান পিতা অথবা মাতার সদৃশ হয় কেন?

রাসূল (সা) বললেন ঃ এই মাত্র জিবরীল কথাগুলি আমাকে বলে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন ঃ ফিরিশতাদের মধ্যে এই জিবরীলই তো ইহুদীদের দুশমন। রাসূল (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো, পূর্ব থেকে একটি আগুন বের হবে এবং মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমে সমবেত করবে। জান্নাতের অধিবাসীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তানের পিতা-মাতার সাদৃশ্যের কারণ হলো, পুরুষের পানি আগে বের হলে সন্তান তার দিকে ঝুঁকবে, আর স্ত্রীর পানি আগে বের হলে সন্তান ঝুঁকবে তাঁর দিকে। এ জবাব শুনে আবদুল্লাহ বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।

এরপর আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদীরা একটি মিথ্যাবাদী সম্প্রদায়। আমি একজন 'আলিম (জ্ঞানী) পিতার 'আলিম সন্তান। তেমনিভাবে একজন রয়িস (নেতা) পিতার রয়িস সন্তান। আপনি ইহুদীদের ডেকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তবে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা তাদের কাছে গোপন রাখবেন। তাঁর কথা মত রাসূল (সা) ইহুদীদের ডেকে তাদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলেন। এক পর্যায়ে তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম কে? তারা বললো ঃ তিনি তো আমাদের প্রাক্তন রয়িসের ছেলে বর্তমান রয়িস। 'আলিম পিতার 'আলিম সন্তান। রাসূল (সা) বললেন ঃ আচ্ছা, তিনি কি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন? তারা বললো ঃ কক্ষণো না।

এদিকে আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম তখন ঘরের এক কোণে লুকিয়ে আছেন। রাসূল (সা) তাঁকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত করলেন। তিনি কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে এসে ইহুদী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহকে একটু ভয় কর। তোমরা ভালো করেই জান এ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর দ্বীন সত্য।

তাঁর আবেদন সত্ত্বেও ইহুদীরা ঈমান আনলো না। বরং এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তারা যে অপমানিত হলো তাতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো ঃ তুমি একজন ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক। তুমি আমাদের সম্প্রদায়ের একজন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। তোমার বাবাও ছিল একজন ইতর।

আবদুল্লাহ্ তখন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দেখলেন তো। আমি এরই ভয় পাচ্ছিলাম।[৮] যখন ইহুদীরা রাসূলুল্লাহর (সা) দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল তখন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আহক্বাফের দশম আয়াতটি নাযিল হলো।[৯]

আবদুল্লাহ্ ইবন সালামের ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে ভিন্নমতও আছে। ইমাম শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহর ওফাতের দুই বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১০] ইমাম জাহাবী বলেন, এ একটি ব্যতিক্রমী ও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা। কারণ, সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাত ও মদীনায় আগমনের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[১১] ইবন সা'দ বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পর প্রথমভাগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইহুদীদের একজন 'হাব্‌র' বা ধর্মগুরু।[১২]

বদর ও উহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবন সালামের যোগদানের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মত পার্থক্য আছে। ইবন সা'দের মতে তিনি সর্বপ্রথম খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন। এ কারণে তাঁকে সাহাবীদের তৃতীয় তাবকা (স্তর) খন্দকের যোদ্ধাদের সাথে উল্লেখ করেছেন। খন্দকের পর থেকে সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

খলীফা 'উমারের (রা) বাইতুল মাকদাস সফরকালে তিনি সফরসঙ্গী ছিলেন। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, বায়তুল মাকদাস ও জাবিয়া বিজয়ের তিনি অন্যতম অংশীদার ছিলেন।[১৩]

বিদ্রোহীরা যখন খলীফা 'উসমানকে (রা) গৃহে অবরুদ্ধ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে তখন সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে তিনি একদিন সাক্ষাৎ করে বলেন ঃ আমরা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এখন এভাবে আপনার ঘরে বসে থাকা ঠিক হবে না। বাইরে যেয়ে সমবেত জনতাকে বিক্ষিপ্ত করে দিন। এ কথা বলে আবদুল্লাহ নিজেই জনতার সামনে এসে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ভাষণটি বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

"ওহে জনমণ্ডলী! জাহিলী 'আমলে আমার নাম ছিল হুসাইন। রাসূলুল্লাহ আমার নাম দেন আবদুল্লাহ। কুরআন পাকের এ আয়াতগুলি আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ

১. আর বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর তোমরা অহঙ্কার করছো। (সূরা আল-আহক্বাফ-১০)

২. কাফেররা বলে ঃ আপনি রাসূল নন। বলে দিনঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে (আসমানী) গ্রন্থের জ্ঞান আছে। (সূরা রা'দ-৪৩)

আল্লাহর তরবারি এখন পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে এবং আপনাদের এই শহর-রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাত স্থলকে ফিরিশতারা তাদের আবাসভূমি বানিয়ে রেখেছেন। অতএব আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। তাঁকে (উসমানকে) হত্যা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহর কসম! যদি আপনারা তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন তাহলে আপনাদের প্রতিবেশী ফিরিশতাগণ মদীনা ত্যাগ করবেন। আর এখন পর্যন্ত যে তরবারি কোষবদ্ধ আছে তা বেরিয়ে পড়বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আর কোষবদ্ধ হবে না।"

তাঁর এ ভাষণ কঠোর হৃদয় বিদ্রোহীদের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারলো না। বরং এর উল্টো ফল দেখা দিল। তাদের দুর্ভাগ্য ও হঠকারিতা আরো বেড়ে গেল। তারা বললো ঃ "এই ইহুদী ও উসমান-দুই জনকেই হত্যা কর।"[১৪]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলেন ঃ 'উসমান যখন গৃহবন্দী তখন আমি একদিন তাঁকে সালাম জানাতে গেলাম। আমি তাঁর গৃহে প্রবেশ করতেই তিনি বললেন ঃ আমার ভাই স্বাগতম! গত রাতে আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এই জানালা দিয়ে দেখেছি। তিনি বললেন ঃ 'উসমান! তোমাকে তারা অবরুদ্ধ করেছে? বললাম ঃ হাঁ। বললেন ঃ তোমাকে তারা তৃষ্ণার্ত রেখেছে? বললাম ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে একটি পানিভর্তি বালতি দিলেন। আমি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি চাইলে তাঁদের বিরুদ্ধে তোমাকে বিজয়ী করবো। আর ইচ্ছা করলে আজ আমার সাথে ইফতার করতে পার। আমি তাঁর সাথে ইফতার করাকে বেছে নিয়েছি। তিনি সেই দিন নিহত হন।[১৫]

খলীফা আলী (রা) মদীনার পরিবর্তে কুফাকে রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নিলে আবদুল্লাহ তাঁকে বলেন, "আপনি মদীনার মসজিদে রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বর ত্যাগ করবেন না। এটা ত্যাগ করলে আর কখনও তা যিয়ারত করতে পারবেন না।" আলী (রা) তখন মন্তব্য করেন "বেচারা বড় সরল ও সৎ মানুষ।"[১৬]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। আলী (রা) বলেন ঃ আমি ঘোড়ার পিঠে উঠার জন্য যখন জিনে পা রাখছি ঠিক সেই সময় আবদুল্লাহ ইবন সালাম আমার কাছে এসে বলেন ঃ কোথায় যাচ্ছেন? বললাম ঃ ইরাক। বললেন ঃ সেখানে গেলে আপনি তরবারির ধার লাভ করবেন। বললাম ঃ আমি আগেই একথাটি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি।[১৭]

খলীফা আলী ও আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) ঝগড়া ও বিবাদে তিনি জড়াননি। একটি কাঠের তৈরী তরবারি সঙ্গে নিয়ে এ বিবাদ থেকে সযত্নে দূরে থাকেন।[১৮]

সকল সীরাত বিশেষজ্ঞ একমত যে, তিনি আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৪৩ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন।[১৯] তিনি দুই ছেলে রেখে যান। তাঁদের নাম ইউসুফ ও মুহাম্মাদ। উভয়ের জন্ম হয় রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায়। ইউসুফ ছিলেন বড়। তাঁর জন্মের পর রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে কোলে নেন, মাথায় হাত রাখেন এবং ইউসুফ নাম রাখেন।[২০]

আবদুল্লাহর দৈহিক গঠনের তেমন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে একথা জানা যায় যে, বার্দ্ধক্যে দুর্বলতার দরুন লাঠি নিয়ে চলাফেরা করতেন এবং প্রয়োজনে তাতে ঠেস দিতেন।[২১] মুখমণ্ডলে খোদাভীতির ছাপ সর্বদা প্রতিভাত হতো।[২২]

আবদুল্লাহর (রা) বুকটি ভরা ছিল তাওরাত, ইনজীল, কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীর জ্ঞানে। তাওরাতে তাঁর সীমাহীন পারদর্শিতা সম্পর্কে আল্লামাহ জাহাবী লিখেছেন ঃ[২৩]

"আবদুল্লাহ ইবন সালাম তাঁর সময়ে মদীনায় আহলি কিতাবদের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।"

ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন ও হাদীসের প্রতি মনোযোগ দেন এবং এর জ্ঞানে সকলের আস্থা ভাজনে পরিণত হন। এর চেয়ে মর্যাদার বিষয় আর কি হতে পারে যে, আবু হুরাইরাহ— যিনি সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী ছিলেন, তিনিও আবদুল্লাহর নিকট হাদীস জিজ্ঞেস করতেন। একবার আবু হুরাইরাহ গেছেন শামে। সেখানে তিনি কা'ব ইবন আহ্বারের নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ 'জুম'আর দিন এমন একটি মুহূর্ত আছে তখন যদি কোন বান্দাহ আল্লাহর নিকট কিছু চায় তাহলে তিনি অবশ্যই তা তাকে দান করেন।' হাদীসটি শোনার পর কা'ব কিছুটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকেন। তারপর অবশ্য আবু হুরাইরার বর্ণনার সাথে একমত পোষণ করেন।

এদিকে তিনি (আবু হুরাইরাহ) মদীনায় ফিরে এসে আবদুল্লাহ ইবন সালামের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি শুনে মন্তব্য করেন ঃ কা'ব মিথ্যা বলেছে। তখন আবু হুরাইরাহ বললেন ঃ শেষে তিনি আমার কথা মেনে নিয়েছেন। আবদুল্লাহ বললেন ঃ আপনি কি জানেন সেটা কোন সময়? এ প্রশ্ন শুনে আবু হুরাইরাহ তাঁর পিছু নিলেন এবং সময়টি বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন। তখন আবদুল্লাহ বললেন ঃ আসর ও মাগরিবের মাঝখানের সময়। আবু হুরাইরাহ বললেন ঃ আসর ও মাগরিবের

মাঝখানে তো কোন নামায নেই। এ কেমন করে হয়? আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ আপনার হয়তো জানা নেই যে, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতীক্ষায় বসে থাকে সে যেন নামাযের মধ্যেই থাকে।[২৪]

হাদীসে এত পারদর্শিতা সত্ত্বেও তাঁর থেকে মাত্র পঁচিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৫] তাঁর মুখ থেকে হাদীস শুনে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেক সাহাবী আছেন। যেমন ঃ আনাস ইবন মালিক, যুরারাহ্ ইবন আওফা, আবু হুরাইরাহ, আবদুল্লাহ ইবন মা'কিল, আবদুল্লাহ ইবন হান্‌জালা প্রমুখ। এছাড়া তাঁর বিশেষ কয়েকজন ছাত্রের নাম ঃ খারাশা ইবন আল-হুর, কায়স ইবন 'উবাদ, আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান, হামযাহ ইবন ইউসুফ (পৌত্র), 'উমার ইবন মুহাম্মদ (পৌত্র), 'আওফ ইবন মালিক, আবু বুরাদাহ্ ইবন আবী মুসা, আবু সা'ঈদ আল-মুকরী, 'উবাদাহ্ আয-যারকী, 'আতা ইবন ইয়াসার, 'উবাইদুল্লাহ ইবন জায়শ আল-গিফারী, যুররাহ্ ইবন আওফা, ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (দুই পুত্র)।[২৬]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সালামের সম্মান ও মর্যাদা ছিল অতি উঁচুতে। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট 'আলিম সাহাবীদের অন্যতম। বিখ্যাত সাহাবী মু'য়াজ ইবন জাবালের অন্তিম সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন তাঁকে বলা হলো, আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন ঃ আমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। তবে আমার সাথে ইলম বা জ্ঞান উঠে যাচ্ছে না। যে ব্যক্তি তা তালাশ করবে, সে লাভ করবে। তোমরা আবুদ দারদা, সালমান আল-ফারেসী, আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ ও আবদুল্লাহ ইবন সালামের নিকট ইলম (জ্ঞান) তালাশ করবে। আবদুল্লাহ ছিলেন ইহুদী। পরে মুসলমান হন। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ সে দশম জান্নাতী ব্যক্তি।[২৭]

সা'দ ইবন 'আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন। আমি একমাত্র আবদুল্লাহ ইবন সালাম ছাড়া পৃথিবীতে বিচরণকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনিনি ঃ সে একজন জান্নাতের অধিকারী ব্যক্তি। তাঁরই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে সূরা আল-আহক্বাফের ১০নং আয়াতটি।[২৮]

মুস'য়াব ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস তাঁর পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এক পেয়ালা 'সারীদ' আনা হলো। তিনি খাওয়ার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলো। রাসূল (সা) বললেন ঃ এই ফাঁক দিয়ে একজন জান্নাতী ব্যক্তি প্রবেশ করবে এবং এই এঁটেটুকু খেয়ে ফেলবে। সা'দ বলেন ঃ আমি আমার ভাই 'উমাইরকে ওজু করতে পাঠিয়েছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম,সে এসে এঁটেটুকু খেয়ে ফেলুক। কিন্তু তাঁর আগেই আবদুল্লাহ ইবন সালাম এসে তা খেয়ে ফেলে।[২৯]

আবদুল্লাহ এত বড় মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও খুবই বিনয়ী ছিলেন। কেউ তাঁর সামান্য প্রশংসা করলে ক্ষেপে যেতেন। কায়স ইবন 'উবাদ বলেন ঃ আমি মদীনার মসজিদে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসলেন, যাঁর চেহারায় খোদাভীতির ছাপ বিদ্যমান ছিল। লোকেরা বললো ঃ ইনি একজন জান্নাতী ব্যক্তি। এরপর তিনি দুই

রাকা'য়াত সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করলেন। তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর ঘরে ঢুকলেন, আমিও পিছনে পিছনে ঢুকলাম। আমি তাঁর সাথে কথা বলে পরিচিত হওয়ার পর বললাম ঃ আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন লোকেরা এমন এমন কথা বলাবলি করছিল। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! কোন মানুষের এমন কথা বলা উচিত নয় যা সে জানেনা। আমি তোমাকে বলছি ঃ আমি একটি স্বপ্ন দেখে রাসূলুল্লাহকে (সা) বললাম। স্বপ্নটি এরূপ ঃ আমি যেন একটি সবুজ উদ্যান দেখতে পেলাম। যার মাঝখানে রয়েছে একটি লোহার খুঁটি। খুঁটির গোড়া মাটিতে এবং আগা আকাশে। আগায় একটি রশি বাঁধা। আমাকে বলা হলো ঃ খুঁটি বেয়ে উপরে ওঠো। আমি উঠে রশি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হলো ঃ শক্তভাবে আঁকড়ে থাক। রশিটি আমার হাতে থাকা অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। সকালে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে স্বপ্নটি বর্ণনা করলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ উদ্যানটি হলো ইসলামের উদ্যান, আর খুঁটি হলো ইসলামের খুঁটি। আর রশি হলো ইসলামের রশি। তুমি আমরণ ইসলামের ওপর থাকবে। বর্ণনাকারী কায়স বলেন ঃ সেই লোকটি হলেন আবদুল্লাহ ইবন সালাম।[৩০]

খারাশা ইবনুল হুর স্বপ্নটি একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩১] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্বপ্নের বিবরণ শুনে বলেন ঃ ইসলামের শক্ত রশি আঁকড়ে থাকা অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে।[৩২]

আবদুল্লাহর (রা) বিনয়ের আরো বহু ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। একবার তিনি লাকড়ীর একটি বোঝা মাথায় করে চলেছেন। তা দেখে লোকেরা তাঁকে বললো ঃ এমন কাজ করা থেকে আল্লাহ আপনাকে রেহাই দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ, ঠিক। তবে আমি এ কাজের মাধ্যমে আমার অহঙ্কার ও আভিজাত্য চুরমার করতে চাই। কারণ আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ যার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ 'কিবর' বা অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩৩]

আবদুল্লাহর (রা) মধ্যে সত্য ও সততার সীমাহীন আবেগ ও শক্তি ছিল। শেষ জীবনে তিনি বলতেন, তোমাদের যদি আর একবার কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়, আর সে সময় যদি আমার মধ্যে শক্তি না থাকে তাহলে একটি চৌকির ওপর আমাকে বসিয়ে দুই পক্ষের মাঝখানে রেখে দেবে।[৩৪]

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার সালমান আল-ফারেসী (রা) তাঁকে বললেন ঃ ভাই! আমাদের দুইজনের মধ্যে যে আগে মারা যাব তাকে স্বপ্নে দেখার চেষ্টা করবো যে জীবিত থাকবো। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন ঃ এটা কি সম্ভব? সালমান বললেন ঃ হাঁ, সম্ভব। ঈমানদার ব্যক্তির রূহ মুক্ত থাকে। পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। আর কাফির ব্যক্তির রূহ থাকে বন্দী। সালমান মারা গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলেন ঃ একদিন আমি মধ্যরাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। সালমান এসে আমাকে সালাম দিলেন। আমি সালামের জবাব দিয়ে বললাম ঃ আবু

আবদিল্লাহ! আপনি আপনার বাসস্থান কেমন পেয়েছেন? বললেন ঃ ভালো। আপনি তাওয়াক্‌কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা) আঁকড়ে থাকবেন। তাওয়াক্‌কুল খুব ভালো জিনিস। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কোন আমলটি সবচেয়ে ভালো পেয়েছেন? বললেন ঃ তাওয়াক্‌কুলকে আমি বিস্ময়কর জিনিস হিসেবে পেয়েছি।[৩৫]

আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ একবার আমি মদীনায় গিয়ে আবদুল্লাহ ইবন সালামের সংগে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কি আমার বাড়ীতে যাবে না? চল, তোমাকে ছাতু ও খোরমা খাওয়াবো। আমি গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ দেখ, তোমরা এমন এক অঞ্চলে বাস কর যেখানে সুদ প্রচলিত। তোমার যদি কোন ব্যক্তির কাছে কিছু পাওনা থাকে, আর সে তোমাকে পশুর খাদ্য কিছু ভূষিও উপহার দেয়, তুমি তা নিবে না। কারণ তা সুদ হয়ে যাবে।[৩৬] অন্য একটি বর্ণনায় ঘটনাটি একটু ভিন্নভাবে এসেছে।[৩৭]

আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) শানে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আহক্বাফ ও সূরা আর-রাদ-এর যথাক্রমে ১০নং ও ৪৩ নং আয়াত দুইটি ছাড়াও আরো দুইটি আয়াত নাযিল হয়েছে বলে কোন কোন মুফাস্‌সির মত প্রকাশ করেছেন। ইবন ইসহাক ইবন 'আব্‌বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সূরা আলে ইমরানের ১১৩ ও ১১৪ নং আয়াত দুইটি আবদুল্লাহ ইবন সালাম ও সা'লাবা ইবন সা'ইয়ার প্রশংসায় নাযিল হয়েছে।[৩৮] আল্লাহ তাঁদের প্রশংসায় বলেন ঃ

তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সিজদা করে। তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়, অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল।

এভাবে স্বয়ং আল্লাহ পাক আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) মর্যাদার সনদ দান করেছেন। তিনি কত মহান ব্যক্তি ছিলেন তা আল্লাহ তা'য়ালার এ ঘোষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-আ'লাম-৪/২৪৩
২. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৩; আল-ইসাবা-২/৩২০; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২৩০
৩. ইবন হিশাম-১/৫১৫; আল-মুসতাদরিক-৩/৪১৩; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৪
৪. দেখুন ঃ ইবন কাসীর ঃ আস্‌-সীরাহ্‌ আন-নাবাবিয়্যাহ্‌-১/৩৯৪-৩৯৭.
৫. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৬; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫১৬
৬. ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-১/৪৯৫; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৪. ইমাম তিরমিজী ও ইবন মাজাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৫

৮. বুখারী-৫/৪৬; জাহাবী ঃ তারীখ-১/২০৪; ইবন হিশাম-১/৫১৭; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৫, ৪১৬, ৪২০
৯. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪২১; জামি'উল বায়ান-২৬/১১
১০. আল-ইসাবা-২/৩২০
১১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৪
১২. প্রাগুক্ত-২/৪১৫
১৩. বুলুগুল আমানী-২২/৩৮৮; আল-আ'লাম-৪/২২৩; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২৩০
১৪. তিরমিজী-৬২৮;
১৫. আল-বিদায়া-৭/১৮২; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৪৪, ৬৪৫
১৬. আল-ইসাবাহ্-২/৩২১
১৭. হায়াতুস-সাহাবা-৩/৬৫
১৮. আল-আ'লাম-২/২২৩
১৯. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২০
২০. মুসনাদ-৪/৩৫
২১. মুসনাদ-৫/৪৫২
২২. আল-ইসাবা-৪/৩২১
২৩. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২২; ইবন হিশাম-১/৫১৫
২৪. মুসনাদ-৫/৪৫১, ৪৫৩
২৫. আল-আ'লাম-২/২২৩
২৬. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৬; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৩; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২৩০
২৭. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৬; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৮; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮২; তাবাকাত-২/৩৫২; তিরমিজী-৩৮০৪। ইমাম তিরমিজী এ হাদীসটিকে 'হাসান সাহীহ গারীব' বলেছেন। আল-হাকেম-৩/৪১৬
২৮. বুখারী-৭/৯৭; মুসলিম -(২৪৮৩); বুলুগুল আমানী-২২/৩৮৯; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৬
২৯. মুসনাদ-১/১৬৯, ১৮৩; সীয়ারু আ'লাম-২/৪১৭; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২৩০; বুলুগুল আমানী-২২/৩৯০
৩০. বুখারী-৫/৪৬; মুসলিম-(২৪৮৪); মুসনাদ-৫/৪৫২; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৭.
৩১. ইবন মাজাহ-(৩৯২০); মুসনাদ-৫/৪৫৩; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪২২
৩২. সীয়ারু আ'লাম-২/৪১৮
৩৩. তিরমিজী-(১৯৯৯); সীয়ারু আ'লাম-২/৪১১; আল-মুসতাদরিক-৩/৪১৬; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৩
৩৪. আল-ইসতী'য়াব-১/৩৯৬; সীয়ারু আ'লাম-২/৪২৩
৩৫. তাবাকাত-৪/৯৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬১৭
৩৬. বুখারী-৫/৪৬
৩৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪২৩
৩৮. প্রাগুক্ত-২/৪১৬; তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআন ঃ সূরা আলে ইমরানের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা)

তাঁর ভালো নাম সাহ্‌ল। ডাকনাম কয়েকটি। যেমন ঃ আবুল 'আব্বাস, আবু মালিক ও আবু ইয়াহইয়া। পিতার নাম সা'দ ইবন মালিক। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সায়িদার সন্তান। একজন বিখ্যাত আনসারী সাহাবী। পিতা সা'দও সাহাবী ছিলেন।[১]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পিতা নাম রাখেন 'হুয্‌ন'। রাসূল (সা) মদীনায় আসার পর পরিবর্তন করে তাঁর নাম রাখেন 'সাহ্‌ল'। একথা ইবন হিব্‌বান বর্ণনা করেছেন।[২] হিজরাতের পূর্বেই তাঁর পিতা সা'দ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি মুসলমান হিসেবেই বেড়ে ওঠেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনা আগমনের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের সময় তিনি সাত বছরের এক বালক মাত্র। যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে, এমন সময় তার পিতা হযরত সা'দ ইনতিকাল করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। বদর যুদ্ধের পর রাসূল (সা) গনীমতের একটি অংশ তাঁর মরহুম পিতাকেও দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি বদর যুদ্ধে যোগদানের সংকল্প করেছিলেন।

হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর সম বয়সী ছেলেদের সাথে মিলে মদীনার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ যুদ্ধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আহত হয়ে রক্তরঞ্জিত হয়েছিলেন। যখন তাঁর সেই রক্ত সাফ করা হয়েছিল, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[৩]

হিজরী পঞ্চম সনে যখন খন্দক যুদ্ধ হয় তখন তিনি দশ বছরের বালক মাত্র। তা সত্ত্বেও তীব্র আবেগ ও উৎসাহ ভরে খন্দক খননে অংশ নেন এবং কাঁধে করে মাটি বহন করেন।[৪] মোট কথা হিজরী এগারো সনে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর। তখনও তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার বয়স হয়নি।

খিলাফতে রাশেদার সময় কালের তাঁর জীবনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। হিজরী ৭৪ সনে স্বৈরাচারী ও উৎপীড়ক উমাইয়্যা শাসক হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের রোষানলে পড়েন। হাজ্জাজ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি খলীফা উসমানকে সাহায্য করেননি কেন? তিনি বলেন ঃ করেছি। হাজ্জাজ বলেন ঃ সত্য বলছেন না। এরপর তিনি অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতীক স্বরূপ তাঁর ঘাড়ে ছাপ মেরে দেওয়ার নির্দেশ দেন। হাজ্জাজের এ অপকর্মের হাত থেকে হযরত আনাস ও জাবির ইবন আবদিল্লাহর মত মর্যাদাবান সাহাবীদ্বয়ও রেহাই পাননি। হাজ্জাজের এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল যাতে মানুষ তাঁদের থেকে দূরে থাকে এবং তাঁদের কথায় কান না দেয়।[৫]

ইমাম যুহরী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর ইনতিকালের সময় সাহ্‌ল ইবন সা'দের বয়স হয়েছিল ১৫ বছর। আর তিনি হিজরী ৯১ সনে মদীনায় মারা যান। ওয়াকিদীর মতে তিনি এক

শো বছর জীবন লাভ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন ছিয়ানব্বই বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশী।[৬] ইবন হাজারের মতে হিজরী ৮৮ সনে তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ১০০ বছরের উর্দ্ধে।[৭] ইবন আবী দাউদের ধারণা, তিনি ইসকান্দারিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মিসরে মারা যান। ইবন হাজার বলেন, এ সব ধারণা মাত্র।[৮] ওয়াকিদী বলেন ঃ একথা বর্ণিত আছে যে, মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ। তবে সঠিক এই যে, হিজরী ৯১ সনে সাহল ইবন সা'দ আস-সা'য়িদী মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।[৯] তাঁর জীবনের শেষ ভাগে মদীনায় আর কোন সাহাবী ছিলেন না। ইসলামী খিলাফতের অন্যান্য অঞ্চলও তখন সাহাবীদের বরকত থেকে প্রায় মাহরূম হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেই বলতেন আমি মারা গেলে 'কালার রাসূল'(রাসূল বলেছেন) বলার কেউ থাকবে না।

হযরত সাহল ইবন সা'দ ছিলেন খ্যাতিমান সাহাবীদের একজন। বিশিষ্ট সাহাবীদের মৃত্যুর পর তিনি জনগণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। অতি আবেগ ও উৎসাহের সাথে অগণিত মানুষ হাদীস শোনার জন্য তাঁর কাছে ভীড় জমাতো।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যদিও তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন, তবুও বহু হাদীস শুনেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত উবাই ইবন কা'ব 'আসিম ইবন 'আদী, 'আমর ইবন 'আবাসা প্রমুখ খ্যাতিমান সাহাবীর নিকট থেকে এ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। মারওয়ান যদিও সাহাবী ছিলেন না, তবুও তাঁর নিকট থেকে কিছু হাদীস তিনি গ্রহণ করেছেন।[১০]

সাহাবী ও তাবে'ঈদের অনেকেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। তাঁদের বিশেষ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

আবু হুরাইরা, ইবন 'আব্বাস, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, আবু হাযিম ইবন দীনায, যুহরী, আবু সুহাইল সুবহী, 'আব্বাস ইবন সাহল (ছেলে), ওয়াফা ইবন শুরাইহ হাদরামী, ইয়াহইয়া ইবন মায়মুন হাদরামী, আবদুল্লাহ ইবন 'আবদির রহমান ইবন আবী জুবাব, 'আমর ইবন জাবির হাদরামী প্রমুখ।[১১]

হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সর্বমোট ১৮৮টি। তার মধ্যে ২৮টি মুত্তাফাক আলাইহি।[১২]

হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কাজ ও আচার-আচরণ অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। রাসূল (সা) একটি কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। একবার তিনি একটি মিম্বরের কথা বললেন। হযরত সাহল সাথে সাথে জঙ্গলে চলে যান এবং মিম্বরের জন্য কাঠ কেটে নিয়ে আসেন।[১৩] একবার তিনি নিজ হাতে রাসূলকে (সা) 'বুদা'য়া' কূপের পানি পান করিয়েছিলেন। একথা তিনি বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এটা মদীনার একটি কূপ। মদীনাবাসীরা তাতে ময়লা-আবর্জনা ফেলতো। তবে কূপটি বড় ছিল এবং তাতে অনেক ঝর্ণা ছিল।[১৪]

সত্য বলা ছিল হযরত সাহলের (রা) চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবদ্দশায় একবার মারওয়ান বংশের এক ব্যক্তি মদীনার আমীর হয়ে আসেন। তিনি হযরত সাহলকে (রা) ডেকে হযরত 'আলীকে (রা) গালি দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি সেই স্বৈরাচারী শাসকের নির্দেশ পালন করতে কঠোরভাবে অস্বীকার করেন। তখন সেই আমীর আবদার করেন, অন্ততঃ এতটুকুই বলুন যে,'আবু তুরাবের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' জবাবে হযরত সাহল বলেন ঃ আবু তুরাব ছিল 'আলীর প্রিয়তম নাম। রাসূল (সা) তাঁকে এ নামে ডেকে খুশী হতেন। এরপর তিনি 'আলীর (রা) আবু তুরাব নাম করণের ব্যাখ্যা করে শোনালে আমীর চুপ হয়ে যান।[১৫]

একবার সাহল ইবন সা'দ, আবু জার, 'উবাদা ইবনুস সামিত, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা ও ষষ্ঠ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে একথার ওপর বাই'য়াত করেন যে, আল্লাহর ব্যাপারে তাঁরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবেন না।[১৬] তাঁর জীবন-ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, আমরণ তিনি এ বাই'য়াতের ওপর অটল ছিলেন।

তাঁর হাদীসের দারসের মজলিসে কেউ উদাসীন বা অমনোযোগী থাকলে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। এ ধরনের একটি ঘটনা তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবু হাসেম বলেন, একবার এক মজলিসে তিনি হাদীস শোনাচ্ছেন। শ্রোতাদের কেউ কেউ তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল। তিনি ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বললেন ঃ এদেরকে দেখে রাখ। আমার দু'চোখ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যা কিছু দেখেছে, দু'কান যা কিছু শুনেছে, আমি তাই এদের নিকট বর্ণনা করছি, আর এরা তা না শুনে নিজেরা কথা বলছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝ থেকে চলে যাব, আর কক্ষনো ফিরে আসবো না। আমি জানতে চাইলাম ঃ কোথায় যাবেন? বললেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে যাব। বললাম ঃ আপনার ওপর এখন তো আর জিহাদ ফরজ নয়। আপনি এখন ঘোড়ার ওপর বসতে পারেন না, তরবারি দিয়ে আঘাত করার শক্তি রাখেন না এবং তীর-বর্শাও ছুড়তে পারেন না।

বললেন ঃ আবু হাসেম! আমি ময়দানে গিয়ে সারিতে দাঁড়িয়ে থাকবো। একটা অজানা তীর বা পাথর উড়ে এসে আমাকে আঘাত করবে এবং আল্লাহ তাতেই আমাকে শাহাদাত দান করবেন।[১৭]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাকরীবুত তাহজীব-১/৩৩৬; উসুদুল গাবা-২/৩৬৬; আল-ইসাবা-২/৮৮; আল-আ'লাম-৩/২১০
২. উসুদুল গাবা-২/৩৬৬; আল-ইসাবা-২৮৮
৩. মুসনাদ-৫/৩৩৪
৪. প্রাগুক্ত-৫/৩৩২
৫. উসুদুল গাবা-২/৩৬৬
৬. শাজারাতুজ জাহাব-১/৯৯; উসুদুল গাবা-২/৩৬৬

৭. তাকরীবুত তাহজীব-১/৩৩৬
৮. আল-ইসাবা-২/৮৮
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮
১০. আল-ইসাবা-২/৮৮
১১. প্রাগুক্ত-২/৮৮; উসুদুল গাবা-২/৩৬৬
১২. আল-আ'লাম-৩/২১০; সীয়ারে আনসার-২৬
১৩. মুসনাদ-৫/৩৩৭
১৪. মুসনাদ-৫/৩৩৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৫৩৭
১৫. মুসলিম-১/৩২৬
১৬. হায়াতুস সাহাবা (আরবী)-১/২৪৩
১৭. প্রাগুক্ত-৩/২০৭-২০৮

সাহ্ল ইবন হুনাইফ (রা)

নাম সাহ্ল, ডাকনাম আবু সা'দ, আবু 'আবদিল্লাহ, আবুল ওয়ালীদ ও আবু সাবেত। পিতা হুনাইফ ইবন ওয়াহিব এবং মাতা হিন্দা বিন্‌তু রাফে'। মদীনার আউস গোত্রের সন্তান। বিখ্যাত আনসারী বদরী সাহাবী।[১] তাঁর ভাই 'আব্বাদ ইবন হুনাইফ ছিল মদীনার অন্যতম মুনাফিক। মসজিদে 'দিরার' যারা নির্মাণ করেছিল, সে তাদের একজন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর ও তিনি রাতের অন্ধকারে সকলের অগোচরে ঘুরে ঘুরে মদীনার বিভিন্ন স্থানের বিগ্রহগুলি ভেঙ্গে ফেলতেন। কাঠের বিগ্রহগুলি ভেঙ্গে তাঁরা সেই কাঠ দরিদ্র মুসলমানদের গৃহে জ্বালানীর জন্য পৌঁছে দিতেন। হযরত 'আলী (রা) মদীনায় হিজরাতের পর কুবায় কুলছুম ইবন হাদামের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। তার পাশেই ছিল এক মহিলার বাড়ী। প্রতিদিন গভীর রাতে সেই বাড়ীর দরজা খোলার শব্দ তিনি শুনতে পেতেন। তারপর একজন লোকের ভিতরে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার সাড়া পেতেন। একদিন তিনি বিষয়টি জানার জন্য মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলাটি বললেন ঃ আমি একজন বিধবা মুসলিম নারী। প্রতিদিন রাতে যিনি এখানে আসেন, তিনি সাহ্ল ইবন হুনাইফ। তিনি রাতে ঘুরে ঘুরে মূর্তি ভাঙ্গেন এবং তার কাঠগুলি আমার জ্বালানীর জন্য দিয়ে যান।[৩]

হযরত রাসূলে কারীম(সা) মদীনায় আসার পর আলীর (সা) সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।[৪]

বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।[৫] উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয়ের সময় যে ১৫ জন সাহাবী জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ময়দানে অটল থাকেন তিনি তাঁদের অন্যতম।[৬] সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মরণের শপথ করেছিলেন। রাসূলকে (সা) লক্ষ্য করে কাফিররা যে সব তীর ছুড়েছিলো, তিনি তার জবাব দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) সংগের লোকদের তখন বলেছিলেন, 'তোমরা তাকে তীর দাও, এ হচ্ছে সাহল।' হযরত 'উমার (রা) পরবর্তী কালে কোন সংকট মুহূর্তে সাহল উপস্থিত থাকলে তাঁকে সৌভাগ্যের প্রতীক ধরে নিয়ে বলতেন, সাহ্ল আছে, কোন ভাবনা নেই।[৭] উহুদ যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা) ফাতিমার নিকট এসে তরবারি এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এই লও তরবারি যা মোটেই নিন্দিত নয়।' একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি ভালো যুদ্ধ করেছো। তবে সাহল ও আবু দুজানা–উভয়ে ভালো যুদ্ধ করেছে।'[৮]

হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হলে তিনি তাঁর পক্ষে ছিলেন। আলী (রা) যখন ইরাকে যান তখন তাঁকে মদীনার আমীর নিয়োগ করেন।[৯] এক সময় খলীফা তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি মদীনা ছেড়ে কূফায় চলে যান।[১০] উটের যুদ্ধের পর হযরত আলী

(রা) তাঁকে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন।[১১] সিফ্ফীন যুদ্ধে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন।[১২] যুদ্ধ শেষে তিনি কূফায় চলে যান। এসময় তাঁকে 'ফারেস'-এর আমীর নিয়োগ করা হয়।[১৩] কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়। হযরত 'আলী (রা) তাঁর স্থলে যিয়াদ ইবন আবীহকে তথাকার আমীর নিয়োগ করেন।[১৪]

মদীনা থেকে ইহুদী গোত্র বনু নাদীর বিতাড়িত হওয়ার পর তাদের থেকে আটককৃত ধন-সম্পদ রাসূল (সা) মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেন। আনসারদের মধ্যে সাহল ইবন হুনাইফ ও আবু দুজানা সিমাক ইবন খারাশা নিজেদের চরম দারিদ্রের কথা প্রকাশ করলে রাসূল (সা) তাদেরকেও কিছু দেন।[১৫] আল্লামা সুহাইলীর মতে মোট তিনজন আনসারকে বনু নাদীরের সম্পদ থেকে অংশ দেওয়া হয়েছিল।[১৬]

ওয়াকিদী ও আল-মাদায়িনী বলেন, সাহল ইবন হুনাইফ হিজরী ৩৮ সনে কূফায় ইনতিকাল করেন। হযরত আলী (রা) তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন মা'কাল বলেন ঃ আমি 'আলীর সাথে সাহল ইবন হুনাইফের জানাযার নামায পড়েছি। এ নামাযে তিনি ছয় তাকবীর বললেন। কেউ একজন এর প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, হুনাইফ ছিলেন বদরী সাহাবী। আমি ছয় তাকবীরের দ্বারা অন্যদের ওপর বদরীদের ফজীলাতের কথা তোমাদের জানাতে চেয়েছি।[১৭]

মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে রেখে যান। তাঁরা হলেন ঃ আবু উমামা আস'য়াদ ও 'আবদুল্লাহ। প্রথমজন রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করেন।[১৮]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আসার নয় মাসের মাথায় তাঁর একজন অতি প্রিয় আনসারী সাহাবী আস'য়াদ ইবন যুরারা ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন 'বাই'য়াতে 'আকাবার' সময় মনোনীত ১২ নাকীবের 'নাকীবুন নুকাবা' বা প্রধান নাকীব। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল (সা) তাঁর একটি মেয়েকে নিজ দায়িত্বে লালন-পালন করেন এবং তাঁকে এই সাহল ইবন হুনাইফের সাথে বিয়ে দেন। তাঁরই পেটে জন্মগ্রহণ করেন আবু উমামা ইবন সাহল।[১৯]

তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন ব্যক্তি। চেহারায় একটা পবিত্রতার ছাপ বিরাজমান ছিল। দৈহিক গঠন ছিল অতি সুন্দর। একবার এক যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনের পিঠে আরোহী ছিলেন। সেখানে ছিল একটি ঝর্ণা। সেই ঝর্ণায় তিনি গোসল করতে যান। এক আনসারী তাঁর দেহের অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন : 'এ কেমন অপরূপ দেহ তার? আমি তো এমনটি আর কখনো দেখিনি।' এতে হযরত সাহলের কুনজর লাগে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরে ভীষণ জ্বর এসে যায়। রাসূল (সা) এর কারণ জানতে চাইলেন। লোকেরা ঘটনাটি বর্ণনা করলো। তিনি তাদের কথা শুনে বললেন, মানুষ তার ভাইয়ের শরীর অথবা ধন-সম্পদ দেখে এবং তার জন্য দু'আ করে না। এ জন্য নজর লেগে যায়। নজর সত্য।[২০]

আল্লামা যিরিকলী সাহীহাইনে তাঁর থেকে বর্ণিত চল্লিশটি হাদীস সংকলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও যায়িদ ইবন সাবিত থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু তাবে'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ

আবু ওয়ায়িল, 'উবাইদ ইবন সাববাক, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা, সীরীন ইবন 'আমর, রাবাব প্রমুখ।[২২]

তিনি সব সময় সকল প্রকার মতভেদ থেকে দূরে থাকতেন। সিফ্‌ফীন থেকে ফিরে আসার পর ছাত্র আবু ওয়ায়িল বললেনঃ আমাদের কাছে কিছু ঘটনা বর্ণনা করুন। বললেনঃ কী বর্ণনা করবো? কঠিন সমস্যা। একটি ছিদ্র বন্ধ করলে আরেকটি খুলে যায়।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও উদ্যমী। কিন্তু মানুষ তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতো। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, এ তাঁদের মতের দোষ। আমি কাপুরুষ নই। যে কাজের জন্যই আমি তলোয়ার উঠিয়েছি, তা চিরকালের জন্য সহজ করে দিয়েছি। হুদাইবিয়ার দিন লড়াই করা যদি রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছার বিরোধী না হতো, আমি সে দিনও লড়তে প্রস্তুত ছিলাম।[২৩]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাকরীবুত তাহজীব-১/৩৩৬; আল-ইসাবা-২/৮৭; তাবাকাত-৩/৪৭০; উসুদুল গাবা-২/৩৬৪।
২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৭৭; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৩০
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৫
৪. আল-ইসাবা-২/৮৭; আনসাবুল আশরাফ-১/২৭০; তাহজীবুত তাহজীব-৪/২৫১; আল-আ'লাম-৩/২০৯; তাবাকাত-৩/৪৭১
৫. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৮; আল-আ'লাম-৩/২০৯
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮; আল-আ'লাম-৩/২০৯
৭. তাবাকাত-৩/৪৭১; আল-ইসাবা-২/৮৭; উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১০০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৪২
৯. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৮
১০. উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
১১. তাকরীবুত তাহজীব-১/৩৩৬
১২. বুখারী-২/৬০২; আল-ইসাবা-২/৮৭; আল-আ'লাম-৩/২০৯
১৩. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৮; উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
১৪. সীয়ারে আনসার-২/৭
১৫. তাবাকাত-৩/৪৭২; আনসাবুল আশরাফ-১/৫১৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৯২
১৬. টীকা সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৯২
১৭. তাবাকাত-৩/৪৭২; শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৮; আল-আ'লাম-৩/২০৯; উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
১৮. সীয়ারে আনসার-২/৮
১৯. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩
২০. উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
২১. আল-আ'লাম-২/৩৬৫
২২. তাবাকাত-৬/৮; আল-ইসাবা-২/৮৭; উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
২৩. সাহীহ বুখারী-২/৬০২

নু'মান ইবন বাশীর (রা)

সীরাতের গ্রন্থাবলীতে হযরত নু'মানের (রা) দুইটি কুনিয়াত বা ডাকনাম পাওয়া যায় ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ ও আবূ মুহাম্মদ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের সন্তান। তিনি একজন আমীর, খতীব, শা'রিয়, আলিম ও অন্যতম আনসারী সাহাবী।[১] তাঁর পিতা বাশীর ইবন সা'দও একজন বড় মাপের সাহাবী।[২] তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।[৩]

বাশীর ইবন সা'দ (রা) শেষ 'আকাবায় সত্তর, মতান্তরে পঁচাত্তর জন আনসারের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। বদর, উহুদসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর মদীনার সাকীফা বনী সা'য়েদাহ্তে খলীফা নির্বাচনের যে সমাবেশ হয় তাতে সর্ব প্রথম এই বাশীর ইবন সা'দ আবূ বকরের (রা) হাতে বাই'য়াত করেন।[৪] হিজরী ১২ সনে সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালীদের (রা) নেতৃত্বাধীনে তিনি ভণ্ডনবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে 'আয়নুত তামার'–এর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৫]

নু'মানের (রা) মায়ের নাম 'উমরাহ বিন্ত রাওয়াহা। তিনি বিখ্যাত কবি সাহাবী ও শহীদ সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) বোন।[৬] তিনিও রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাহাবীয়্যাত বা সাহচর্য্যের গৌরব অর্জন করেন।

এমনই এক পবিত্র ও মহান পরিবারে নুমানের (রা) জন্ম । ইবন সা'দ বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের চৌদ্দ মাসের মাথায় রবিউল আখের মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এটা মদীনাবাসীদের বর্ণনা। কুফাবাসীরা অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা নু'মান থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তিনি– 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি'– বলেছেন। তারা বলেন, মদীনাবাসীরা তাঁর জন্ম সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তার থেকে তিনি বয়সে যে বড়, তার এ বর্ণনাসমূহ দ্বারা তা বুঝা যায়। বালাজুরী বলেন ঃ হিজরী দ্বিতীয় সনে আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। আর এ সনেই জন্মগ্রহণ করেন আন-নু'মান ইবন বাশীর। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর আনসারদের ঘরে জন্ম গ্রহণকারী প্রথম শিশু নু'মান। রাসূল (সা) তাঁর 'তাহনীক' করেন।[৮] (খেজুর বা অন্য কিছু চিবিয়ে শিশুর মুখে দেওয়াকে 'তাহনীক' বলে। তাঁর জন্মের ছয় মাস পরে জন্মলাভ করেন আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা)। পরবর্তীকালে তাই তিনি বলতেন, আন-নু'মান ইবন বাশীর আমার চেয়ে ছয় মাসের বড়।[৯] ইমাম বুখারীর মতে, তাঁর জন্ম হিজরাতের বছরে।[১০]

ইমাম জাহাবী হযরত নু'মানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'তিনি হিজরী দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে হাদীস শুনেছেন। সীরাত বিশেষজ্ঞরা

সর্বসম্মতভাবে তাঁকে শিশু সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।'[১১]

ইসলামের ইতিহাসে হিজরী দ্বিতীয় সনের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ বছরের শুরুতেই মক্কার কুরাইশ ও তার আশে পাশের অন্যান্য গোত্রের সাথে মদীনার মুসলমানদের সংঘাত–সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে বদর যুদ্ধের মাধ্যমে। এ বছর যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের ওপর এই বিপ্লবী সময় ও ঘটনার একটা প্রভাব হয়তো পড়ে থাকবে। এ কারণে আন নু'মান ও আবদুল্লাহ– প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে বড় বড় বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করেছেন।

নু'মানের পিতা-মাতা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্র (সা) নিকট নিয়ে গিয়ে তাঁর জন্য দু'আ চাইতেন। মা তাঁকে এত বেশী ভালোবাসতেন যে, অন্য সন্তানদের বঞ্চিত করে সকল ধন-সম্পদ তাঁর নামে লিখে দিতে চাইতেন। একবার তিনি এ ব্যাপারে স্বামীকে রাজী করেন এবং সাক্ষী হিসেবে রাসূলুল্লাহকে (সা) মনোনীত করেন। বাশীর (রা) ছেলে নু'মানকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন আমি আমার অমুক অমুক ভূমি এই ছেলেকে দান করছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি তোমার অন্য সন্তানদের অংশও এভাবে দিয়েছো? বললেন ঃ না, দিইনি। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তাহলে আমি তো এমন অবিচারের সাক্ষী হতে পারিনে। একথা শোনার পর বাশীর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।[১২]

হেঁটে বেড়ানোর বয়স হলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেতেন। একবার তায়েফ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু আঙ্গুর এলো। তিনি নু'মানের হাতে দুইটি ছড়া দিয়ে বললেন, একটি তোমার এবং একটি তোমার মায়ের। নু'মান বাড়ী ফেরার পথে দুইটি ছড়াই খেয়ে ফেলেন। বাড়ী এসে আঙ্গুরের ব্যাপারে কাউকে কিছু বললেন না। কয়েক দিন পর রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মাকে আঙ্গুর দিয়েছিলে? জবাব দিলেন ঃ না। রাসূল (সা) তখন তাঁর কানমলা দিয়ে বললেন ঃ ওরে ঠক্‌বাজ![১৩]

সেই শৈশবকালেই মু'মান নামায ও অন্যান্য ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হন। রাসূলুল্লাহর (সা) বিভিন্ন আচরণ মনোযোগ সহকারে দেখতেন এবং স্মরণ রাখার চেষ্টা করতেন। মসজিদে মিম্বরের কাছাকাছি বসে রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়াজ-নসীহত ও বক্তৃতা–ভাষণ শুনতেন।[১৪] একবার তিনি দাবী করে বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) রাত্রিকালীন নামায সম্পর্কে আমি অধিকাংশ সাহাবীদের থেকে বেশী জানি।[১৫] শবে কদরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জেগে নামায পড়তেন।[১৬]

হিজরী ১১ সনের রাবী'উল আওয়াল মাসে রাসূলে কারীম (সা) ইনতিকাল করেন। তখন নু'মানের বয়স মাত্র আট বছর সাত মাস। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার সময়ে নু'মানের বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা দেখা যায় না। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী নায়িলা (রা) স্বামীর রক্তমাখা জামাসহ নু'মানকে (রা) শামে পাঠান।[১৭] এ ঘটনার পর থেকে তাঁকে তৎকালীন ইতিহাসের অন্যতম এক চরিত্র হিসেবে দেখা যায়।

আলীর (রা) খিলাফতকালে মু'য়াবিয়ার (রা) সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। এই বিরোধে তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন। এটা অবাক হওয়ার মত ব্যাপার যে, গোটা আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গুটিকয়েক লোক তখন মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষ নেন, তিনি তাঁদের একজন। বিভিন্ন গ্রন্থে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, আমীর মু'য়াবিয়া (রা) ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইবনুল আসীর বলেছেন ঃ 'তাঁর ভালোবাসা ছিল মু'য়াবিয়ার প্রতি। এ কারণে মু'য়াবিয়া ও তাঁর ছেলে ইয়াযীদের প্রতি তাঁর টান ছিল।[১৮] বিনিময়ে মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে বড় বড় পদ দান করেন। 'আলীর (রা) পক্ষ থেকে 'আয়নুত তামার'-এর শাসক ছিলেন মালিক ইবন কা'ব আল-আবহাবী। আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নির্দেশে নু'মান (রা) তথাকার অস্ত্র গুদামে আক্রমণ চালান।[১৯]

নু'মান সিফ্ফীন যুদ্ধে মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষে যোগদান করেন।[২০] ফুদালা ইবন 'উবাইদের পরে হিঃ ৫৩ সনে মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে দিমাশকের কাজী নিয়োগ করেন।[২১] ইয়ামন মু'য়াবিয়ার (রা) অধীনে এলে 'উসমান ইবন আস্ সাকাফীর পরে তিনি নু'মানকে (রা) তথাকার ওয়ালী নিয়োগ করেন। এ হিসাবে উমাইয়্যা রাজ বংশের পক্ষ থেকে তিনি ছিলেন ইয়ামনের তৃতীয় ওয়ালী।[২২]

হিজরী ৫৯ সনে মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে কূফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। প্রায় সাত মাস এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মু'য়াবিয়া (রা) ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র ইয়াযীদ খলীফার পদে আসীন হন। তিনি ইমাম হুসাইন (রা), আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে (রা) তাঁর আনুগত্যের জন্য চাপ দিলেন। ইমাম হুসাইন (রা) ইয়াযীদের আনুগত্য মেনে নিতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানালেন। একদিকে কূফা থেকে 'আলীর (রা) অনুসারীদের চিঠি ইমাম হুসাইনের (রা) নিকট পৌঁছতে লাগলো। এ সকল চিঠিতে তারা ইমাম হুসাইনকে (রা) খলীফা হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছিল। এ কারণে ইমাম হুসাইন (রা) অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মুসলিম ইবন আকীলকে কূফায় পাঠালেন। মুসলিম কূফায় পৌঁছলে শহরের অধিকাংশ অধিবাসী ইমামের প্রতি আস্থার ঘোষণা দিল। প্রায় বারো হাজার মানুষ মুসলিমের হাতে বাই'য়াত গ্রহণ করে। নু'মান (রা) তখন কূফার ওয়ালী। সব খবরই তিনি পাচ্ছিলেন; কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করলেন।

কিন্তু যখন মুখতার ইবন 'উবাইদের গৃহে 'আলীর (রা) অনুসারীদের বৈঠক হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো যে, ইয়াযীদের প্রতি কৃত বা'ইয়াত (আনুগত্যের শপথ) ভঙ্গ করা হবে তখন নু'মান (রা) কূফার মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দান করেন। ভাষণটির সারকথা নিম্নরূপ ঃ

'ওহে জনমণ্ডলী! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। অশান্তি ও মতভেদ সৃষ্টির ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। কারণ, তাতে প্রাণহানি ঘটে, রক্তপাত হয় এবং সম্পদ লুটপাট হয়। কেউ আগ বাড়িয়ে আমার সাথে সংঘাতে লিপ্ত না হলে আমি তার সাথে সংঘাতে জড়াবো না। কোন খারাপ কথা বলবো না, গালিগালাজ করবো না। কারো চরিত্রে

অপবাদ দান অথবা খারাপ ধারণা পোষণের কারণে কাউকে পাকড়াও করবো না। কিন্তু আপনারা যদি বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) ভঙ্গ করে প্রকাশ্যে আমার ও ইমামের বিরুদ্ধাচরণে নামেন, তাহলে সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যতক্ষণ তরবারির হাতল আমার হাতের মুঠোয় থাকবে, আমি আপনাদের মারতে থাকবো। এতে একটি লোকও যদি আমার পাশে না থাকে, তবুও আমি বিরত হবো না। তবে আমি আশা করি, আপনাদের মধ্যে বাতিলের অনুসারীদের অপেক্ষা সত্যকে জানে এমন লোকের সংখ্যাই অধিক হবে।”

উক্ত সমাবেশে বনী উমাইয়্যার নিষ্ঠাবান সমর্থক ও বন্ধু আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম উপস্থিত ছিলেন। শত্রুর প্রতি সরকারের ওয়ালীর এমন দুর্বল অবস্থান দেখে তিনি মর্মাহত হন। ক্ষোভের সাথে তিনি নু'মানকে বলেন ঃ 'এ ব্যাপারে আপনার অবস্থান অতি দুর্বল। এখন কোমল হওয়ার সময় নয়; শত্রুর বিরুদ্ধে এখন আপনার কঠোর হওয়া উচিত।' জবাবে নু'মান বললেন ঃ

'আমি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে শক্ত হওয়ার চেয়ে তাঁর আনুগত্যে দুর্বল থাকা বেশী পসন্দ করি। আর আল্লাহ যে পর্দাটি টেনে দিয়েছেন তা আমি ছিন্ন করা সমীচীন মনে করিনা।' আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম সমাবেশ থেকে ফিরে ইয়াযীদকে লিখলেন ঃ 'মুসলিম ইবন আকীল কূফার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে। যদি আপনার এখানকার শাসন কর্তৃত্বের প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনার আদেশ-নিষেধ কার্যকর করতে সক্ষম হবেন। নু'মান একজন ভীরু লোক, অথবা তিনি ইচ্ছা করেই ভীরু ও দুর্বল সেজেছেন।' ঠিক একই সময় একই রকম চিঠি ইয়াযীদকে লেখেন আম্মারা ইবন 'উকবা ও 'উমার ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস। এ সকল চিঠি পাওয়ার পর ইয়াযীদ কূফার ওয়ালীর পদ থেকে নু'মান ইবন বাশীরকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে 'উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকে নিয়োগ করেন। আর নু'মান চলে যান শামে।[২৩] এটা হিজরী ৬০ (ষাট) সনের ঘটনা।[২৪]

অতঃপর ইয়াযীদ তাঁকে হিম্স-এর ওয়ালী নিয়োগ করেন এবং ইয়াযীদের মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে কূফা থেকে সরিয়ে হিম্স-এ নিয়োগ করেন।[২৫]

হিজরী ৬৪ সনে ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়ার মৃত্যুর পর নু'মান শামের অধিবাসীদেরকে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) প্রতি আনুগত্যের আহবান জানান এবং তাঁর পক্ষ থেকে তিনি হিম্স-এর ওয়ালী নিযুক্ত হন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে প্রথমে তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে নিজেই খিলাফতের দাবীদার হিসেবে মানুষের বাই'য়াত গ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ, যদি এমন ঘটনা আদৌ ঘটতো তাহলে ইতিহাস ও সীরাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে তা বর্ণিত হতো। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।

নু'মানের (রা) মত আরো অনেকে শামে ইবন যুবাইরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ অবস্থা দেখে মারওয়ান শামে যান এবং একটি বাহিনী প্রস্তুত করে দাহ্হাক ইবন কায়সের বিরুদ্ধে পাঠান। দাহ্হাক ছিলেন ইবন যুবাইরের পক্ষ থেকে শামের কয়েকটি অঞ্চলের শাসক। নু'মান এ সংবাদ পেয়ে শুরাহবীল ইবন জুল-কিলাবার নেতৃত্বে কিছু সৈন্য দাহ্হাকের সাহায্যে পাঠান। 'মারজে রাহিত' নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং দাহ্হাক পরাজিত ও নিহত হন। এ সংবাদ পেয়ে নু'মান রাতের অন্ধকারে হিম্স থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করেন। মারওয়ান তাঁকে ধাওয়া করে ধরার জন্য খালিদ ইবন 'আদী আল-কিলা'ঈর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান।

হিম্স-এর অদূরে 'বীরীন' নামক এক পল্লীতে তিনি খালিদের মুখোমুখি হন। খালিদ তাঁকে হত্যা করে মাথাটি কেটে এবং পরিবার-পরিজনকে বন্দী করে মারওয়ানের সামনে হাজির করে। নু'মানের স্ত্রী তাঁর স্বামীর এমন নির্মম পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি স্বামীর ছিন্ন মস্তকটি তাঁর কোলে দেওয়ার জন্য মারওয়ানের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন ঃ এ মস্তকের হকদার আমি। আমাকেই দেওয়া হোক।

মারওয়ানের নির্দেশে লোকেরা নু'মানের (রা) মাথাটি তাঁর স্ত্রীর কোলে ছুড়ে মারে। এটা হিজরী-৬৫ সনের প্রথম দিকের, মতান্তরে ৬৪ সনের শেষ দিকের ঘটনা। তখন নু'মানের (রা) বয়স ছিল ৬৪ বছর।[২৬] ইবন হাযাম বলেন ঃ মারওয়ান নু'মানকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতায় আরোহনকে উদ্বোধন করেন।

'আব্বাসী আমলের প্রখ্যাত কবি আবুল 'আলা আল-মা'য়াররীর জন্মস্থান 'মায়'য়াররাতুন নু'মান'। স্থানটির পূর্ব নাম ছিল শুধু 'মা'য়াররা'। নু'মান একবার সেখানে ভ্রমণে যান। তখন তাঁর একটি ছেলে মারা যায় এবং তাকে সেখানে দাফন করা হয়। সেখান থেকে স্থানটি আন-নু'মানের প্রতি আরোপ করে 'মা'য়ারাতুন নু'মান' হিসাবে প্রসিদ্ধি পায়।[২৭]

নু'মানের (রা) স্ত্রী ছিলেন আরবের 'কাল্ব' গোত্রের মেয়ে। তাঁর সম্পর্কে একটি আজব কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এক সময় মু'য়াবিয়ার (রা) অন্দর মহলে ছিলেন। মু'য়াবিয়া একদিন ইয়াযীদের মা মাবসূনকে বললেন, তুমি যেয়ে একবার এই মহিলাকে দেখে এসো তো। মাব্সূন তাঁকে দেখে এসে বললেন, রূপ ও সৌন্দর্য্যে এ মহিলা অনন্যা। কিন্তু তাঁর নাভীর নীচে একটি তিল আছে। এ কারণে সে তার স্বামীর ছিন্ন মস্তক নিজের কোলে ধারণ করবে।

এই মহিলাকে প্রথমে হাবীব ইবন মাসলামা বিয়ে করেন। তাঁর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে নু'মান তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি নিহত হলে স্ত্রী হিসাবে তাঁর কর্তিত মাথা কোলে ধারণ করেন। এভাবে মাবসূনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়।[২৮]

নু'মানের (রা) সন্তানদের মধ্যে তিনটি ছেলে মুহাম্মাদ, বাশীর ও ইয়াযীদ খ্যাতিমান হন। বহুদিন যাবত মদীনা ও বাগদাদে তাঁর বংশধারা বিদ্যমান ছিল।[২৯]

হাদীস ও ফিকাহ্-তে নু'মানের (রা) গভীর জ্ঞান ছিল। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ও

অন্যান্য ব্যস্ততার দরুন যদিও তিনি জ্ঞান বিতরণের মহান দায়িত্ব পালন করতে পারেননি, তবে তিনি যেখানেই শাসকের দায়িত্ব নিয়ে গেছেন, সেই স্থানটি ফিকাহ ও হাদীস চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাঁর সামনে অসংখ্য মামলা আসতো, তিনি স্বীয় জ্ঞান ও মেধা দ্বারা তা ফয়সালা করতেন।

রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের সময় যদিও তিনি আট বছরের বালক মাত্র, তবুও অনেক হাদীস তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) ও 'উমারের (রা) সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তাঁদের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাছাড়া তাঁর মামা আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) নিকট থেকেও বহু হাদীস শুনেছেন।[৩৩]

হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দারুণ সর্তক ও রক্ষণশীল। তা সত্ত্বেও তাঁর সনদে মোট ১২৪ (একশত চব্বিশ)টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তারমধ্যে পাঁচটি হাদীস বুখারী ও মুসলিম মুত্তাফাক আলাইহি এবং বুখারী অন্য একটি ও মুসলিম অন্য চারটি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩১] তিনি বিচার-ফায়সালার সময় হাদীসের উদ্ধৃতি দিতেন। একবার একটি মামলার বিচারের সময় বললেন, আমি এ মামলার ফায়সালা এমনভাবে করবো যেমন ফায়সালা করেছিলেন রাসূল (সা) এক ব্যক্তির মামলার।[৩২]

তিনি শরী'য়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন। অধিকাংশ সময় এ জবাব দিতেন খুতবা বা বক্তৃতা-ভাষণের মধ্যে। তাঁর খুতবা বা ভাষণ হতো দুই প্রকার ঃ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী ব্যক্তি। তাঁর ভাষণ হতো অতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায়। বাচন ও প্রকাশ ভঙ্গিতে তাঁর যে নৈপুণ্য ছিল তার স্বীকৃতি দিয়েছেন সিমাক ইবন হারব এভাবে ঃ 'আমি যে সকল মানুষের ভাষণ শুনেছি, তাঁদের মধ্যে নু'মান ইবন বাশীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলে মনে হয়েছে।'[৩৩]

খুতবার মধ্যে স্থান-কাল অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতেন। যেমন, একবার তিনি খুতবার মধ্যে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি। 'শুনেছি' বলার সাথে সাথে আঙ্গুল দিয়ে দুই কানের দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৩৪] একবার ভাষণে তিনি রাসূলুল্লাহর (রা) অবস্থা বর্ণনা করেন এভাবে ঃ 'ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নিম্নমানের খোরমাও রাসূলুল্লাহর (রা) জুটতো না। আর এখন নানা জাতের উৎকৃষ্ট খোরমা ও মাখন ছাড়া তোমাদের রুচি হয় না।'[৩৫]

একবার তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। ভাষণে জামা'য়াতবদ্ধ জীবনকে আল্লাহর রহমত এবং বিচ্ছিন্নতাকে আল্লাহর আযাব ও অভিশাপ হিসেবে চিত্রিত করলেন। সমাবেশে প্রখ্যাত ইমাম আল-বাহিলীও উপস্থিত ছিলেন। ভাষণ শেষে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমাদের ওপর 'আস্-সাওয়াদ আল-আ'জাম'-এর অনুসরণ ফরজ।[৩৬]

বক্তৃতা-ভাষণের সময় তাঁর মুখ থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হলো ঃ শা'বী, হুমাইদ ইবন

'আবদির রহমান, খায়সামা ইবন' আবদির রহমান, সালেম ইবন আবিল জু'দ, আবু ইসহাক সুবাঈ', আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর, ইয়াসী' আল-কিন্দী, হাবীব ইবন সালেম (নু'মানের সেক্রেটারী), আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু কিলাবা আল-জুরমী, আবু সালাম আল-আসওয়াদ, গায়রায আবী সুফরাহ, আযহার ইবন 'আবদিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন নু'মান, আবু সাল্লাম মামতূর প্রমুখ।[৩৭]

নু'মান (রা) ছিলেন একজন সাহিত্য ও কাব্যরসিক মানুষ। গদ্য সাহিত্যে যেমন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়, তেমনিভাবে কাব্য সাহিত্যেও তাঁর পদচারণা দেখা যায়। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। সীরাতের গ্রন্থসমূহে কিছু কবিতা তাঁর নামে সংকলিত হয়েছে। আল-কুরতুবী 'আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থে তাঁর কিছু শ্লোক সংকলন করেছেন। তাঁর কবিতার একটি দিওয়ানও আছে।[৩৮]

নু'মান (রা) বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-হাঙ্গামা, নানা ধরনের ওলট-পালট ও বিপ্লবের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও যুলুম-অত্যাচার একেবারেই পসন্দ করতেন না। তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং কোমল মনের মানুষ ছিলেন। ঝগড়া-বিবাদে কঠোরতা ও শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে মমতা ও ভালোবাসা দ্বারা মানুষের মন জয় করতেন। ঐতিহাসিক তাবারী বলেছেন ঃ 'তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ধৈর্যশীল এবং 'আবেদ ব্যক্তি। যিনি মানুষকে ক্ষমা করতে ভালোবাসতেন।'

মুসলিম ইবন 'আকীলের ঘটনা এবং এ সম্পর্কে নু'মানের (রা) ভাষণ, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে তাঁর সহনশীল ও উদার নীতির রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একবার তিনি কায়স ইবন আল-হায়সামকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ 'তুমি একজন দারুণ হতভাগ্য ব্যক্তি। আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছি এবং তাঁর হাদীস (বাণী) শুনেছি। আর তোমরা না তাঁকে দেখেছো, না তাঁর মুখ থেকে হাদীস শুনেছো। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ধারাবাহিক ফেতনা-ফাসাদ দেখা দেবে। তখন মানুষ সকালে মুসলমান হলে সন্ধ্যা হতে না হতে আবার কাফির হয়ে যাবে। মানুষ সামান্য পার্থিব সুযোগ-সুবিধার লোভে নিজের দ্বীন বিক্রি করবে।[৩৯] তবে তাঁর এ কোমল ও নম্র স্বভাব ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে ছিল না। তিনি যেমন ধৈর্য ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য, তেমনি ছিলেন বীরত্ব ও সাহসিকতায় অতুলনীয়।

তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের দানশীল ব্যক্তি। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি যখন হিম্স-এর ওয়ালী তখন একবার কবি আল-আ'শা আল-হামাদানী তাঁর নিকট এসে বললেন, আমি ইয়াযীদের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছি, কিন্তু তিনি কোন সাড়া দিলেন না। এখন এসেছি আপনার কাছে। আত্মীয়তার হক কিছু আদায় করুন। আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করুন। নু'মানের (রা) হাতে তখন কোন অর্থ ছিল না। তিনি শপথ করে বললেন, আমার কাছে কিছুই নেই। তারপর কিছু চিন্তা করে বললেন ঃ 'হুঁ!' এরপর মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত প্রায় বিশ হাজার

লোকের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। যার সারকথা নিম্নরূপ ঃ[৪০]

ওহে জনমণ্ডলী! আল-আ'শা আল-হামাদীনী আপনাদের এক চাচার ছেলে। অভিজাত বংশের একজন মুসলিম। তার কিছু অর্থের প্রয়োজন। আর এ উদ্দেশ্যেই সে আপনাদের নিকট এসেছে। এখন আপনাদের ইচ্ছা কি? জনতা সমস্বরে বলে উঠলো ঃ আপনি যা বলবেন আমরা তা শুনবো। তিনি বললেন ঃ আমার কোন নির্দেশ নেই। জনতা বললো ঃ তাহলে আমরা এখানে উপস্থিত প্রত্যেকে এক দীনার করে দান করবো। তিনি বললেন ঃ না। দুইজনে এক দীনার করে দিন। সকলে সম্মত হলে তিনি বললেন ঃ আমি বাইতুলমাল থেকে তাঁকে এ অর্থ দিয়ে দিচ্ছি। যখন বেতন/ভাতার অর্থ আসবে তখন সকলের কাছ থেকে উসূল করা হবে। নু'মান (রা) এভাবে ঋণগ্রস্ত আল-আ'শাকে দশ হাজার দীনার দানের ব্যবস্থা করেন। এটা আল-ইসতীয়াব গ্রন্থকারের বর্ণনা। উসুদুল গাবা গ্রন্থকার ইবনুল আসীর বলেন, চল্লিশ হাজার। কবি আল-আ'শা আল-হামাদানী এ জন্য নু'মানের (রা) প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। নু'মানের (রা) প্রশংসায় তিনি একটি কবিতাও রচনা করেছেন। কবিতাটির কয়েকটি শ্লোকের অর্থ নিম্নরূপ ঃ[৪১]

১. প্রয়োজনের সময় দানশীল নু'মান ইবন বাশীরের মত আর কাউকে পাইনি।
২. তিনি যখন কোন কথা বলেন তখন সে কথা পূর্ণ করেন। তিনি সেই ব্যক্তির মত নন যে জনগণের প্রতি ধোঁকাবাজির রশি ঝুলিয়ে দেয়।
৩. যদি তিনি একজন আনসারী না হতেন তাহলে আমি সেই ব্যক্তির মত হতাম, যে কোথাও যেয়ে কিছু না পেয়েই ফিরে আসে।
৪. আমি যখন নু'মানের অকৃতজ্ঞ হবো তখন আমার মধ্য থেকে কৃতজ্ঞতার স্বভাব বিলীন হয়ে যাবে। আর অকৃতজ্ঞ মানুষের মধ্যে ভালো কিছু থাকে না।

শৈশবে নু'মান (রা) যেহেতু রাসূলে কারীমের (সা) অতি সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, এ কারণে তাঁর খুঁটিনাটি অনেক আচার-আচরণের বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে তাঁর এ ধরনের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) রাতের ইবাদাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দুইখানি পা ফুলে যেত।[৪২] তেমনিভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) কিভাবে নামাযের কাতার সোজা করতেন এবং কাতার সোজা করার প্রতি কতখানি গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূল (সা) দেখেন এক ব্যক্তির বুক কাতারের বাইরে চলে গেছে। তখন তিনি বলেন ঃ ওহে আল্লাহর বান্দারা! হয় তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন।[৪৩]

'উম্মুল মুমিনীন আ'য়িশা (রা) ছিলেন আবু বকর সিদ্দীকের (রা) কন্যা। নু'মান (রা) বলেন ঃ একদিন আবু বকর গেলেন মেয়ে-জামাই-এর সাথে দেখা করতে। ভিতরে

ঢোকার অনুমতি চেয়ে শুনতে পেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কথার উপরে মেয়ে আ'য়িশার চড়া গলার কথা। তিনি ঢুকেই রাসূলুল্লাহর (সা) কথার উপরে কথা বলছো— এই বলে মেয়েকে থাপ্পড় মারতে উদ্যত হলেন। রাসূল (সা) দ্রুত মাঝখানে দাঁড়িয়ে আ'য়িশাকে মার থেকে বাঁচালেন। আবু বকর রাগান্বিত অবস্থায় মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন রাসূল (সা) আ'য়িশাকে বললেন ঃ দেখলে তো, তোমাকে আমি মার থেকে বাঁচালাম? কিছুদিন পর আবু বকর আবার মেয়ে-জামাইর বাড়ী গেলেন। দেখলেন, তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিক। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের শান্তির সময় তোমরা আমাকে প্রবেশের অনুমতি দাও, আবার যুদ্ধের সময়ও অনুমতি দিয়ে থাক। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ আমরা এই করেছি, আমরা এই করেছি।[৪৪]

একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এই মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, সে বেশীরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না। যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করাই হচ্ছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আর স্বীকার না করা হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা।

এভাবে আল্লাহর রাসূলের (সা) জীবনের নানা দিক তাঁর বিভিন্ন বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

নু'মান (রা) ইতিহাসের এক বিভ্রান্তির অধ্যায়ে মু'য়াবিয়া (রা) ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদের পক্ষ অবলম্বন করলেও কোথাও কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেছেন, এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সত্যের ওপর যে তিনি অটল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবদুল্লাহ ইবন জুবাইরের (রা) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে জীবন দানের মধ্যে। কূফার মসনদ ত্যাগ করেছেন তবুও ইমাম হুসাইনের প্রতিনিধি মুসলিম ইবন 'আকীলের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়াতে রাজী হননি। রাসূলে কারীমের (সা) সাহচর্যের কল্যাণে এমন উন্নত নৈতিকতার অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-আ'লাম-৯/৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/৪১১
২. আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৮
৪. আল-ইসাবা-১/১৫৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৪১০
৫. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪, ৫৮০; আল-ইসাবা-১/১৫৮; তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১২৯
৬. তাবাকাত-৬/৫৩; আল-ইসতীয়াব-৩/৫৫১
৭. তাবাকাত-৬/৫৩
৮. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪, ২৭২
৯. আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-৩/৪১২
১১. প্রাগুক্ত-৩/৪১০

১২. মুসনাদ-৪/২৪৮; আল-ইসাবা-১/১৫৮, সহীহ মুসলিমেও ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।
১৩. আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫২
১৪. মুসনাদ-৪/৭১, ২৬৯
১৫. প্রাগুক্ত-৪/২৭০
১৬. প্রাগুক্ত-৪/২৭২
১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-৪/৯
১৮. উসুদুল গাবা-৫/২৩
১৮. ইয়া'কূবী তারীখ-২/২২৫
২০. আল-আ'লাম-৪/৯
২১. তারীখুল কুজাত-৩/২০১; আল-ইসাবা-৩/৫৫৯ ইয়াকূবী-২/২২৮
২২. ইয়া'কূবী- ২/২৭৮
২৩. তাবারী-৭/৩৮, ৩৯, ২২৮
২৪. আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
২৫. আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫২; আল-আ'লাম-৯/৪; আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
২৬. তাবাকাত-৬/৫৩; আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫৪; সিয়ারু আ'লাম, আন-নু'বালা-৩/৪১২; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪
২৭. আল-আ'লাম; টীকা-৯/৪; মু'জামুল বুলদান-৫/১৫৬
২৮. ইয়া'কূবী-২/৩০৫; আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫৫
২৯. আল-আ'লাম-৯/৪
৩০. আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-৩/৪১১; তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১২৯
৩২. মুসনাদ- ৪/২৭২
৩৩. তাবাকাত-৬/৫৪; আল-ইসাবা-৩/৫৫৯; তাহজীবুত তাহজীব-১০/৪৪৮
৩৪. মুসনাদ-৪/২৬৯
৩৫. প্রাগুক্ত-৪/২৬৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৩০৪
৩৬. মুসনাদ-৪/১৭৮
৩৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-৩/৪১২; আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
৩৮. আল-আ'লাম-৯/৪
৩৯. মুসনাদ-৪/২৭৭
৪০. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা- ৩/৪১২; আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫২
৪১. আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫৩
৪২. হায়াতুস সাহাবা-৩/৯
৪৩. প্রাগুক্ত-৩/১২৪-১২৫
৪৪. প্রাগুক্ত-২/৫৭২।

সামুরা ইবন জুনদুব আল ফাযারী (রা)

সামুরা আল ফাযারীর (রা) অনেকগুলি কুনিয়াত বা ডাকনাম সীরাতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। যথা: আবূ সাঈদ, আবূ আবদির রহমান, আবূ আবদিল্লাহ, আবূ সুলায়মান ও আবূ মুহাম্মদ।[১] তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবী। ইতিহাসে তিনি একজন সাহসী নেতা হিসাবে প্রসিদ্ধ।[২] ইমাম জাহাবী বলেন: তিনি ছিলেন আলিম (জ্ঞানী) সাহাবীদের একজন।[৩]

সামুরা (রা) মদীনার আনসার সম্প্রদায়ের সন্তান নন। মূলত তিনি বনু ফাযারার সন্তান। ইবন ইসহাক বলেন ঃ তিনি মদীনার আনসারদের একজন হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ বন্ধু ছিলেন।[৪] তাঁর পিতা জুনদুব ইবন হিলাল আল ফাযারী ছিলেন বসরার অধিবাসী। সামুরা বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সেই সামুরা পিতৃহারা হন। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মদীনায় আসেন এবং আনসারদের কাউকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে শর্ত দেন, যে তাঁকে বিয়ে করবেন, সন্তান সামুরাসহ তাঁর সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণে রাজী থাকতে হবে। মুররী ইবন শায়বান ইবন সা'লাবা তাঁর এ শর্ত মেনে নিয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। সামুরা (রা) তাঁর এই সৎ পিতা মুররী ইবন শায়বানের তত্ত্বাবধান ও স্নেহছায়ায় বেড়ে ওঠেন।[৫]

সামুরা (রা) হিজরাতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। যুদ্ধে যাওয়ার বয়স না হওয়ায় তিনি হিজরী দ্বিতীয় সনের বদর যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি পাননি। উহুদ যুদ্ধের সময় আরো কিছু আনসার কিশোরের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার আশায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হন। রাসূল (সা) সামুরার একজন সাথীকে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে ফিরিয়ে দেন। তখন সামুরা বলেন ঃ আপনি তাকে নির্বাচন করলেন এবং আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। অথচ আমি তার চেয়েও শক্তিশালী। বিশ্বাস না হলে আমাদের কুস্তি লাগিয়ে দেখতে পারেন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) তাঁদের দুজনের কুস্তি লাগার নির্দেশ দেন। কুস্তিতে সামুরা তাঁর প্রতিপক্ষ কিশোরকে উঁচু করে ফেলে দেন। তাই দেখে রাসূল (সা) তাঁকেও রণক্ষেত্রে যাওয়ার অনুমতি দান করেন।[৬] ইবন হিশাম বলেন ঃ রাসূল (সা) সামুরা ইবন জুনদুব ও রাফে' ইবন খাদীজকে উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন তাঁদের দুইজনেরই বয়স পনেরো বছর।[৭] উহুদের পর থেকে সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূলে করীমের (সা) জীবনকালে তিনি মদীনায় বসবাস করেন। পরে তিনি বসরায় বসতি স্থাপন করে।[৮] হিজরী ৫০ সনে কূফার ওয়ালী মুগীরা ইবন শু'বার (রা) মৃত্যুর পর মু'য়াবিয়া (রা) কূফার সাথে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে বসরার ইমারাতের দায়িত্বও যিয়াদ ইবন সুমাইয়্যার ওপর অর্পণ করেন। যিয়াদ সামুরাকে (রা) স্বীয় প্রতিনিধি ও সহকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। যিয়াদ ছয় মাস করে বসরা ও কূফায় অবস্থান

করতেন। সামুরাও উভয় স্থানে তাঁর অনুপস্থিতির সময় দায়িত্ব পালন করতেন। যিয়াদ বসরায় থাকলে তিনি কূফায় এবং তিনি কূফায় থাকলে সামুরা বসরায়–এভাবে।[৯]

যিয়াদের শাসনকাল নানা দিক দিয়ে স্মরণযোগ্য। তাঁর সময়ে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি এত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো যে, কোনপ্রকার বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ তাঁর সময়ে বসরা ও কূফায় দেখা দিতে পারেনি। খারেজী বিপ্লবপন্থীদের একটি দল, যারা পূর্ব থেকেই সেখানে বিদ্যমান ছিল, একবার মাথা উঁচু করলে ভালোমত তাদের দমন করা হয়।

চতুর্থ খলীফা আলীর (রা) জীবদ্দশায় খারেজীদের উদ্ভব হয়। এক সময় তারা আলীরই (রা) অনুসারী ছিল। পরে তারা অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী দল হিসাবে নিজেদেরকে পরিচিত করে তোলে। 'নাহরাওয়ান'–এর যুদ্ধে তারা আলীর (রা) বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় এবং তাদের অনেক সাহসী যোদ্ধা মারা যায়। তবে তাদেরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। সুযোগ পেলেই তারা মাথা উঁচু করে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করতো। এই উগ্রপন্থীদের হাতে বহু সাহাবীসহ অসংখ্য নিরপরাধ মুসলমানের রক্ত ঝরেছে। খলীফা আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন এই পথভ্রষ্ট চরমপন্থীদের হাতে।[১০] বসরা ও কূফা ছিল তাদের মূল কেন্দ্র। যিয়াদ তাদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত সামুরার (রা) সিদ্ধান্তের সাথে মিলে যায়।[১১] ইবন হাজার বলেন ঃ সামুরা ছিলেন খারেজীদের প্রতি ভীষণ কঠোর।[১২] ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়, যিয়াদ ও তাঁর ছেলে 'উবায়দুল্লাহ বসরায় প্রায় সত্তর হাজার লোক হত্যা করেন। আর এর সাথে সামুরাও জড়িত ছিলেন।[১৩] ইমাম জাহাবী বলেছেন ঃ সামুরা (রা) বহু মানুষ হত্যা করেছেন।[১৪]

আমের ইবন আবী 'আমের বলেন ঃ আমরা ইউনুস ইবন হাবীবের মজলিসে বসা ছিলাম। উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ এই যমীন যে পরিমাণ রক্ত চুষেছে পৃথিবীর আর কোন ভূ-খণ্ড তেমন চোষেনি। এখানে সত্তর হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আমি ইউনুসকে কথাটি হত্যা কিনা তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ হাঁ। প্রশ্ন করা হলোঃ এ কাজ কারা করেছে? বললেন ঃ যিয়াদ, তাঁর ছেলে উবায়দুল্লাহ ও সামুরা।[১৫] ইমাম আল কুরতুবী বলেন ঃ "সামুরার নিকট কোন খারেজীকে আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করতেন এবং বলতেন ঃ আকাশের নীচে এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম নিহত ব্যক্তি। কারণ, তারা মুসলমানদের কাফির বলে এবং মানুষের রক্ত ঝরায়"।[১৬]

সামুরার এমন কঠোরতার কারণে খারেজীরা ছিল তাঁর প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ। তারা সামুরাকে খারাপ জানতো। তাঁর এরূপ আচরণের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাতো। পক্ষান্তরে বসরার তৎকালীন জ্ঞানী-গুনীরা যাঁদের মধ্যে ইবন সীরীন ও হযরত হাসান আল বসরীর মত খ্যাতিমান লোকও আছেন, তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁরা সামুরার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতেন।[১৭]

ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত এ সকল তথ্য দেখে আজ আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, সামুরার (রা) মত একজন সাহাবীর হাত মানুষের রক্তে রঞ্জিত

হতে পারে কিভাবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ইতিহাসের সকল তথ্য হাদীসের মত সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। হতে পারে তৎকালীন গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। এমন নজীর ইতিহাসে বিরল নয়।

তাছাড়া ইতিহাসের এ অধ্যায়টি বুঝার জন্য খারেজীদের উদ্ভব, বিকাশ, তাদের দর্শন, সর্বোপরি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তাদের নির্মম আচরণ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা থাকা দরকার। তারা একটি চরমপন্থী ভ্রান্ত দল হিসেবে চিহ্নিত। ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে তাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ। নির্বিচারে তারা হত্যা করেছে বিরুদ্ধবাদীদের। রাসূলুল্লাহর (সা) বিপুলসংখ্যক সাহাবী তাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। সামুরার (রা) মন্তব্যেও এই সত্য ফুটে উঠেছে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একজন শাসক হিসেবে তাদের প্রতি নির্মম হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আর এ কারণে, ইবন সীরীন ও হযরত হাসান আল বসরীর মত শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, রাসূলুল্লাহর (সা) একজন মহান সাহাবী অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত ঝরাতে পারেন না।

হিজরী ৫৩ সনে যিয়াদের মৃত্যু হলে রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হয়। বসরা এবং কূফা দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে এবং দুই প্রদেশে দুইজন ওয়ালী নিয়োগ লাভ করেন। সামুরা বসরার ওয়ালী হন এবং প্রায় একবছর এ পদে বহাল থাকেন।[১৮] হিজরী ৫৪ সনে আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নির্দেশে এ পদ থেকে তিনি অপসারিত হন।

সামুরা ইবন জুনদুবের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে মত পার্থক্য আছে। হিজরী ৫৮, ৫৯ ও ৬০ সনের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৯] ইবনু ইমাদ আল হাম্বলী হিজরী ৬০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[২০] তিনি বসরা না কূফায় মারা যান, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে।[২১] কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বসরার ওয়ালী ছিলেন এবং কূফায় মারা যান। আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কূফায় মৃত্যুবরণকারী রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বশেষ সাহাবী।[২২]

সামুরার (রা) মৃত্যু হয় অস্বাভাবিক ভাবে। শেষ জীবনে তিনি ভীষণ ঠাণ্ডা অনুভব করতেন। চিকিৎসা স্বরূপ দীর্ঘদিন গরম পানিতে বসে শরীর গরম করতেন। অবশেষে এটা কালব্যাধিতে রূপ নেয়। একদিন ভীষণ ঠাণ্ডা অনুভব করতে থাকেন। তাঁর চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হলো; কিন্তু কোন কাজ হলো না। তিনি বললেন, আমার পেটে যে কি অবস্থা হচ্ছে, তা বুঝাবো কি করে। এমন এক অস্থিরতার মধ্যে হাঁড়ির গরম পানিতে বসতে গিয়ে টগবগ করে ফুটন্ত পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।[২৩] হিলাল ইবন উমাইয়া বলেন, তিনি সেঁক দিতে গিয়ে অসতর্ক অবস্থায় আগুনে পুড়ে মারা যান। যদি এ বর্ণনা সত্য হয় তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ ছিল দুনিয়ার আগুন। আখেরাতের আগুন নয়।[২৪] ইবন আবদিল বার বলেন, সামুরার এভাবে মৃত্যু হওয়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়।

হযরত সামুরার (রা) মৃত্যু সম্পর্কে রাসূলে কারীমের (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী 'রিজাল ও সীরাত' শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়। আনাস ইবন হাকীম আদ-দাব্বী বলেন, আমি মদীনায় ঘোরাফেরা করছিলাম। হঠাৎ আবূ হুরাইরার সাথে দেখা হলো। অন্য কোন কথা বলার আগেই তিনি সামুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি সামুরা বেঁচে থাকার খবর দিলে খুব খুশী হলেন। তারপর বললেন ঃ আমরা দশজন এক বাড়ীতে একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলাম। এক সময় তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সবার মুখের দিকে তীক্ষ্মভাবে তাকালেন। তারপর দরজার দুইটি বাজু ধরে বললেনঃ 'আখেরুকুম মাওতান ফিন্ নার।'– তোমাদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী আগুনে যাবে অথবা আগুনে পুড়ে মৃত্যু হবে। আমাদের সেই দশজনের আটজন মারা গেছে। বেঁচে আছি আমি ও সামুরা। এখন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের চেয়ে আর কোন কিছু প্রিয়তর আমার কাছে নেই।[২৫] কোন কোন বর্ণনায় দশজনের স্থলে তিনজনের কথা এসেছে। তারা হলেনঃ সামুরা, আবূ মাহজুরা ও আবূ হুরাইরা।[২৬]

উল্লেখিত দলটির মধ্য থেকে হযরত সামুরা যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেছেন, সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে আবূ মাহজুরা ও আবূ হুরাইরার (রা) মধ্যে কে আগে মারা গেছেন সে ব্যাপারে মত পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আবূ হুরাইরা (রা) আগে মারা গেছেন। বালাজুরী বলেন ঃ সামুরা বসরায় এবং আবূ মাহজুরা মক্কায় জীবিত ছিলেন। তাই হিজায থেকে কেউ বসরায় গেলে সামুরা জিজ্ঞেস করতেন আবূ মাহজুরা সম্পর্কে, আবার কেউ বসরা থেকে মক্কায় গেলে আবূ মাহজুরা জিজ্ঞেস করতেন সামুরা সম্পর্কে। এভাবে একদিন আবূ মাহজুরা মারা যান সামূরার আগে।[২৭]

আউস ইবন খালিদ বলেন ঃ আমি আবূ মাহজুরার কাছে গেলে তিনি সামূরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আবার সামুরার কাছে গেলে তিনি আবূ মাহজুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।[২৮] কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত আনাস ইবন হাকীমের বর্ণনা এবং তাউসের একটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আবূ হুরাইরার আগেই আবূ মাহজুরা মারা যান। যেমন তাউস বলেনঃ কেউ আবূ হুরাইরাকে ভয় দেখাতে চাইলে বলতোঃ সামুরা মারা গেছেন একথা শুনেই তিনি হঠাৎ চিৎকার দিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে যেতেন।[২৯]

সামুরার (রা) সন্তানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে সুলায়মান ও সা'দ নামে তাঁর যে দুই ছেলে ছিল, একথা জানা যায়। তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও অতি মর্যাদাবান সাহাবীদের একজন। রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় যদিও তিনি ছিলেন একজন তরুণ, তবুও রাসূলুল্লাহর (সা) অসংখ্য হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করেন। ইমাম আল-কুরতুবী বলেন ঃ তিনি ছিলেন বেশী পরিমাণে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনাকারী-হাদীসের হাফেজদের একজন।[৩০] 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের লিখিত একটি কপি তাঁর ছেলের কাছে ছিল।[৩১] ইবন সীরীন বলেন, এই পুস্তিকাটি ছিল জ্ঞানের ভাণ্ডার।[৩২]

সামুরা (রা) হাদীস স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ যা কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইতেন, পারতেন। রাসূলে করীম (সা) নামাযের মধ্যে দুইটি স্থানে চুপ থাকতেন। একটি 'তাকবীর তাহরীমার পরে যখন 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' পড়তেন। অন্যটি সূরা ফাতিহা পাঠের পর যখন 'আমীন' বলতেন। এ বিষয়টি সামুরার স্মরণ ছিল এবং তিনি তা আমলও করতেন। কিন্তু 'ইমরান ইবন হুসাইনের (রা) বিষয়টি মনে ছিলনা। একবার সামুরা (রা) নামাযে রাসূলুল্লাহর (সা) আমলের অনুসরণ করলে ইমরান (রা) প্রতিবাদ করলেন। বিষয়টি উল্লেখ করে সঠিক তথ্য জানার জন্য মদীনায় উবাই ইবন কা'বকে (রা) চিঠি লেখা হলো। জবাবে তিনি লিখলেন, সামুরা সত্য বলেছে। তাঁর ঠিকই স্মরণ আছে।[৩৩]

একবার ভাষণ দানকালে তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন। শ্রোতাদের মধ্যে সা'লাবা ইবন 'আব্বাদ আল-আবদী ছিলেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয়বার যখন সামুরা হাদীসটি বর্ণনা করেন, তখন শব্দের মধ্যে কোন তারতম্য দেখা গেলনা।[৩৪] প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনায় দারুণ সতর্ক ও রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে বহু কিছু শুনেছি। কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের প্রতি আমার আদব তার সব বর্ণনা থেকে আমাকে বিরত রাখে। তাঁরা আমার চেয়ে বয়সে বড়। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে আমি ছিলাম একজন তরুণ। তা সত্ত্বেও যা কিছু শুনতাম, স্মৃতিতে ধারণ করতাম।[৩৫]

কখনো কখনো তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তাতে কারো মনে কোনপ্রকার সন্দেহ দেখা দিলে তিনি জবাব দিয়ে তা দূর করতেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযার বর্ণনা শুনে প্রশ্ন করলো ঃ খাবার কি বেড়ে গিয়েছিল? তিনি বললেন ঃ বিস্ময়ের কি আছে? তবে আসমান ছাড়া আর কোথা থেকে এ বৃদ্ধি ঘটেছিল?[৩৬]

সামুরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ 'উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ থেকে শোনা হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর সনদে মোট ১২৩টি (একশত তেইশ) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলোঃ

'ইমরান ইবন হুসাইন, শা'বী, ইবন আবী লায়লা, 'আলী ইবন রাবী'য়া, 'আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদা, হাসান আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, মুতরিফ ইবন শুখাইর, আবুল 'আলা' আল- আতারাদী, কুদামা ইবন ওয়াবরা, যায়িদ ইবন 'উকবা, রাবী 'ইবন 'উমাইলা, হিলাল ইবন লিয়াফ, আবূ নাদরা আল-'আবদী, সা'লাবা ইবন আব্বাদ, আবূ কিলাবা আল-জারমী, সুলায়মান ইবন সামুরা।[৩৭]

সামুরার (রা) মধ্যে বহুবিধ চারিত্রিক সৌন্দর্য্য বিদ্যমান ছিল। মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেনঃ 'তিনি ছিলেন একজন পরম আমানতদার ও সত্যভাষী ব্যক্তি। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন।'[৩৮] রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ও সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।[৩৯]

আরবে 'আহনাফ' নামক এক ব্যক্তি বিশেষ একধরনের তরবারি তৈরী করেন, যা 'হানাফিয়্যা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটও একখানি এই তরবারি ছিল। সামুরা (রা) তার একটি নকল তৈরী করেন। তাঁর শাগরিদদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন সীরীনও তার নকল তৈরী করেন।[৪০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. উসুদুল গাবা–২/৩৫৪;তাহজীবুত তাহজীব–৪/২৩৬
২. আল–আ'লাম– ৩/২০৩
৩. সিয়ারু আ'লাম আন–নুবালা– ৩/১৮৩
৪. তাহজীবুত তাহজীব– ৪/২৩৬; আল–ইসাবা–২/৭৮
৫. আল–ইসতী'য়াব– ২/৭৯;আল-ইসাবা–২/৭৮; তাবাকাত–৬/৩৪
৬. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৬৬; আল–ইসাবা–২/৭৯; উসুদুল গাবা–২/৩৫৪
৭. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৬৬
৮. আল–আ'লাম–৩/২০৩
৯. আল–ইসতী'য়াব–২/৭৭; তাবাকাত–৬/৩৪; উসুদুল গাবা–২/৩৫৪
১০. তারিখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ–২/৮০
১১. তারীখু তাবারী–৭/৯১
১২. আল–ইসাবা–২/৭৯; তাহজীবুত তাহজীব–৪/২৩৬; আল–আ'লাম–৩/২০৪
১৩. সিয়ারু আ'লাম আন–নুবালা–৩/১৮৫; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯১
১৪. সিয়ারু আ'লাম আন–নুবালা–৩/১৮৩
১৫. প্রাগুক্ত–১৮৫; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯১
১৬. আল-ইসতী'য়াব–২/৭৭
১৭. আল-ইসাবা–২/৭৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৬; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯০
১৮. আনসাবুল আশরাফ–১/৪৯৬
১৯. উসুদুল গাবা–২/৫৫৫; তাহজীবুত তাহজীব–৪/২৩৭
২০. শাজারাতুজ জাহাব–১/৬৫
২১. আল-আ'লাম–৩/২০৪
২২. আনসাবুল আশরাফ–১/২৪৯
২৩. তাবাকাত–৬/৩৪; উসুদুল গাবা–২/৫৫৫
২৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৫
২৫. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৪
২৬. রাসূলুল্লাহর (সা) এই ভবিষ্যদ্বাণীটি দেখুন ঃ তাবাকাত–৬/২২; উসুদুল গাবা–২/৩৫৫; আল-ইসতী'য়াব–২/৫৮০; আল-ইসাবা–২/৭৯
২৭. আনসাবুল আশরাফ–১/৫২৭
২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৫; জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯১
২৯. প্রাগুক্ত
৩০. আল-ইসতী'য়াব–২/৭৮
৩১. তাহজীবুত তাহজীব–৪/১৯৮
৩২. আল-আ'লাম–৩/২০৪; আল-ইসাবা–২/৭৯; উসুদুল গাবা–২/৩৫৪
৩৩. আল-ইসতী'য়াব–২/৭৭; উসুদুল গাবা–২/৩৫৫; মুসনাদ–৫/১৬
৩৪. মুসনাদ–৪/১৬
৩৫. মুসনাদ–৫/১৯; আল-ইসতী'য়াব–২/৭৯; উসুদুল গাবা–২/৩৫৪
৩৬. মুসনাদ–৫/১৮; হায়াতুস সাহাবা–৩/৬২৬
৩৭. আজ-জাহাবীঃ তারীখ–২/২৯০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৩; উসুদুল গাবা–২/৩৫৫
৩৮. আল-ইসতী'য়াব–২/৭৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৫
৩৯. মুসনাদ–৫/১৮
৪০. প্রাগুক্ত–৫/২০

আবুল ইয়াসার কা'ব ইবন 'আমর (রা)

মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সালেমা শাখার সন্তান আবুল ইয়াসার কা'ব (রা)। ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে তাঁকে শুধু আবুল ইয়াসার অথবা কা'ব অথবা উভয় নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। পিতা 'আমর ইবন আব্বাদ এবং মাতা নুসাইবা বিন্ত আযহার আল-মুর্‌রী। তিনিও বনু সালেমা গোত্রের কন্যা।[১] ইমাম জাহাবী তাঁর পিতার নাম 'উমার এবং আবুল ইয়াসারকে আনসারদের অন্যতম স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

আল-'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াতে (শপথ) তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং ইসলামের ঘোষণা দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করেন। অনেকে তখন তাঁর বয়স বিশ বছর বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরসহ পরবর্তীকালের সকল যুদ্ধে রাসূলে কারীমের (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন।[৪] বদর যুদ্ধে তিনি দারুণ সাহস ও বাহাদুরী দেখান। মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর ঝাণ্ডা ছিল প্রখ্যাত মুহাজির সাহাবী মুসয়াব ইবন 'উমাইরের আপন ভাই আবু 'আযীয ইবন 'উমাইরের হাতে। তিনি ঝটিকা বেগে অগ্রসর হয়ে তার হাত থেকে ঝাণ্ডা ছিনিয়ে নেন এবং তাকে বন্দী করেন।[৫] এ যুদ্ধে তিনি মুনাব্‌বিহ্ ইবন হাজ্জাজ নামক এক পৌত্তলিক সৈনিককে হত্যা করেন।[৬] তাছাড়া হযরত আব্বাসকে বন্দী করে রাসূলে কারীমের (সা) সামনে হাজির করেন। রাসূল (সা) আবুল ইয়াসারের ছোট-খাট দেহ এবং আব্বাসের বিশাল দেহের প্রতি তাকিয়ে অবাক হয়ে যান। তিনি আবুল ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আব্বাসকে কেমন করে বন্দী করলে? আবুল ইয়াসার বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁকে বন্দী করার ব্যাপারে আমাকে এমন এক ব্যক্তি সাহায্য করেছে যাকে এর আগে বা পরে আর কখনো আমি দেখিনি। লোকটি দেখতে এমন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ তাঁকে বন্দী করার ব্যাপারে কোন মহান ফিরিশতা তোমাকে সাহায্য করেছে।[৭] ইমাম আহমাদ আল-বারার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুল ইয়াসার আব্বাসকে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করলে আব্বাস বললেন ঃ এ ব্যক্তি আমাকে বন্দী করেনি। আমাকে বন্দী করেছে অন্য এক ব্যক্তি, যে দেখতে এমন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ কোন ফিরিশতা তাকে সাহায্য করেছে।[৮]

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। বদরের কুরাইশ বন্দীদেরকে মদীনায় স্থানান্তরের জন্য রাসূল (সা) তাদেরকে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের আপন ভাই আবু 'আযীয ইবন উমাইর ছিলেন বন্দীদের একজন। তিনি পড়েন মুস'য়াব ও আবুল ইয়াসারের দায়িত্বে। আবুল ইয়াসারই তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বন্দী করেছিলেন। মদীনার দিকে চলার পথে মুস'য়াব তাঁর ভাই আবু আযীযের দুই হাত শক্ত করে বাঁধার জন্য আবুল ইয়াসারকে বলেন। একথা শুনে আবু আযীয দুঃখের সাথে

বলেন ঃ ভাই, আমার ব্যাপারে তুমিএ কথাও বলতে পারলে? মুস'য়াব বললেন ঃ তুমি নও, এখন এই আবুল ইয়াসার আমার ভাই।[৯] ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে আবুল ইয়াসারের বদরে যোগদানের কথা বলেছেন। ইবন হিশাম তাঁকে বদরীদের মধ্যে গণনা করেছেন।[১০] বালাজুরী বলেছেন, বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স বত্রিশ বছর ছিল।[১১] কিন্তু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ বছর বয়সে তিনি 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াতে অংশ গ্রহণ করেন। তাহলে বদরের সময় বয়স বত্রিশ বছর হয় কি করে?

আবুল ইয়াসার খায়বার যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর সাথে জড়িত খায়বারের একটি ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীর দুর্গ অবরোধ করে আছেন। এ সময় এক রাতে প্রতিপক্ষ জনৈক ইহুদীর এক পাল ছাগল অবরুদ্ধ দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। রাসূল (সা) বললেনঃ কে আমাকে এই বকরীর গোশত খাওয়াতে পারবে? আবুল ইয়াসার সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ আমি পারবো। একথা বলেই তিনি বকরীর পালের দিকে ছুটে গেলেন। বকরীগুলি তখন দুর্গের আভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল। তিনি পিছন দিকের দুইটি ধরে ফেললেন এবং তাদেরকে দুই বগলে চেপে ধরে নিয়ে এলেন। সঙ্গীরা বকরী দুইটি জবেহ করে রান্না করেছিল।[১২]

সিফ্ফীন ও পরবর্তী অন্যান্য ঘটনায় তিনি আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেছিলেন।[১৩] বদরী সাহাবীদের মধ্যে তখন তিনি একাই বেঁচে।[১৪]

হিজরী ৫৫ সনে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, বদরী সাহাবীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষে মারা যান।[১৫] শেষ জীবনে তিনি খায়বারের ঘটনাটি বর্ণনা করতেন, আর রসিকতা করে বলতেন, আমার কাছ থেকে তোমরা গ্রহণ কর। সাহাবীদের মধ্যে এখন আমিই শুধু বেঁচে আছি।[১৬] একথা দ্বারা তিনি শুধু বদরী সাহাবীদের কথা বুঝাতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছরের উর্দ্ধে। অনেকে এক শো বিশ বছরের কথা বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।

আবুল ইয়াসারের দেহটি ছিল স্থূল ও বেঁটে। তবে পেশী ছিল পাকানো রশির মত শক্ত। পেটটি ছিল মোটা।[১৭]

তিনি খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে যা করতেন তাতে সীমাহীন সতর্কতা থাকতো। একবার উবাদাহ্ ইবন ওয়ালীদের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) দুইটি হাদীস বর্ণনা করেন। তখন তিনি নিজের চোখ ও কানের ওপর আঙ্গুল রেখে বলেন, আমার এ চোখ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং এ কান রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছে।[১৮] ইমাম মুসলিম তাঁর দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস দুইটির ক্রমিক সংখ্যা হলো ৩০০৬ ও ৩০০৭। তবে ইমাম বুখারী তাঁর কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।[১৯]

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে 'উবাদাহ্ ইবন আল-ওয়ালীদ, মূসা ইবন তালহা, 'উমার ইবন হাকাম ইবন রাফে, হানজালা ইবন কায়স যারকী, সায়ফী-মাওলা আবূ আইউব আল-আনসারী এবং রিবা'ঈ ইবন খারাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০]

তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু ও নরম দিলের মানুষ। বনু হারামের জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিছু ঋণী ছিলেন। একদিন তাগাদা দিতে তার বাড়ীর দরজায় গিয়ে নাম ধরে ডাক দিলেন। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। মনে করলেন, লোকটি বাড়ী নেই। তিনি ফিরে আসলেন এমন সময় একটি ছোট্ট ছেলে দৌড়ে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আব্বা কোথায়? ছেলেটি বললো, তিনি তো আমার মায়ের চৌকির নীচে লুকিয়ে আছেন। তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, এখন বেরিয়ে এসো। তুমি কোথায় আছ তা আমার জানা হয়ে গেছে। লোকটি বেরিয়ে এলো এবং তার অভাবের কাহিনী বর্ণনা করলো। আবুল ইয়াসারের অন্তর কোমল হয়ে গেল। লোকটির নিকট থেকে ঋণের দলিলটি চেয়ে নিয়ে লেখাগুলি কেটে দিলেন। তারপর বললেন, সম্ভব হলে পরিশোধ করবে। অন্যথায় সকল ঋণ মাফ করে দিলাম।[২১]

দাস-দাসীদের সাথে তিনি সাম্য ও সমতার আচরণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেও তা কাজে পরিণত করতেন। একদিন উবাদাহ্ ইবন ওয়ালীদ হাদীস শোনার জন্য তাঁর নিকট এসে দেখলেন, তাঁর দাসের সামনে এক গাদা বই। তিনি নিজে এক প্রস্থ চাদর ও একটি লুঙ্গি পরে আছেন। দাসের শরীরেও একই পোশাক। উবাদাহ্ বললেন, চাচা, ভালো হয় পোশাক একই জাতীয় এক জোড়া করে হলে। আপনি তার লুঙ্গিটি নিয়ে নিন এবং আপনার চাদরটি তাকে দিয়ে দিন। অথবা আপনার লুঙ্গিটি তাঁকে দিয়ে তার চাদরটি আপনি নিন। আবুল ইয়াসার তাঁর কথা শুনে তাঁর মাথার ওপর হাত রেখে দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা যা পরবে দাসদেরও তাই পরতে দেবে, তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে।[২২]

ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ আবুল ইয়াসারের সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি দু'আ বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি ধ্বংস থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় চাই পতন থেকে। পানিতে ডোবা, আগুনে পুড়ে যাওয়া ও বার্দ্ধক্য থেকেও তোমার আশ্রয় চাই। আরো আশ্রয় চাই মৃত্যুর সময় শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং তোমার রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে পলায়নপর অবস্থায় ও বিষাক্ত জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের দংশনে মৃত্যু থেকে।[২৩]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল- ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা) ৪/২১৯.
২. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম- ২/৩৩৯
৩. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা - ২/৫৩৭; তারীখুল ইসলাম - ২/৩৩৯
৪. আল-ইসাবা- ৪/২২১
৫. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৩৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৩১৫; আল-ইসতী'য়াব-৪/২২০
৬. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭১৩
৭. তাবাকাত-৪/১২; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩৪;
৮. কানযুল উম্মাল-৫/২৬৬; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩৩
৯. হায়াতুস সাহাবা- ২/৩১৫
১০. আস-সীরাহ-১/৬৬২, ১/৬৯৯

১১. আনসাবুল আশরাফ- ১/২৪৭
১২. মুসনাদ-৩/৪২৭; ইবন হিশাম-২/৩৩৬-৩৩৭
১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৭
১৪. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৩৭
১৫. তারীখুল ইসলাম-২/৩৩৯; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৭
১৬. মুসনাদ -৩/৪২৭; ইবন হিশাম-২/৩৩৭
১৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৩৭; আনসাবুল আশরাফ-২/২৪৭
১৮. মুসলিম -২/৪৫০
১৯. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৩৮
২০. প্রাগুক্ত - ২/৫৩৭
২১. মুসলিম-২/৪৫০
২২. মুসলিম- ২/৪৫১
২৩. হায়াতুস সাহাবা- ৩/৩৬৭

আসিম ইবন সাবিত ইবন আ়িবিল আক্লাহ (রা)

ভালো নাম 'আসিম, ডাকনাম আবু সুলাইমান। পিতা সাবিত ইবন আবিল আকলাহ কায়েস এবং মাতা আশ-শামুস বিন্তু আবী 'আমীর।[১] এই 'আসিম ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের পুত্র প্রখ্যাত তাবেঈ 'আসিমের নানা।[২] মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের সন্তান।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আগমনের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সীরাত বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে আগে-ভাগেই ইসলাম গ্রহণকারী আনসারদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের সাথে তাঁর মুয়াখাত বা ভ্রাতৃসম্পর্ক গড়ে দেন।[৪]

হযরত 'আসিম বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫] বদর যুদ্ধের পূর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) সকল যোদ্ধাকে একত্র করে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে মতবিনিময় করলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা, বলতো তোমরা কিভাবে লড়বে? সাথে সাথে হযরত 'আসিম তীর-ধনুক হাতে করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ দু'শো হাতের ব্যবধানে হলে তীর ছুড়বো। তার চেয়ে নিকটে হলে নিযা এবং তার চেয়ে আরো নিকটে হলে তরবারি দিয়ে আঘাত করবো। তাঁর একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ যুদ্ধের নিয়ম এটাই। 'আসিম যেভাবে লড়ে, তোমরা সেভাবেই লড়বে।[৬]

বদর যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর পতাকা প্রথমে তালহা ইবন আবীতালহার হাতে ছিল। হযরত আলীর হাতে সে নিহত হলে তার ভাই আবু সা'দ ইবন আবী তালহা তা তুলে নেয়। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের হাতে সে নিহত হলে 'উসমান বা 'উসাম ইবন তালহা তা উঠিয়ে নেয়। হযরত হামযার হাতে সে নিহত হয় এবং মুসাফি ইবন তালহা সেটি তুলে নেয়। হযরত 'আসিম ইবন সাবিত তাকে হত্যা করেন। তারপর তার ভাই আল-জুলাস ইবন তালহা, মতান্তরে কিলাব ইবন তালহা পতাকাটি তুলে ধরে। হযরত 'আসিম তীর মেরে তাকেও হত্যা করেন।[৭]

হযরত 'আসিম এই বদরে কুরাইশদের আর একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি 'উকবা ইবন আবী মু'য়াইতকে হত্যা করেন। এই 'উকবা ছিল একজন অতি নীচ প্রকৃতির লোক। সে ছিল মককায় রাসূলুল্লাহর (সা) চরম দুশমনদের একজন। নানাভাবে রাসূলকে (সা) কষ্ট দিত। ঝুড়ি ভরে ময়লা-আবর্জনা এনে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরের দরজায় ফেলে রাখতো। একদিন তো রাসূল (সা) সিজদাবনত আছেন, কোথা থেকে এই নরাধম ছুটে এসে তাঁর মাথার ওপর এমনভাবে চেপে বসে যে, নবীজীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। আর একদিনের ঘটনা, নবীজী সিজদায় আছেন। এই পাষন্ড কোথা থেকে মরা ছাগলের নাড়িভুঁড়ি কাঁধে করে এনে রাসূলুল্লাহর (সা) মাথায় ঢেলে দেয়। এহেন পাপিষ্ঠ বদরে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। হযরত রাসূলে কারীমের নির্দেশে হযরত 'আসিম তাঁকে

হত্যা করেন।[৮] অবশ্য ইবন হিশাম বলেন ঃ যুহ্‌রী ও আরো অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, 'উকবাকে হত্যা করেন হযরত 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)।[৯]

তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলামের জন্য কিভাবে জীবনকে বাজি রাখতে হয় তার একটি নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত তিনি এ যুদ্ধে রেখে গেছেন। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়। কিন্তু একটি গিরিপথে রাসূল (সা) কর্তৃক মোতায়েনকৃত তীরন্দায বাহিনী রাসূলের (সা) নির্দেশ ভুলে তাদের স্থান ছেড়ে দেয় এবং গনিমাত কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল পৌত্তলিক সৈনিক সেই গিরিপথ দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আকস্মিক হামলায় বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর ওপর দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তারা তাদের অধিনায়ক রাসূল (সা) থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়ে। এমন দুর্যোগময় মুহূর্তে পনেরো জন মুজাহিদ পাহাড়ের মত অটল হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করেন। তাঁদেরই একজন হযরত 'আসিম ইবন সাবিত। এই উহুদের দিন আট ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন। তাঁরা হলেন ঃ আলী, যুবাইর, তালহা, আবু দুজানা, আল-হারিস ইবনুস সাম্মাহ, হুবাব ইবনুল মুনজির, আসিম ইবন সাবিত ও সাহল ইবন হুনাইফ। কিন্তু সেদিন তাঁদের কেউই মারা যাননি।[১০] ইবন সা'দ বলেন ঃ উহুদে যখন সবাই পালিয়ে যায় তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে মৃত্যুর জন্য বাইয়াত করেন।[১১] তিনি ছিলেন এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর দক্ষ তীরন্দাযদের অন্যতম।[১২]

এই উহুদে তিনি পৌত্তলিক বহিনীর সদস্য তালহা ইবন আবী তালহার দুই পুত্র মুসাফি' ও আল-হারিস মতান্তরে আল-জুলাসকে হত্যা করেন। তাদের দুইজনের দেহেই তিনি অতি সার্থকভাবে তীর বিদ্ধ করেন। মারাত্মক আহত অবস্থায় উভয়কে তাদের মা সুলাফা বিন্‌তু সা'দের কাছে আনা হয়। মা ছেলে মুসাফি'র মাথা কোলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করে ঃ বাছাধন! তোমার দেহে এমনভাবে তীর বিদ্ধ করেছে কে? সে বলেঃ আমি শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি আমার প্রতি তীর ছুড়ে বলে উঠলো! এই লও, আমি ইবন আবিল আকলাহ। তখন সুলাফা কসম খায়, যদি সে কোন দিন 'আসিমের মাথা হাতে পায় তাহলে সে তাঁর খুলিতে মদ পান করবে।[১৩] আল্লাহ্ পাক তার এ কসম পূর্ণ করেননি।

এই উহুদে হযরত 'আসিম মককার আর এক অকৃতজ্ঞ দুরাচারীকে হত্যা করেন। তার নাম আবু ইজ্জাহ্ 'আমর ইবন 'আবদিল্লাহ। এই লোকটি বদরে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তখন সে এই বলে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকম্পা ভিক্ষা করে যে, একটি বড় পরিবারের ভরন-পোষণের দায়িত্ব তার কাঁধে এবং সেই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতি উদারতা দেখান। জীবনে সে আর কোনদিন রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে ঘর থেকে বের হবে না—এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তিনি তাকে মুক্তি দেন।

এই আবু ইজ্জাহ্ কিন্তু উহুদ যুদ্ধের সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কুরাইশদের সাথে মককা থেকে বের হবেনা। সে তাদের বলেছিল, মুহাম্মদ আমার সাথে ভালো ব্যবহার এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি তার প্রতিদান এভাবে দিতে পারি না। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারেনি। মককার সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা ও উবাই ইবন খালাফের চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত সে তাদের সাথে উহুদে আসে যুদ্ধ করতে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এবারও সে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। আগের মত এবারও সে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকম্পা ভিক্ষা করে। উত্তরে রাসূল (সা) তাকে একটি চমৎকার কথা বলেন ঃ একজন মুমিন (বিশ্বাসী) একই গর্তের সাপ বা বিচ্ছু দ্বারা দুইবার দংশিত হতে পারে না। তুমি কি ভেবেছো, মককায় ফিরে গিয়ে তোমার লোকদের বলবে, আমি মুহাম্মদকে দুইবার ধোঁকা দিয়েছি?

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বুকাইর ইবন মিসমারের সূত্রে আবু ইজ্জাহ্র উহুদে বন্দী হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মুশরিকরা উহুদ থেকে পিছনে সরে গিয়ে দিনের প্রথম ভাগে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণ পর তারা সেখান থেকে প্রস্থান করে। কিন্তু আবু ইজ্জাহ্ তখনও ঘুমিয়ে। এদিকে বেলা বেড়ে গেল। কুরাইশ বাহিনীর অনুসরণকারী মুসলিম বাহিনীর লোকেরা সেখানে এসে উপস্থিত হলো। হযরত 'আসিম ইবন সাবিত আবু ইজ্জাহ্কে সেখানে পেয়ে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির করেন। রাসূল (সা) তাঁর প্রাণ ভিক্ষার আবেদন নাকচ করে দিয়ে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। হযরত 'আসিম তার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।'[১৪] অবশ্য অন্য একটি বর্ণনামতে আবু ইজ্জাহর হত্যাকারী হযরত যুবাইর।[১৫]

হযরত 'আসিম (রা) হিজরী ৪র্থ সনে 'আর-রাজী'-এর ঘটনায় হুজাইল গোত্রের লোকদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। এই ঘটনার বর্ণনায় ইমাম বুখারী ও অন্যান্য সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছুটা অমিল দেখা যায়। এখানে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

'আর-রাজী' ছিলো হুজাইল গোত্রের একটি পানির কুপের নাম। এর পাশেই ঘটনাটি ঘটেছিল। তাই ইতিহাসে তা 'ইওমুর রাজী'-এর ঘটনা নামে পরিচিত। ইমাম বুখারী আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) 'আসিম ইবন সাবিতের নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি গোয়েন্দা দল পাঠালেন। তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করে 'উসফান ও মককার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছালে হুজাইল গোত্রের 'বনু লিহইয়ান' শাখা তা টের পায়। তারা এক শো তীরান্দায লোক নিয়ে দলটির অনুসরণ শুরু করে। এক পর্যায়ে দলটি যেখানে অবস্থান করেছিলো সেখানে পৌঁছে তারা খেজুরের আঁটি কুড়িয়ে পায় এবং তা দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে দলটি মদীনা থেকে এসেছে। আঁটি পেয়ে তারা বলাবলি করেছিলো, এতো ইয়াসরিবের খেজুর। তারা দ্রুত অনুসরণ করে দলটি ঘিরে ফেলে। শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে হযরত 'আসিম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একটি উঁচু শক্ত টিলার ওপর আশ্রয় নেন।[১৬]

ইমাম বুখারীর উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একটু ভিন্নতা দেখা যায় মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, মুসা ইবন 'উকবা ও 'উরওয়া ইবন যুবাইরের বর্ণনায়। তবে মাগাযী শাস্ত্রে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন, কেউ মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী) জানতে চাইলে তাকে মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।[১৭]

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক 'আসিম ইবন 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধের পর আল-'আদল ও আল-কারাহ্ গোত্রদ্বয়ের কিছু লোক মদীনায় এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কিছু লোক মুসলমান হয়েছে। আমাদের সাথে আপনার কিছু সঙ্গী পাঠান, যারা আমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবেন, কুরআন পড়াবেন এবং ইসলামী শরীয়াত শেখাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে ছয় ব্যক্তিকে পাঠালেন। তাঁরা হলেনঃ (১) মারসাদ ইবন আবী মারসাদ আল-গানাবী, (২) খালিদ ইবনুল বুকাইর আল-লাইসী, (৩) 'আসিম ইবন সাবিত, (৪) খুবাইব 'আদী, (৫) যায়িদ ইবনুদ দাস্নাহ্, (৬) 'আবদুল্লাহ ইবন তারিক। দলনেতা ছিলেন মারসাদ ইবন আবী মারসাদ। মুসা ইবন 'উকবাও ইবন ইসহাকের মত বর্ণনা করেছেন।[১৮]

ইবন ইসহাক বলেন ঃ তাঁরা ঐ লোকগুলির সাথে যাত্রা করলেন। হিজাযের দিকে 'আল-হাদয়ার' কাছাকাছি হুজাইল গোত্রের 'আর-রাজী' কুপের নিকট পৌঁছালে সাথের লোকগুলি বিশ্বাস ভঙ্গ করে দলটির ওপর আক্রমণের জন্য হুজাইল গোত্রের সাহায্য চেয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। সাথে সাথে হুজাইল গোত্রের লোকেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং চারদিক থেকে দলটিকে ঘিরে ফেললো। এই মুষ্টিমেয় লোক তাদের সাথে লড়বার জন্য হাতিয়ার তুলে নিলো। তখন হুজাইল গোত্রের লোকেরা বললো ঃ আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। তবে মককাবাসীদের হাতে তোমাদেরকে তুলে দিয়ে বিনিময়ে কিছু লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।[১৯] আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছি এবং তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো না। তোমরা আত্মসমর্পণ কর। প্রত্যুত্তরে মারসাদ, খালিদ ও 'আসিম বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমরা কোন মুশরিকের অঙ্গীকার ও চুক্তি কক্ষণো গ্রহণ করবো না। ইমাম বুখারী বলেন ঃ এই সময় 'আসিম বলেছিলেন ঃ আমি কাফিরের জিম্মায় যাব না। হে আল্লাহ! আপনার নবীকে আমাদের খবর পৌঁছে দিন।[২০] ইবন ইসহাক বলেন, এই সময় 'আসিম একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন, তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[২১]

'আমার কী যুক্তি থাকতে পারে, যখন আমি একজন শক্তিমান, দক্ষ তীরান্দায?

একটি ধনুকও আছে, আর তাতে আছে শক্ত ছিলা।

তার পিঠ থেকে উড়ে যায় লম্বা-চওড়া তীরের ফলা।

আর মৃত্যু? তাই তো সত্য, আর জীবন-তাতো মিথ্যা।

আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতো আসবে,

আর মানুষ, সে তো তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।
আমার মা হবেন নাককাটা-
যদিনা আমি তাদের সাথে লড়াই করি।'

এমনি ধরনের আরো কিছু পংক্তি সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।[২২]

'আসিম কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করতে করতে কাফিরদের প্রতি তীর ছুড়ছিলেন। তীর শেষ হয়ে গেলে বর্শা চালাতে লাগলেন। এক সময় তাও ভেঙ্গে গেলে এবার থাকলো তরবারি। তাই চালালেন। শাহাদাতের ক্ষণিক পূর্বে তিনি দু'আ করলেন ঃ

'হে আল্লাহ! দিনের প্রথম ভাগে আমি তোমার দ্বীন রক্ষা করেছি। এখন দিনের শেষ ভাগে তুমি আমার দেহ রক্ষা কর।' তিনি তরবারি চালাচ্ছিলেন, আর কবিতার দুইটি পংক্তি গুন গুন করে আওড়াচ্ছিলেন। তার অর্থ এ রকম ঃ

'আমি আবু সুলাইমান! আমার মত লোকেরাই তীর নিক্ষেপ করে। এ গৌরব লাভ করেছি সম্মানিত লোকদের থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে। শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মারসাদ ও খালিদ শহীদ হয়েছে।'[২৩]

ইমাম বুখারী বলেন ঃ অতপর 'আসিম সহ তাঁর সঙ্গীরা যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। শত্রুদের তীরে বিদ্ধ হয়ে 'আসিম তাঁর ছয়জন সঙ্গীসহ শাহাদাত বরণ করেন। বেঁচে থাকেন খুবাইব, যায়িদ ও অন্য একজন। কাফিরদের প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা আত্মসমর্পণ করলেন। হাতের মধ্যে পেয়েই কাফিররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাঁদেরই ধনুকের সূতা খুলে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এ দেখে তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠলেন, এ হলো প্রথম ধোঁকা। একথা বলে তিনি তাদের সাথে চলতে একেবারেই অস্বীকার করলেন। তারা অনেক টানাহেঁচড়া করলো; কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিতে পারলো না। শেষে কাফিররা তাঁকেও হত্যা করে। অবশিষ্ট দুইজনকেও মককায় নিয়ে হত্যা করা হয়।[২৪]

হযরত 'আসিমকে (রা) হত্যার পর বনু হুজাইল তাঁর মাথা মককার এক মহিলা 'সুলাফা বিন্‌তু সা'দ'-এর কাছে বিক্রীর সিদ্ধান্ত নিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আসিম উহুদ যুদ্ধে এই মহিলার দুই ছেলেকে হত্যা করেন। তাই সে কসম খেয়েছিল, যদি কখনো 'আসিমকে হাতের মুঠোয় পায় তাহলে তাঁর মাথার খুলিতে মদ পান করবে।[২৫] সে আরো ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি তাঁর মাথা এনে দেবে তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে।[২৬] তাছাড়া তিনি বদরে পৌত্তলিক কুরাইশদের এক বড় নেতা 'উকবা ইবন আবী মু'য়াইতকে হত্যা করেছিলেন। এজন্য তারাও 'আসিমের মৃত্যুর খবর পেয়ে দারুণ খুশী হয়েছিল। তারা এই বলে উল্লাস প্রকাশ করেছিল যে, যাক, শেষ পর্যন্ত 'উকবার হত্যাকারীর পার্থিব জীবনের অবসান হয়েছে। তারা তাঁর দেহ আগুনে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা নিবারণ করতে চেয়েছিল।[২৭] কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের কারও বাসনা পূরণ করেননি।

এদিকে হযরত 'আসিম মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর দরবারে এই বলে দু'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! কোন মুশরিক যেন আমাকে স্পর্শ না করে এবং আমিও যেন তাদের কাউকে স্পর্শ না করি। আল্লাহ পাক তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন। তিনি মৌমাছি বা বোল্‌তা পাঠিয়ে কাফিরদের স্পর্শ থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত 'উরওয়া বলেন ঃ মুশরিকরা তাঁর লাশের দিকে যাওয়ার উদ্যোগী হতেই কোথা থেকে এক ঝাঁক মৌমাছি এসে তাদেরকে এমনভাবে কামড়াতে শুরু করে যে, তারা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। দিনের আলোতে তারা অকৃতকার্য হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, রাতের আঁধারে লাশের কাছে যাবে। কিন্তু রাতের আঁধার নামতে না নামতে মুষলধারে বৃষ্টি নামে এবং গোটা উপত্যকায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়। সে প্লাবনের প্রবল স্রোতে হযরত 'আসিমের লাশটি যে কোথায় ভেসে যায় মুশরিকরা তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার কোন হদিস পায়নি। ইবন সা'দ বলেন ঃ হিজরাতের ছত্রিশ মাসের মাথায় সফর মাসে 'আর-রাজী'র এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। হযরত উমার যখন শুনলেন, মৌমাছি তাঁর দেহ রক্ষা করেছে, তখন মন্তব্য করলেন ঃ একজন বিশ্বাসী বান্দাহ্‌কে আল্লাহ হিফাজত করেছেন। জীবন ও মরণ উভয় অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে মুশরিকের স্পর্শ থেকে রক্ষা করেছেন। যেহেতু মৌমাছি তাঁকে রক্ষা করেছেন, এ কারণে ইতিহাসে তিনি 'হামিউদ্‌ দাবার' নামে পরিচিত।[২৮]

'আর-রাজী'র এই বিষাদময় ঘটনার পর হুজাইলীদের নিন্দায় মদীনার ইসলামী কবিরা সরব হয়ে ওঠেন। হাস্‌সান ইবন সাবিত, আবু যায়িদ আল-আনসারী প্রমুখ কবি তাদের এ অপকর্মের নিন্দা এবং শহীদদের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। সীরাতু ইবন হিশাম সহ বিভিন্ন গ্রন্থে তার কিছু সংকলিত হয়েছে।[২৯] হাস্‌সান ইবন সাবিতের একটি মরছিয়া বা শোকগাঁথার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

'আমার জীবনের শপথ! হুজাইল ই. মুদরিক দারুণ অপরাধ করেছে, খুবাইব ও 'আসিমের ব্যাপারে তারা দুর্নাম কুড়িয়েছে।'[৩০]

হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন ঃ 'আর-রাজী'র খবর মদীনায় পৌঁছালে মুনাফিকরা মন্তব্য করলো, এই হতভাগ্য লোকগুলো তাদের ঘরেও থাকলো না, তাদের নেতার বাণীও পৌঁছাতে পারলো না অথবা তারা জীবনের বিনিময়ে কোন কল্যাণও লাভ করলো না। তখন আল্লাহ পাক সূরা আল-বাকারার ২০৪ নং আয়াতটি নাযিল করেন ঃ[৩১]

'আর এমন কিছু লোক আছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক।'

হযরত 'আসিমের এক ছেলের নাম মুহাম্মাদ। তৎকালীন 'আরবের বিখ্যাত কবি আল-আহওয়াস এই মুহাম্মাদের পৌত্র।[৩২]

শক্ত ঈমান, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি গভীর মুহাব্বত, পরিচ্ছন্ন মন, অতুলনীয় সাহস ইত্যাদি গুণ হযরত 'আসিমের চরিত্রের উজ্জলতম দিক।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদীনার চির বৈরী দুই গোত্র– আউস ও খাযরাজ নিজ নিজ গোত্রের কৃতি সন্তানদের নাম নিয়ে গর্ব করতো। আউস বলতো, হানজালা– যাঁকে ফিরিশ্‌তারা গোসল দিয়েছিল, সা'দ ইবন মু'য়াজ– যাঁর মৃত্যুতে 'আরশ কেঁপে উঠেছিলো, 'আসিম ইবন সাবিত– যাঁর দেহ আল্লাহ মৌমাছি দ্বারা রক্ষা করেছিলেন, খুযাইমা ইবন সাবিত– যাঁর একার সাক্ষ্য দুইজনের সমান– এঁরা সবাই আউস গোত্রের সন্তান।[৩৩]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত- ৩/৪৬২; আল-আ'লাম- ৪/১২
২. উসুদুল গাবা- ৩/৭৩; আল-ইসাবা- ২/২৪৪
৩. আল-ইসাবা- ২/২৪৪; আল-আ'লাম- ৪/১২
৪. তাবাকাত- ৩/৪৬২
৫. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৮৮; আল-আ'লাম- ৪/১২
৬. আল-ইসাবা- ২/২৪৫
৭. আনসাবুল আশরাফ- ১/৫৪; উসুদুলগাবা- ৩/৭৩
৮. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৪৪, ৭০৮; আনসাবুল আশরাফ- ১/১৪৭, ১৪৮, ২৯৭, উসুদুল গাবা-৩/৭৩
৯. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৪৪, ৭০৮, ২/১২৭
১০. আনসাবুল আশরাফ- ১/৩১৮
১১. তাবাকাত- ৩/৪৬২
১২. আনসাবুল আশরাফ- ১/৩২৩
১৩. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৭৪; তাবাকাত- ৩/৪৬২; আনসাবুল আশরাফ- ১/৩৩৪
১৪. আনসাবুল আশরাফ- ১/৩৩৫, ৩৩৬
১৫. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১০৪
১৬. হায়াতুস সাহাবা- ১/৫২০; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৮-৯৯; আল-আ'লাম-৪/১২
১৭. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৮
১৮. প্রাগুক্ত- ১/৫৯৮
১৯. তাবাকাত- ৩/৪৬৩
২০. হায়াতুস সাহাবা- ১/৫২০; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্-১/৫৯৮
২১. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১৬৯, ১৭০, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৯
২২. আল-ইসাবা- ২/২৪৫
২৩. তাবাকাত- ৩/৪৬৩
২৪. হায়াতুস সাহাবা- ১/৫২০; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- /৫৯৮, ৫৯৯
২৫. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৯; উসুদুল গাবা- ৩/৭৩
২৬. তাবাকাত- ৩/৪৬২
২৭. আল-ইসতী'য়াব- ২/৫১৩; উসুদুল গাবা- ৩/৭৩; আনসাবুল আশরাফ- ১/৩৭৫; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৯
২৮. ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন ঃ আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৮-৬০১; বুখারী- ২/৫৬৮, ৫৮৫; তাবাকাত- ৩/৪৬২, ৪৬৩; হায়াতুস সাহাবা- ১/৫২০-৫২৩; সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৬৯-১৭১; উসুদুল গাবা- ৩/৭৩; আনসাবুল আশরাফ- /৩৭৫; আল-ইসাবা-২/২৪৫
২৯. দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১৭৪; ১৮০-১৮৩
৩০. আল-ইসাবা- ২/২৪৫; উসুদুল গাবা- ৩/৭৩
৩১. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১৭৪
৩২. তাবাকাত- ৩/৪৬৩
৩৩. হায়াতুস সাহাবা- ১/৩৯৫।

আল হারেসা ইবন সুরাকা (রা)

আল হারেসা ইবন সুরাকা মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। পিতা সুরাকা ইবন হারেস এবং মাতা রাবী বিনতু নাদার। তাঁর ডাক নাম উম্মুল হারেসা। মা রাবী ছিলেন একজন উঁচুস্তরের সাহাবী এবং প্রখ্যাত সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম আনাস ইবন মালিকের আপন ফুফু।[১]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পূর্বেই পিতার মৃত্যু হয়। মা জীবিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিয়্যাতের মর্যাদা লাভের গৌরব অর্জন করেন। মায়ের সাথে ছেলেও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) আস-সায়িব ইবন 'উসমান ইবন মাজ'উনের (রা) সাথে তাঁর দ্বীনি ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করেছেন।[২]

বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। বদরে যাত্রার নির্দেশ লাভের পর তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে চলতে শুরু করেন।[৩] রাসূল (সা) তাঁকে পর্যবেক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিজের সংগে রাখেন।[৪] তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তিনি যখন একটি ঝরনায় পানি পান করছিলেন তখন হিব্বান ইবন 'আরাফার নিক্ষিপ্ত একটি তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৫] বর্ণিত আছে, আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ তিনি। তবে কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। পূর্বোক্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[৬]

রাসূলুল্লাহ (সা) বদর থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। আল হারেসার মা ছুটে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল হারেসাকে আমি কতখানি ভালোবাসি তা আপনি জানেন। যদি সে জান্নাতের অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে তো সবর করলাম। অন্যথায় আপনি দেখবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : এসব তুমি বলছো কি? জান্নাতের সংখ্যা তো একটি বা দু'টি নয়। জান্নাত অনেক। আল হারেসা সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত আল ফিরদাউসের অধিকারী হয়েছে।[৭] এই খোশখবর শুনে মা রাবী' আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। মৃদু হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগেন : নাজ, নাজ ইয়া আল হারেসা-সাবাশ, সাবাশ, ওহে আল-হারেসা![৮]

আল হারেসা ছিলেন দারুণ মাতৃভক্ত। 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থকার লিখেছেন! তিনি ছিলেন মায়ের ভীষণ অনুগত ও বাধ্য।[৯]

একবার রাসূলে কারীম (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে আল হারেসার সাথে দেখা। বললেন : হারেসা! আজ তোমার সকাল হলো কি অবস্থায়? হারেসা বললেন : এমন অবস্থায় যে আমি একজন খাঁটি মুসলমান। রাসূল (সা) বললেন : একটু ভেবে বল। প্রত্যেকটি কথার একটি গূঢ় তত্ত্ব থাকে। আল হারেসা আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। রাত কাটে ইবাদাত-বন্দেগীতে এবং দিন কাটে রোযা রেখে। বর্তমান মুহূর্তে আমি যেন নিজেকে আরশের দিকে যেতে দেখতে

পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে জান্নাতীরা জান্নাতের দিকে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামের দিকে চলছে। তাঁর কথা শোনার পর রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ যে বান্দার অন্তরকে আলোকিত করেন, সে অন্তর আর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়না। আল হারেসা আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার শাহাদাতের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন। সে দু'আ কবুল হয়। বদর যুদ্ধের সময় তার বাস্তবায়ন হয়। তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৫১০; আল-ইসাবা-১/২৯৭;
২. তাবাকাত-৩/৫১০.
৩. উসুদুল গাবা-১/২৮৬
৪. সহীহ বুখারী-২/৫৭৪
৫. তাবাকাত-৩/৫১০,
৬. আল-ইসাবা-১/২৯৭
৭. বুখারী-২/৫৬৪; তাবাকাত-৩/৫১০; আল-ইসাবা-১/২৯৭.
৮. উসুদুল গাবা-১/৩৫৬; আল-ইসাবা-১/২৯৭
৯. উসুদুল গাবা-১/৩৫৫.
১০. সীয়ারে আনসার-১/৩৪৪

আল-হারেস ইবন আস্-সিম্মাহ্ (রা)

আল-হারেস (রা)-এর ডাকনাম আবু সা'ঈদ। পিতা আস্-সিম্মাহ ইবন 'আমর এবং মাতা তুমাদুর বিনতু 'আমর। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান।[১]

রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আগমনের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সবর ও ইসতিকলাল, ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রতীক সুহাইব আর-রূমীর (রা) সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

মূসা ইবন 'উকবা, ইবন ইসহাক ও অন্যরা তাঁকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] রাসূলে কারীমের (সা) সাথে বদরে যাত্রা করেন এবং 'রাওহা' নামক স্থানে যাওয়ার পর কোন কারণে দেহের কোন হাড় ভেঙ্গে গেলে রাসূল (সা) তাঁকে মদীনায় ফেরত পাঠান। তবে যুদ্ধের শেষে তাঁকে বদরের গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ও সওয়াবের অংশীদার ঘোষণা করেন।[৪]

উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন আল-হারেস দারুণ সাহসের পরিচয় দেন। তিনি কুরাইশ বাহিনীর সদস্য 'উসমান ইবন আবদিল্লাহ ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর বর্ম, ঢাল, তরবারি ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করেন। এ খবর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলে তিনি মন্তব্য করেন ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে এ সুযোগ দান করেছেন।[৫] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) এই 'উসমানকে ইতিপূর্বে নাখলায় টহলদানের সময় বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসেন। এরপর সে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়ে আবার কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়। উহুদে আল-হারেস যখন তাকে হত্যা করছিলেন তখন 'উবাইদ ইবন হাজেয আল-'আমেরীর দৃষ্টিগোচর হয়। সে অতর্কিত আল-হারেসের কাঁধে তরবারির প্রচণ্ড আঘাত হানে। আল-হারেস মারাত্মকভাবে আহত হন। দূর থেকে আবু দুজানা ছুটে এসে 'উবাইদ ইবন হাজেযকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে ফেলেন। এরপর তাকে হত্যা করে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেন।[৬] রাসূল (সা) আল-হারেসকে নিহত 'উসমানের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম দান করেন।

উহুদে যখন মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত হয়ে রাসূল (সা) থেকে ছিটকে পড়ে তখনও যে কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে অটল থাকেন, আল-হারেস ইবন আস-সিম্মাহ্ তাঁদের অন্যতম।[৭] ইবন ইসহাক বলেন, উহুদের বিপর্যয়ের সময় মুসলমানরা যখন জানলো যে, রাসূল (সা) জীবিত আছেন এবং তাঁকে চিনতে পারলো তখন সবাই সেদিকে ছুটলো। এরপর আবু বকর, উমার, আলী, তালহা, যুবাইর, আল-হারেস ইবন আস্-সিম্মাহ সহ আরো কিছু মুসলমান রাসূলকে (সা) নিয়ে উপত্যকার দিকে যান।[৮]

উহুদের উপত্যকায় রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের বেষ্টনীর মধ্যে ঠেস দিয়ে বসা আছেন। এমন সময় মক্কার পৌত্তলিক নেতা উবাই ইবন খালাফ একেবারে কাছাকাছি

এসে রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বললো ঃ ওহে মুহাম্মদ! তুমি বেঁচে গেলে আমি বাঁচবো না। সাহাবীরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ একজন কি তাকে রুখবে? বললেন ঃ না। তার দরকার নেই। যখন সে আরো কাছাকাছি এলো, রাসূল (সা) আল-হারেস ইবন আস-সিম্মাহর হাত থেকে তাঁর নিযাটি নিলেন। তারপর উবাই ইবন খালাফের মুখোমুখি হয়ে তার গলায় সামান্য খোঁচা দিলেন। আর তাতেই সে তার অতি প্রিয় ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালালো।

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় থাকতে উবাই ইবন খালাফের সাথে দেখা হলে সে বলতো ঃ মুহাম্মাদ! আমার একটা তাগড়া ঘোড়া আছে। প্রতিদিন আমি তাকে বারো রতল দানা খাওয়াই। আমার বিশ্বাস, ওর ওপর সোয়ার হয়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো। রাসূল (সা) বলতেন ঃ না, তা পারবেনা। বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো ইনশাআল্লাহ। রাসূল (সা) তার গলায় যে খোঁচাটি দিয়েছিলেন, তা ছিল অতি সামান্য। খোঁচা খেয়ে সে অস্থিরভাবে স্বপক্ষীয় লোকদের নিকট দৌড়ে গিয়ে বলতে থাকে ঃ আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ আমাকে মেরে ফেলেছে। তার সাথীরা বললো ঃ তোমার তো কিছুই হয়নি। তুমি মনে হয় পাগল হয়ে গেছো। সে বললো ঃ 'মুহাম্মাদ মক্কায় থাকতে আমাকে বলতো ঃ আমি তোমাকে হত্যা করবো। আল্লাহর কসম! আমার প্রতি সে যদি কেবল থুথু নিক্ষেপ করতো তাতেই আমার মৃত্যু হতো।' আল্লাহর এই দুশমন কুরাইশ কাফেলার সাথে মক্কায় ফেরার পথে 'সারাফ' নামক স্থানে মারা যায়।[৯] আসলে সে বুঝেছিল, আঘাত যত সামান্যই হোক, মুহাম্মাদের মুখ থেকে যে কথা উচ্চারিত হয়েছে তা সত্যে পরিণত হবেই।

উহুদ যুদ্ধে এক পর্যায়ে রাসূলে কারীম (সা) আল-হারেসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আবদুর রহমান ইবন 'আওফকে দেখেছো? বললেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো পাহাড়ের পাদদেশে পৌত্তলিকদের ভীড়ের মধ্যে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে যাওয়ার জন্য মনস্থির করছিলাম, এমন সময় আপনার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লো। আমি এ দিকে চলে এলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ ফিরিশতারা তাঁর পক্ষে লড়ছে। একথা শোনার সাথে সাথে আল-হারেস ছুটে গেলেন 'আবদুর রহমানের দিকে। দেখলেন, তাঁর সামনে কাফিরদের সাতটি লাশ পড়ে আছে। তিনি আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এদের সকলকে কি আপনি একাই হত্যা করেছেন? আবদুর রহমান বললেন ঃ এই আরতাত ইবন 'আবদি শুরাহবীল এবং ওকে—এ দু'জনকে তো আমি হত্যা করেছি। কিন্তু অন্যদের হত্যাকারী আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আল-হারেস তখন বললেন ঃ রাসূল (সা) ঠিক কথাই বলেছেন। তাবারানী এ বর্ণনাটি সংকলন করেছেন।[১০]

উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রাসূল (সা) হামযা (রা) সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আল-হারেস সংগে সংগে তাঁর খোঁজে বের হলেন। তাঁর ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে 'আলী

(রা) তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। আলী তখন একটি কবিতার দু'টি চরণ গুন্ গুন্ করে আবৃত্তি করছিলেন। তার অর্থ নিম্নরূপ ঃ

'প্রভু হে, আল-হারেস ইবন আস্-সিম্মাহ্ একজন বন্ধুবৎসল এবং আমাদের মধ্যে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে গিয়ে সে হারিয়ে গেছে। আর সে যেখানেই যায় জান্নাত তালাশ করে।'[১১]

ইবন হিশাম চরণ দু'টি একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, চরণ দু'টি আলীর নয়।[১২]

এরপর আলী (রা) আল হারেসের দেখা পেলেন। তাঁরা উভয়ে হামযাকে (রা) মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন এবং ফিরে এসে রাসূলকে (সা) খবর দিলেন।

আল-হারেস ছিলেন 'বীরে মাউনা'র ঘটনার অন্যতম সদস্য। এক পর্যায়ে তিনি অন্য সঙ্গীদের থেকে একটু দূরে ছিলেন। এদিকে কাফিররা তাঁর অন্য সঙ্গীদের হত্যা করে; কিন্তু তিনি তা জানতেন না। তিনি আমর ইবন উমাইয়্যার সাথে একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন। হঠাৎ আকাশে শকুন জাতীয় পাখী দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বুঝতে পারলেন কিছু একটা ঘটেছে। 'আমরকে সংগে করে সেই দিকে চললেন। দেখলেন, এক স্থানে বেশ কিছু মুসলমানের রক্তাক্ত ও ধুলিমলিন লাশ বিগলিত অবস্থায় পড়ে আছে। এদৃশ্য দেখে তিনি সঙ্গী 'আমরকে বললেন, এখন বল তোমার ইচ্ছা কি? 'আমর বললেন ঃ এটা তো স্পষ্ট যে, রাসূল (সা) সত্যের ওপর আছেন। এখন আমাদের উচিত মদীনায় ফিরে গিয়ে বিষয়টি তাঁকে জানানো। এখন বল তোমার ইচ্ছা কি? আল-হারেস বললেন ঃ যেখানে আল-মুনজির ইবন 'আমর নিহত হয়েছেন, আমি কিভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারি? লোকে বলবে, আল-মুনজির নিহত হয়েছেন, আর আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এরপর তিনি 'আমরকে সংগে করে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন। প্রতিপক্ষ ছিল সুসজ্জিত এবং সংখ্যায় অনেক। তারা বৃষ্টির মত তীর নিক্ষেপ করে আল-হারেসের সারা দেহ ঝাঝরা করে ফেলে। তিনি ঘটনা স্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সংগী 'আমর শত্রু পক্ষের হাতে বন্দী হন। 'আমের ইবন আততুফাইল যখন জানতে পারে যে বন্দী 'আমর মুদার গোত্রের লোক তখন সে তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল মুড়ে দিয়ে মুক্ত করে দেয়। কারণ, তার মা মান্নত করেছিল যে, সে একটি বন্দী মুক্ত করবে। এভাবে 'আমের তার মায়ের মান্নত পূরণ করে। এটা হিজরাতের ৩৬ মাসের মাথায় সফর মাসে সংঘটিত হয়।[১৩]

আল-হারেসের এক ছেলে সা'দ সিফ্ফীনে 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। সা'দের মায়ের নাম ছিল উম্মুল হাকাম খাওলা বিনতু 'উকবা। তাঁর অন্য একটি ছেলের নাম আবুল জুহাইম। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য লাভে ধন্য হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীসও বর্ণনা করেন। তাঁর মায়ের নাম 'উতাইলা বিনতু কা'ব। ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে বলেছেন, মদীনা ও বাগদাদে এখনও আল-হারেসের

বংশধর বিদ্যমান আছে।[১৪] আল-হারেসের মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর কিছু শ্লোক সংকলিত হয়েছে।[১৫]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত- ৩/৫০৮; আল-ইসাবা-১/২৮১
২. আনসাবুল-আশরাফ-১/২৭১; তাবাকাত-৩/৫০৯
৩. আল-ইসাবা-১/২৮১
৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭০৩; তাবাকাত-৩/৫০৯; আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৯
৫. তাবাকাত-৩/৫০৯
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৫
৭. প্রাগুক্ত-১/৩১৮
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৮৩
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৮৪
১০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩৬
১১. তাবাকাত-৩/৫০৯; আনসাব-১/৩২৫
১২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৬৬
১৩. তাবাকাত-৩/৫০৯; আল-ইসাবা-১/২৮১; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৭
১৪. তাবাকাত-৩/৫০৯
১৫. আল-ইসাবা-১/২৮১; সীয়ারে আনসার-১/৩৪১;

'উমাইর ইবন সা'দ (রা)

'উমাইর ইবন সা'দ মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের ভোগ-বিমুখ একজন আনসারী সাহাবী। চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি 'নাসীজু ওয়াহদিহ' উপাধি লাভ করেন। তাঁকে এ উপাধি দান করেন খলীফা 'উমার (রা)।[১]

'উমাইরের শৈশব কালেই পিতা সা'দ ইবন 'উবাইদ মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর মা জুলাস ইবন সুওয়ায়িদকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। মায়ের সাথে 'উমাইরও চলে যান জুলাসের তত্ত্বাবধানে। জুলাস তাঁকে নিজের সন্তানদের মত অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সাথে প্রতিপালন করেন। ইবন হিশাম বলেন ঃ এই জুলাস ও তাঁর ভাই আল-হারেস, দুইজনই ছিলেন মুনাফিক (কপট মুসলমান)।[২]

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, আবু যায়িদ ছিলেন মদীনার আনসারদের বিখ্যাত চার ক্বারীর অন্যতম। তাঁর আসল নাম সা'দ ইবন 'উবাইদ। আর আমাদের আলোচ্য এই মহান সাহাবীর সম্মানিত পিতার নামও ছিল সা'দ ইবন 'উবাইদ। এ কারণে অনেক ঐতিহাসিক, বিশেষতঃ ইবন সা'দ ভুল করেছেন। তাঁরা 'উমাইরকে ক্বারী আবু যায়িদ সা'দ ইবন 'উবাইদের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। এটা তাঁদের এক মারাত্মক ভুল। যেমন ইবনুল কালবী বলেছেন ঃ তাঁর পিতা সা'দ ইবন 'উবাইদ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৩] অথচ উভয় সা'দের মৃত্যু সনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তাছাড়া 'উমাইরের পিতা সা'দ ছিলেন আউস গোত্রের এবং আবু যায়িদ সা'দ ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সন্তান। প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবন মালিক বলেছেন, আবু যায়িদ সম্পর্কে তাঁর চাচা। আর এটা তো স্বীকৃত যে, আনাস খাযরাজ গোত্রের লোক। তাছাড়া আবু যায়িদ কোন বংশধর রেখে যাননি।[৪]

'উমাইরের পালক পিতা জুলাসের তত্ত্বাবধানে থাকা কালেই সম্ভবত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সীরাত বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সাহাবিয়্যাতের (রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য) গৌরব তো তিনি অর্জন করেছেন, তবে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন যুদ্ধে যাওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারেননি।[৫] এর কারণ হলো রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যুদ্ধে যাওয়ার বয়স তাঁর হয়নি। কোন কোন গ্রন্থকার বলেছেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও জিহাদে তিনি জুলাসের সহগামী হতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা তাবুক যুদ্ধের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন।[৬]

খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সেনাপতি আবু 'উবায়দার সাথে তিনি শাম অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 'উমার তাঁকে শামের একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর তাঁকে 'হিম্স ও দিমাশ্ক'-এর ওয়ালী নিয়োগ করেন। 'উমারের (রা) ওফাত পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। ইমাম যুহ্‌রী বলেন ঃ সা'ঈদ ইবন 'আমির ইবন হিজিম মৃত্যুবরণ করলে 'উমাইর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। 'উমারের নিহত হওয়া পর্যন্ত মু'য়াবিয়া ও তিনি এক সাথে শামে ছিলেন। অতঃপর খলীফা 'উসমান 'উমাইরকে অপসরণ করে গোটা শাম মু'য়াবিয়ার অধীনে ন্যস্ত করেন।[৭]

সাফওয়ান ইবন 'আমর বলেন ঃ মু'য়াবিয়া গোটা শামের আমীর হিসেবে নিয়োগ লাভের পর হিমসের মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তাতে বলেন ঃ ওহে হিমসবাসী! আল্লাহ্ তা'য়ালা সৎ ও যোগ্য আমীরদের দ্বারা আপনাদেরকে ধন্য করেছেন। আপনাদের প্রথম আমীর 'ইয়াদ ইবন গান্‌ম। তিনি আমার চেয়ে ভালো লোক ছিলেন। আপনাদের দ্বিতীয় আমীর সা'ঈদ ইবন 'আমির। তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তারপর আপনাদের আমীর হলেন 'উমাইর। 'উমাইর অতি ভালো মানুষ। এখন আমি আপনাদের আমীর। আপনারা আমাকে জানবেন।[৮]

'উমাইরের (রা) শামে থাকাকালের বেশ কিছু ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরা হলো ঃ

একবার খলীফা 'উমার (রা) একটি বাহিনীর অধিনায়ক করে তাঁকে শামে পাঠান। কিছু দিন পর খলীফার নিকট এসে বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমাদের অবস্থান এবং আমাদের শত্রুদের অবস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে 'আরাবসোস' নামে একটি শহর আছে। এর অধিবাসীরা আমাদের গোপন তথ্য আমাদের শত্রুদের নিকট সরবরাহ করে থাকে। তার ওপর ভিত্তি করে শত্রুরা আমাদের সাথে এমন এমন আচরণ করে থাকে।

খলীফা বললেন ঃ তুমি শহরের অধিবাসীদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার প্রস্তাব দেবে। বিনিময়ে তাদেরকে একটি ছাগলের পরিবর্তে দুইটি ছাগল, একটি গরুর পরিবর্তে দুইটি গরু এবং এভাবে তাদের প্রত্যেকটি জিনিসের পরিবর্তে দুইটি জিনিস দান করবে। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা তাদরকে দ্বিগুণ জিনিস দান করবো। আর এ প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের সাথে আমাদের যে চুক্তি আছে তা বাতিলের ঘোষণা দিয়ে এক বছর অপেক্ষা করবে।

'উমাইর আরজ করলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার এ অঙ্গিকারটি আমাকে একটু লিখিতভাবে দান করুন।

খলীফার অঙ্গিকার পত্রটি নিয়ে 'উমাইর শামে ফিরে গেলেন এবং 'আরাবসোসের' অধিবাসীদের নিকট প্রস্তাবটি পেশ করলেন। তারা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। 'উমাইর তাদের সাথে কৃত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে এক বছর সময় দিলেন।

এদিকে মদীনায় খলীফা 'উমারের (রা) কানে এলো, 'উমাইর 'আরাবসোস' শহরটি ধ্বংস করে ফেলেছে। আরো নানা কথা তিনি শুনতে পেলেন। খলীফা তাঁর ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। সাথে সাথে 'উমাইরকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। 'উমাইর মদীনায় খলীফার দরবারে হাজির হলেন। ক্ষুব্ধ খলীফা তাঁর মাথার ওপর ছড়ি ঝাঁকিয়ে বললেন ঃ তুমি 'আরাবসোস' ধ্বংস করে ফেলেছ! 'উমাইর কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। খলীফা দরবার থেকে উঠে ঘরে ফিরলেন। 'উমাইর সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে প্রদত্ত খলীফার অঙ্গিকার পত্রটি পাঠ করে শোনালেন। 'উমার মন্তব্য করলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন![৯]

খলীফা 'উমার (রা) তাঁকে হিমসের ওয়ালী করে পাঠালেন। এক বছরের মধ্যে তাঁর কোন খবর পেলেন না। অবশেষে তিনি কাতিবকে (সেক্রেটারী) বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে সে আমাদের আস্থা নষ্ট করেছে। তুমি তাঁকে লেখ ঃ 'আমার এ পত্র পৌঁছা এবং পাঠমাত্র মুসলমানদের নিকট থেকে খাজনা, যাকাত যা কিছু আদায় করেছো তা নিয়ে মদীনায় চলে আসবে।' চিঠি পেয়ে 'উমাইর বিলম্ব না করে একটি চামড়ার থলিতে সামান্য কিছু পাথেয় ও পানির একটি পিয়ালা ভরে কাঁধে ঝোলালেন এবং লাঠিটি হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করলেন।

মদীনা থেকে হিমসের দূরত্ব কয়েক শো মাইল। মদীনায় যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর মাথার চুল লম্বা হয়ে গেছে। রোদ, ধুলোবালি ও দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সরাসরি খলীফার দরবারে পৌঁছে বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন! - আমিরুল মুমিনীন, আপনার প্রতি সালাম! খলীফা তাঁর দিকে চোখ তুলে দেখে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করলেন ঃ এ তোমার কী হাল হয়েছে? 'উমাইর বললেন ঃ আপনি আমার আবার কি হাল দেখলেন? আমি কি সুস্থ নই? আমার ওপর কি দুনিয়াদারির ছোঁয়া লেগেছে? আমি কি দুনিয়ার শিং দুইটি ধরে টানাটানি করছি?

খলীফা ধারণা করেছিলেন, 'উমাইর হয়তো প্রচুর অর্থ-সম্পদ সাথে নিয়ে এসেছেন। তাই প্রশ্ন করলেন ঃ হেঁটে এসেছো?

বললেন ঃ হাঁ, হেঁটেই এসেছি।

- কেউ কি তোমাকে একটি বাহন দিয়ে সাহায্য করলো না?

- আমি কারো কাছে বাহন চাইনি, আর কেউ দেয়ওনি।

- তারা খুব খারাপ মুসলমান হয়ে গেছে।

- 'উমার! আল্লাহ আপনাকে মানুষের গীবত করতে নিষেধ করেছেন। আমি তো তাদেরকে ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করতে দেখেছি।

- তুমি অর্থ-সম্পদ কি করেছো?

- যা কিছু আদায় করেছি, সেখানেই জায়গামত খরচ করেছি। কিছু থাকলে তা অবশ্যই আপনার সামনে উপস্থিত করতাম।

খলীফা নির্দেশ দিলেন ঃ 'উমাইরের নিয়োগ নবায়ন করা হোক। 'উমাইর বললেন ঃ আমি আপনার অধীনে বা ভবিষ্যতে আর কারো অধীনে আর কোন দায়িত্ব পালন করবো না। কারণ, অপরাধ থেকে আমি মুক্ত থাকতে পারিনি। সেখানে খ্রীস্টান জিম্মীকে আমি বলেছি, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। ওহে 'উমার, আপনি কি আমাকে এমন কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন? অন্য সাহাবীদের মত মৃত্যুবরণ না করে বেঁচে থাকলাম এবং যেদিন থেকে আপনার সাথে কাজ করছি সেটি আমার জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিন।

এরপর তিনি খলীফার অনুমতি নিয়ে মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি নিরিবিলি স্থানে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। একদিন খলীফার কেন যেন মনে হলো, 'উমাইর বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তাই তাঁকে পরীক্ষার জন্য এক শো দীনারসহ আল-হারেস নামক এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। যাওয়ার সময় লোকটিকে বললেন ঃ তুমি 'উমাইরের কাছে একজন অতিথির ছদ্মবেশে যাবে। যদি তাঁর ওখানে পার্থিব ভোগ-বিলাসের কোন চিহ্ন দেখতে পাও তাহলে সাথে সাথে ফিরে আসবে। আর তাঁকে খুব করুণ অবস্থায় দেখলে এই এক শো দীনার তাঁকে দান করবে।

লোকটি চলে গেল। 'উমাইরের বাসস্থানে পৌঁছে দেখলো, তিনি দেওয়ালের পাশে বসে বসে জামার ময়লা খুটে খুটে তাতে তালি লাগাচ্ছেন। লোকটি সালাম দিল। 'উমাইর সালামের জবাব দিলে তাকে থাকার অনুরোধ করলেন। লোকটি থেকে গেল।

'উমাইর ঃ কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

- মদীনা থেকে।

- আমীরুল মুমিনীনকে কেমন ছেড়ে এসেছেন?

- একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসেবে।

- আমীরুল মুমেনীন কি এখন আর 'হদ' (শরী'য়াত নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম করেন না?

- তিনি তাঁর এক ছেলেকে সম্প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি দান করেছেন। ছেলেটি মারা গেছে।

- আল্লাহ, তুমি 'উমারকে সাহায্য কর। তোমার ভালোবাসা ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

লোকটি 'উমাইরের গৃহে তিন দিন অতিথি হিসেবে থাকলো। এ তিনটি দিন শুধু যবের রুটির কিছু টুকরো চিবিয়েই তাকে কাটাতে হলো। এ অবস্থা দেখে লোকটি বললো ঃ এ কয়টি দিন তো আপনি আমাকে প্রায় অভুক্তই রেখেছেন। এরপর সে দীনারগুলি বের করে 'উমাইরের দিকে এগিয়ে দিল। দীনার দেখামাত্র তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ 'আমার প্রয়োজন নেই।' একথা বলে দীনারের থলিটি তিনি লোকটির দিকে ঠেলে দিলেন। এ সময় 'উমাইরের সহধর্মিনী বললেন ঃ 'আপনার প্রয়োজন না থাকলে যাদের প্রয়োজন আছে তাদের মধ্যে বিলি করুন।' 'উমাইর বললেন ঃ 'এগুলির ব্যাপারে কোন কিছু করার কোন অধিকার আমার নেই।' তখন স্ত্রী তাঁর ওড়না ছিঁড়ে কয়েকটি টুকরো করেন। তারপর দীনারগুলি ভাগ করে সেই টুকরোগুলিতে বেঁধে আশেপাশের শহীদদের সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

এদিকে লোকটি খলীফা 'উমারের নিকট ফিরে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'উমাইর দীনারগুলি কি করেছে? 'আমি তো জানিনে'-লোকটি জবাব দিল। এরপর খলীফা 'উমার (রা) দীনারগুলিসহ 'উমাইরকে আসার জন্য লিখলেন। 'উমাইর খলীফার দরবারে হাজির

হলেন। 'দীনারগুলি কি করেছো?' - খলীফা জানতে চাইলেন। বললেন ঃ 'আমার যা ইচ্ছা হয়েছে করেছি। তার সাথে আপনার সম্পর্ক কি?' 'না তোমাকে বলতেই হবে'- খলীফা জোর দিয়ে বললেন। 'উমাইর বললেন ঃ 'আমি সেগুলি আমার আখিরাতের প্রয়োজনে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি।' খলীফা তখন কিছু খাদ্যদ্রব্য ও দুইখানা কাপড় তাঁকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। 'উমাইর তখন বললেন ঃ খাদ্যের প্রয়োজন আমার নেই। বাড়ীতে আমি দুই সা' পরিমাণ যব রেখে এসেছি। সেগুলি খেতে খেতেই আল্লাহ পাক হয়তো অন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। তবে কাপড় দুইখানি নেওয়া যেতে পারে। কারণ, আসার সময় আমি দেখে এসেছি, অমুকের মায়ের কাপড় নেই। সে ন্যাংটা প্রায়। একথা বলে কাপড় দুইখানি বগলদাবা করে বাড়ীতে ফিরে আসেন। এর অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান।[১০]

'উমাইরের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে সীরাত শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন, হিমসে তিনি স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলেন। আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে, মতান্তরে খলীফা 'উমার অথবা 'উসমানের (রা) সময়ে সেখানেই মারা যান।[১১] একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি মদীনায় মারা যান এবং খলীফা 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন।[১২] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উমাইরের মৃত্যুর খবর পেয়ে খলীফা 'উমার (রা) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ ও মাগফিরাত কামনা করেন। তারপর তিনি মদীনার 'বাকী' আল-গারকাদ' গোরস্থানে যান। তাঁকে অনুসরণ করে আরো অনেকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসনা প্রকাশ করুন তো।' তখন একজন বললো, 'আমার যদি প্রচুর ধন-সম্পদ থাকতো, তাহলে তা দিয়ে আমি এত পরিমাণ দাস মুক্ত করতাম।' আর একজন বললো ঃ 'আমার দেহে যদি অদমনীয় শক্তি হতো তাহলে আমি যমযম কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলে হাজীদের পান করাতাম।' এভাবে আরো অনেকে নিজ নিজ মনোবাসনা ব্যক্ত করলো। সবশেষে 'উমার (রা) বললেন ঃ 'আমি যদি 'উমাইর ইবন সা'দের মত আরো যোগ্য লোক পেতাম তাহলে মুসলমানদের কাজে আমি তাদের সাহায্য নিতাম।[১৩]

হিমসের ওয়ালী থাকাকালে একদিন তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বলেন ঃ 'আপনারা জেনে রাখুন, ইসলাম একটি সুরক্ষা প্রাচীর ও একটি সুদৃঢ় দ্বার বিশেষ'। ইসলামের প্রাচীর হলো ন্যায় বিচার এবং তার দ্বার হলো সত্য ও ন্যায়। প্রাচীর ফেটে গেলে এবং দ্বার ভেঙ্গে গেলে ইসলাম পরাভূত হবে। তবে শাসক যতদিন কঠোর থাকবে ইসলাম ততদিন রক্ষক থাকবে। শাসকের কঠোরতার অর্থ এই নয় যে, সে তরবারি দ্বারা হত্যাযজ্ঞ চালাবে। তার অর্থ হলো, সত্যের সাথে ফায়সালা করবে এবং ন্যায়কে আঁকড়ে থাকবে।[১৪] 'আবদুর রহমান ও মাহমুদ নামে দুই ছেলে তিনি রেখে যান।

'উমাইর (রা) ছিলেন মর্যাদাবান ও যুহ্হাদ (পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন) সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম।[১৫] সাহাবীদের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি

ছিলেন অতি উঁচু স্তরের। মুফাদ্দাল আল-গাল্লাবী বলেন ঃ আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক যাহিদ (দুনিয়াবিরাগী) ব্যক্তি তিনজন ঃ আবুদ দারদা, শাদ্দাদ ইবন আউস ও 'উমাইর ইবন সা'দ।[১৬] ইবন সীরীন বলেন ঃ খলীফা 'উমার (রা) তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর উপাধি দেন 'নাসীজু ওয়াহদিহ'-সৃষ্টি ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[১৭]

'উমাইরের ছেলে আবদুর রহমান বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার আমাকে বলেছেন ঃ সাহাবীদের মধ্যে তোমার পিতার চেয়ে ভালো মানুষ ছিল না।[১৮] ইবন সুমাই' হিমসে যে সকল সাহাবী গমন করেন তাঁদের প্রথম তাবকা বা শ্রেণীতে 'উমাইরের নামটি উল্লেখ করেছেন।[১৯]

স্বভাব ও নৈতিক চরিত্রে 'উমাইর (রা) ছিলেন আদর্শ মানের। তাকওয়া-পরহিযগারীতে তাঁর সমকক্ষ কাউকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। তাঁর মধ্যে ছিল তীব্র ঈমানী আবেগ। শৈশব থেকেই তাঁর অন্তরে ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ঈমান ও ভালোবাসার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কপটতার লেশমাত্র ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাবুক যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনায়। এ সময় তাঁর পালক পিতা আল-জুলাস রাসূলুল্লাহর (সা) শানে একটি আপত্তিকর মন্তব্য করে। 'উমাইর সাথে সাথে বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। অথচ আল-জুলাসের আশ্রয়েই তিনি লালিত-পালিত এবং তখনও তাঁরই আশ্রিত।[২০] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দৃঢ় ঈমান ও গভীর ভালোবাসা ছিল তাঁর নিকট সব কিছুর উর্দ্ধে।

আল-জুলাসের সাথে 'উমাইরের ঘটনাটি ইবন হিশামসহ বিভিন্নগ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন। তাবুক যুদ্ধে যারা যোগদান করেনি আল-জুলাস তাদের একজন। এ সময় আল-জুলাস একদিন 'উমাইরের উপস্থিতিতে মন্তব্য করেন ঃ 'এই বক্তি (মুহাম্মাদ (সা) সত্যবাদী হলে আমরা হবো গাধার চেয়েও অধম।' 'উমাইর কথাটি শুনে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আল-জুলাস! আপনি সকলের চেয়ে আমার বেশী প্রিয় ব্যক্তি। আপনার অনুগ্রহ আমার ওপর সবচেয়ে বেশী। আপনার ওপর কোন বিপদ-মুসীবত আপতিত হলে আমি কষ্ট পাই সবচেয়ে বেশী। আপনি একটি মন্তব্য করেছেন। আমি যদি বলি আপনারা গাধার চেয়েও অধম তাহলে আপনাকে লজ্জা দেওয়া হবে। আর যদি চুপ থাকি তাহলে তাতে আমার দ্বীন ধ্বংস হবে। দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রথমটি আমার নিকট অধিকতর সহজ।

'উমাইরের এ প্রতিবাদ আল-জুলাসকে দারুণ ক্ষুব্ধ করে। সাথে সাথে 'উমাইরের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার অঙ্গীকার করেন। এদিকে 'উমাইর সাথে সাথে বিষয়টি রাসূলকে (সা) অবহিত করলেন। রাসূল (সা) তাদের দুইজনকে এক সাথে ডেকে ব্যাপারটি সম্পর্কে জুলাসকে জিজ্ঞেস করলেন। আল-জুলাস হলফ করে বললেন ঃ 'উমাইর আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। সে যেমন বলেছে, আমি তেমন কিছু বলিনি। এভাবে আল-জুলাস ঘটনাটি একেবারেই অস্বীকার করলেন। কিন্তু নবী-রাসূলদের নিকট কোন সত্য গোপন থাকে না। ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে তাঁরা সব কিছু জেনে যান।

আল-জুলাসের ক্ষেত্রেও তাই হলো। আল্লাহ্ পাক ওহী নাযিল করে তাঁর নবীকে সব কিছু জানিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) তখন সূরা আত-তাওবার ৭৪ নং আয়াতটি পাঠ করলেন।

"তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা পায়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে।"

রাসূলে কারীম (সা) যখন আয়াতটির শেষাংশ-'বস্তুত এরা যদি তাওবা করে নেয়, তা হবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তাহলে তাদেরকে আজাব দেবেন আল্লাহ তা'য়ালা, বেদনাদায়ক আজাব দুনিয়া ও আখিরাতে।'- পাঠ করেন তখন আল-জুলাস বলে উঠলেন, আমি তাওবা করছি। ইবন ইসহাক বলেনঃ এ ঘটনার পর আল-জুলাস সত্যিকারভাবে মুসলমান হন। তাঁর বাকী জীবনে আর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়নি। তাওবা কবুল হওয়ার খুশীতে আল-জুলাস 'উমাইরকে আবার নিজ তত্ত্বাবধানে ফিরিয়ে নেন। আজীবন তাঁকে প্রতিপালন করেন। আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা) 'উমাইরের কান ধরে বলেন ঃ ছেলে, তোমার এ কান ঠিক শুনেছিল। 'উরওয়া বলেন ঃ এ ঘটনার পর 'উমাইরের মর্যাদা সবার উর্দ্ধে উঠে যায়।[২১]

'উমাইর (রা) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার রাবী হলেন, ছেলে মাহমুদ, আবূ তালহা আল-খাওলানী, আবু ইদরীস আল-খাওলানী, রাশেদ ইবন সা'দ, হাবীব ইবন 'উবায়েদ, যুহাইর ইবন সালেম প্রমুখ।[২২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১০৩-১০৪, ৫৫৭; তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৮; উসুদুল গাবা-৪/১৪৪,

২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫১৯

৩. উসুদুল গাবা-৪/১৪৪

৪. তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৯; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/১৪; উসুদুল গাবা-৪/১৪৫

৫. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৪; তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৮

৬. সীয়ারে আনসার-২/১১৯

৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৫, ৫৫৯; তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৮; আল-আ'লাম-৫/৮৮

৮. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৫৯

৯. প্রাগুক্ত-২/৫৬০

১০. প্রাগুক্ত-২/৫৬০-৫৬২

১১. আল-আ'লাম-৫/৮৮; তাহজীবুত তাহজীব-৮/১২৯

১২. আল-ইসাবা-৩/৩২

১৩. কানযুল 'উম্মাল-৭/৭৯; হায়াতুস সাহাবা-২/১৩৫-১৩৮; আল-আ'লাম-৫/৮৮

১৪. তাবাকাত-৪/৩৭৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৮৮

১৫. তাহ্জীব আত-তাহ্জীব-৮/১২৮
১৬. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৫, ৫৬২
১৭. তাহ্জীব আত-তাজীব-৮/১২৯; আল-ইসাবা-৩/৩২; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৫
১৮. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৫, ৫৫৯; তাহ্জীব আত-তাহ্জীব-৮/১২৯
১৯. আল-ইসাবা-৩/৩২
২০. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৪; তাহ্জীব আত-তাহ্জীব-৮/১২৮
২১. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫১১-৫২০; উসুদুল গাবা-৪/১৪৪;
২২. তাহ্জীব আত-তাহ্জীব-৮১২৮; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৪, ৫৫৭; উসুদুল গাবা-৪/১৪৪; আল-ইসাবা-৩/৩২

রাফে' ইবন মালিক ইবন 'আজলান (রা)

আবু মালিক ও আবু রিফা'য়া ডাকনাম। আসল নাম রাফে'। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের সন্তান। পিতা মালিক ইবন 'আজলান।[১]

মদীনার আনসার সম্প্রদায় একটি অতি সৌভাগ্যবান গোষ্ঠী বা দল। বিশেষতঃ সত্তর মতান্তরে পচাত্তর জনের একটি দল। তাঁদের মধ্যে আবার আগে ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে মর্যাদার তারতম্য আছে। আনসারদের মধ্যে বনু নাজ্জার ও খাযরাজ গোত্র আগে ভাগে ইসলামের আহবানে সাড়া দানের ক্ষেত্রে প্রায় সমান সমান। তবে এ ব্যাপারে তাঁদের সকল সম্মান, মর্যাদা ও কৌলিন্য কিন্তু তাঁদেরই দুই মহান ব্যক্তির জন্য। সেই দুই মহান ব্যক্তি হলেন ঃ মু'য়াজ ইবন 'আফরা' ও রাফে' ইবন মালিক ইবন 'আজলান।

রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে চলেছেন। বিশেষতঃ হজ্জ মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছেন। মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াতী যিন্দেগীর এমনই এক পর্যায়ে মদীনার খাযরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তি 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। এই ছয় সদস্যের দলটির সাথে মু'য়াজ ও রাফে' ছিলেন। তাঁদের মক্কায় উপস্থিতির খবর পেয়ে হযরত রাসূল (সা) তাঁদের অবস্থান স্থলে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলেন। তাঁরা ধীরস্থির ভাবে মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তব্য শোনেন। তারপর তাঁদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মু'য়াজ ও রাফে' রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করে মুসলমান হন।[২]

তাবাকাতে ইবন সা'দ-এ বর্ণিত হয়েছে, সেইবার মদীনা থেকে মু'য়াজ ও রাফে'- কেবল এই দুই জনই গিয়েছিলেন। তাঁরা মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মপ্রকাশের কথা শুনতে পেলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কথা শুনলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।[৩] সা'দ ইবন আবদুল হামীদের বর্ণনা অনুযায়ী দুইজনের মধ্যে এই রাফে' প্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। তিনি আরো বলেন, খাযরাজ গোত্রের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪] বালাজুরী বলেন ঃ রাফে' আনসারদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।[৫]

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা মদীনায় ফিরে আসলেন এবং খুব জোরেশোরে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ইবনুল আসীর বলেন ঃ

'যখন তাঁরা মদীনায় ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন তখন গোটা আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) চর্চা হতো না।[৬]

এর পরের বছর রাফে' বারো ব্যক্তি এবং তার পরের বছর ৭০/৭৫ ব্যক্তির সাথে পর পর দুই বার মক্কায় যান এবং ঐতিহাসিক বাই'য়াতে আকাবায় অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। সর্বশেষ বাই'য়াতের সময় তিনি বনু যুরাইক-এর 'নাকীব' বা দায়িত্বশীল মনোনীত হন।[৭]

একটি বর্ণনায় এসেছে, মদীনায় কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁরা সর্বসম্মতভাবে মু'য়াজ ও রাফে'কে মক্কায় পাঠান। উদ্দেশ্য, তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করবেন, তিনি যেন মদীনায় একজন প্রচারক পাঠান, যিনি মদীনায় আল কুরআন শিক্ষা দেবেন। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাসূল (সা) মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে মদীনায় পাঠান।[৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসার পর সা'ঈদ ইবন যায়িদ ইবন 'আমর ইবন নুফাইলের সাথে রাফে'র দ্বীনী ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[৯]

রাফে'র ইসলামী জীবনের সময়কাল খুবই স্বল্প। এ স্বল্পসময়ে মাত্র দুইটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়-বদর ও উহুদ। বদরে তাঁর যোগদানের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আছে। ইবন ইসহাক তাঁকে বদরী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেননি। মূসা ইবন 'উকবা ইমাম ইবন শিহাব আয-যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাফে' বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১০] এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য হলো খোদ রাফে'র মন্তব্য যা ইমাম বুখারী সংকলন করেছেন। রাফে' বলেছেন : 'এতে আমি খুশী নই যে, আকাবার পরিবর্তে বদরে অংশগ্রহণ করি।'[১১] যদিও তিনি এ মন্তব্য দ্বারা বদরের চেয়ে 'আকাবা'র অধিক গুরত্বের কথা বুঝাতে চেয়েছেন, তবে এ দ্বারা তাঁর বদরে যোগদান না করার কথাও বুঝা যায়। ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেন : রাসূল (সা) যখন মদীনা থেকে বদরের দিকে যাত্রা করেন তখন মদীনার অনেকের মত রাফে'ও মনে করেন, রাসূল (সা) কোন যুদ্ধে যাচ্ছেন না। আর এ কারণেই তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী হননি।[১২]

রাফে'(রা) হিজরী তৃতীয় সনের উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামী যিন্দেগীর এটাই তাঁর প্রথম ও শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১৩]

রাফে' (রা) ইসলামী জীবনের সংক্ষিপ্ত সময়ে বিভিন্ন প্রকার দ্বীনী সেবা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুবাল্লিগ (প্রচারক)। সেই প্রথম পর্যায়ে মদীনায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাঁর বিরাট অবদান আছে। ইসলাম গ্রহণের পর গোটা মদীনায় কিভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটানো যায়- এটাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা ও ফিকর। তাই তিনি প্রতিবছর ছুটে গেছেন মদীনা থেকে মক্কায় এবং গোপনে 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হয়েছেন এবং জরুরী হিদায়াত ও নির্দেশ নিয়ে মদীনায় ফিরে এসেছেন। আকাবার সর্বশেষ বাই'য়াতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নির্বাচিত দ্বাদশ নাকীবের অন্যতম নাকীব হিসাবে অর্পিত মহাদায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেছেন।

বর্ণিত আছে রাফে' সবার আগে সূরা ইউসুফ মদীনায় নিয়ে আসেন। মদীনার সকল মসজিদের পূর্বে মসজিদে বনু যুরাইকে সর্বপ্রথম আল কুরআন পঠিত হয়েছিল। আর সে

পাঠক ছিলেন তিনি। মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতের সময় যতটুকু আল কুরআন তাঁর ওপর নাযিল হয়েছিল, তিনি তা লিখে সাথে করে মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজ খান্দানের সকলকে সমবেত করে তা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।[১৪]

এমন একটি বর্ণনাও আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় থেকে যান। সূরা ত্বাহা নাযিল হওয়ার পর তা লিখে মদীনায় নিয়ে আসেন। মোটকথা, এমনি ধরনের আরো বহু সেবা তিনি দান করেন।

হাকেম তাঁর আল-মুসতাদরিক গ্রন্থে রাফে' ইবন মালিকের একটি হাদীস সংকলন করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী তাঁর পৌত্র মু'য়াজ ইবন রিফা'য়া ইবন রাফে'।[১৫]

তথ্য সূত্র ঃ

১. আল-ইসতী'য়াব ঃ ১/৪৯৪
২. ইবন কাসীর ঃ আস্-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-১/৩৩৪; উসুদুল গাবা- ২/১৫৭; আনসাবুল আশরাফ- ১/২৩৯
৩. তাবাকাত-১/১৪৬
৪. আল-ইসাবা-১/৪৯৯
৫. উসুদুল গাবা-২/১৫৭
৭. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২২৯, ৪৩১, ৪৪৩, ৪৬০; আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৪
৮. হায়াতুস সাহাবা-১/১১৭
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/২৭১
১০. আল-ইসাবা-১/৪৯৯; আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৪
১১. আল-ইসাবা-১/৪৯৯
১২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮
১৩. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৪
১৪. আল-ইসাবা-১/৪৯৯
১৫. প্রাগুক্ত-১/৪৯৯

যায়িদ ইবনে দাসিনা (রা)

হযরত যায়িদের (রা) পিতার নাম দাসিনা ইবনে মু'য়াবিয়া। মদীনার খাযরাজ গোত্রের 'বনু বায়্যাদা' শাখার সন্তান।[১] তিনি যে কখন ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলী দ্বারা বুঝা যায়, মদীনায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা পর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর বেশী দিন এ পার্থিব জীবন ভোগ করার সুযোগ পাননি। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।

উহুদ যুদ্ধের পরে, ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে 'আদাল ও কারা গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে আবেদন জানায়, কুরআন ও শরীয়াতের তা'লীম ও তারবিয়াত দিতে পারে এমন কিছু লোক আমাদের ওখানে পাঠান সেখানে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। তাদের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রাসূলে কারীম (সা), খুবাইব ইবনে আদী ও যায়িদ ইবনে দাসিনাসহ মোট ছয়জনকে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁরা হুজাইল গোত্রের আর-রাজী' নামক জলাশয়ের পাশে মুশরিকদের (পৌত্তলিক) দ্বারা আক্রান্ত হন। হযরত খুবাইব ও যায়িদ (রা) তাদের হাতে বন্দী এবং অন্যরা শহীদ হন। তাঁদের দু'জনকে হাত বেঁধে মক্কায় নিয়ে যায় এবং হুজাইল গোত্রের দু'বন্দীর বিনিময়ে তাদেরকে কুরাইশদের নিকট অর্পণ করে। সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা মুসলমানদের হাতে নিহত তার পিতা উমাইয়্যা ইবন খালাফের হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য যায়িদ ইবন দাসিনাকে গ্রহণ করে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে ভেবে সে দারুণ পুলকিত হয়ে ওঠে।

মক্কার পৌত্তলিকরা অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিল যে, যায়িদকে 'তানঈম' নামক স্থানে হত্যা করা হবে। সাফওয়ানের ছিল 'নিস্‌তাস' নামে একটি দাস। সাফওয়ান তাঁদের দু'জনকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিল। সেখানে পৌঁছার পর তাঁরা এক আজব পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। আবু সুফইয়ান যায়িদকে (রা) লক্ষ্য করে বললেনঃ যায়িদ, তোমাকে আল্লাহর নামে কসম করে বলছি। তুমি সত্য কথা বলবে। যদি তোমার স্থলে মুহাম্মাদকে আনা হয়, তাঁকে হত্যা করা হয়, আর তুমি তোমার ঘরে নিরাপদে ফিরে যাও-তুমি কি তা পসন্দ করবে? যায়িদ (রা) ধীর-স্থির ভাবে জবাব দিলেনঃ মুহাম্মদের গায়ে কাঁটার একটি আঁচড় লাগুক আর আমি আমার পরিবারের লোকদের মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করি- এ আমার মোটেই পসন্দ নয়।

আবু সুফইয়ান তার এ জবাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল- মুহাম্মাদের সঙ্গী-সাথীরা তাকে যে পরিমাণ ভালবাসে, দুনিয়ায় কারো কোন বন্ধু তাকে এতখানি ভালোবাসেনা। এর পর তাদের নির্দেশে নিসতাস তাঁকে হত্যা

করে। এটা হিযরী তৃতীয় মতান্তরে চতুর্থ সনের একটি মর্মান্তিক ঘটনা। কোন কোন বর্ণনায় 'বীরে মাউনার' ঘটনায় হযরত যায়িদ (রা) বন্দী ও শহীদ হন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'গাযওয়াতুর রাজী ও বীরে মাউনা'- অধ্যায়ে ইবন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এটা উহুদের পরের ঘটনা। তাঁর বর্ণনায় আরো বুঝা যায়, 'আর-রাজী ও বীরে মাউনা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। আর আর-রাজী'র ঘটনায় খুবাইবের সাথে যায়িদ মক্কায় নিহত হন।

মূসা ইবন 'উকরা তাঁর মাগাযীতে বর্ণনা করেছেন, খুবাইব ও যায়িদকে একই দিনে হত্যা করা হয়। আর সেদিন মদীনায় রাসূলকে (সা) বলতে শুনা যায় "ওয়া আলাইকুমা আও ওয়া আলাইকাস্ সালামু।"

'উরওয়া ও মূসা ইবন 'উকবা বলেনঃ কুরাইশরা যায়িদকে ফাঁসিতে ঝুলানোর পূর্বে তার দেহ তীর মেরে ঝাঝরা করে তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে। কিন্তু এতে তাঁর ঈমান ও আত্মসমর্পণের ইচ্ছার বৃদ্ধিই ঘটে।[২]

ইবন ইসহাক ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 'আর-রাজী'র' নায়করা এমন অসহায়ভাবে নিহত হলে মদীনার মুনাফিকরা বলতে লাগলোঃ এই হতভাগাদের জন্য দুঃখ হয়, যারা এমন অসহায়ভাবে শেষ হয়ে গেল। তারা না তাদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে থাকলো, আর না তারা তাদের বন্ধুর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারলো। তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-বাকারার ২০৪ নং আয়াতটি নাযিল করেনঃ[৩]

"-আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্যস্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃত পক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক।"

'আর-রাজী'র শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা আল-বাকারার ২০৭ নং আয়াতটি নাযিল করেনঃ

"-আর মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।"

তথ্যসূত্র ঃ

১. উদুসুল গাবা-২/২৩০
২. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ আল্লামাহ ইবনকাসীরেরর আস-সীরাতু আন-নাবাবীয়্যা-১/৫৯৮-৬০৪; সীরাতু ইবন হিশাম ২/১৬৯-১৭২; আল বিদায়া- ৪/৬৩; উদুসুল গাবা-২/২৩০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২০-৫২৫; আল ইসাবা-১/৫৬৫
৩. আস-সীরাতু আন নাবাবিয়্যা-১/৬০৩

কায়স ইবন সা'দ ইবন 'উবাদা (রা)

হযরত কায়সের (রা) একাধিক ডাকনাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমনঃ 'আবুল ফাদল, আবু 'আবদিল্লাহ্ ও আবু আবদিল মালিক। ইবন হিব্বান 'আবুল কাসেম নামটি উল্লেখ করেছেন।[১] মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের সায়িদা শাখার সম্মানিত সদস্য। একজন আনসারী সাহাবী খাযরাজ গোত্রের বিখ্যাত নেতা ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সা'দ ইবন উবাদা তাঁর পিতা এবং ফুকাইহা বিনতু 'উবাইদ ইবন দুলাইম মাতা। পিতা-মাতা ছিলেন পরস্পর চাচাতো ভাই-বোন।[২] তাঁর পূর্ব পুরুষের লোকেরা ছিলেন মদীনার বিখ্যাত জনসেবক ও শ্রেষ্ঠ নেতা। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিযরতের পূর্বে হযরত কায়স ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সকল যুদ্ধ ও অভিযানে হযরত কায়স অংশ গ্রহণ করেন।[৩] ইমাম যুহরী বলেন, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাবাহীদের অন্যতম।[৪] হিজরী ৮ম সনের 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধটি ছিল মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা। ৩০০ (তিনশো) সদস্যের এক বাহিনী নিয়ে, যার মধ্যে হযরত আবু বকর ও 'উমারও ছিলেন— আবু 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ সমুদ্র উপকূলের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে ১৫ (পনেরো) দিন অবস্থান করেন। সংগে নেওয়া খাদ্য-খাবার ফুরিয়ে যায়। গোটা বাহিনী প্রচন্ড খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হন। সৈনিকরা ক্ষুধার জ্বালায় গাছের ঝরা পাতা খেতে থাকেন। 'খাবাত' অর্থ ঝরা পাতা। যেহেতু এ বাহিনীর সৈনিকরা গাছের ঝরা পাতা খেয়েছিলেন, একারণে এই বাহিনী 'জায়শুল খাবাত' বা ঝরা পাতার বাহিনী নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে। হযরত কায়স এ দুঃসময়ে তিনটি করে উট ধার নিয়ে জবেহ করেন। তিনবার মোট নয়টি উট ধার নিয়ে জবেহ করে গোটা বাহিনীর বেঁচে থাকার মত খাবারের ব্যবস্থা করেন। অতিরিক্ত ধার দেনা হয়ে যাচ্ছে দেখে অধিনায়ক আবু 'উবায়দাহ (রা) তাঁকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।[৫] একটি বর্ণনায় এসেছে, 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত আবু বকর ও হযরত 'উমার (রা) তাঁর এমন বেপরোয়া উট জবেহ করা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, যদি এ যুবককে বিরত না রাখা হয় তাহলে সে তার পিতার সকল সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলবে। তারপর তাঁরা দু'জন বাহিনীর অন্য সদস্যদের বুঝিয়ে নিজেদের স্বপক্ষে এনে কায়সকে উট জবেহ থেকে নিবৃত করেন।[৬] যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে লোকেরা তাঁর এ আচরণের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ দানশীলতা অবশ্যই এ বাড়ীর এক বৈশিষ্ট্য।[৭]

মক্কা বিজয় অভিযানে তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কায় প্রবেশকালে আনসারদের ঝান্ডা প্রথমতঃ সা'দ ইবন উবাদার হাতে ছিল। এক পর্যায়ে রাসূল (সা) সেটি তার হাত থেকে নিয়ে কায়সের হাতে তুলে দেন।[৮]

বিভিন্ন যুদ্ধে ঝান্ডা বহনকারী ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশাতে খিলাফতের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এ সময় শাসন-শৃংখলার দায়িত্ব যে সকল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়, কায়স তাদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে কায়সের মর্যাদা ছিল কোন আমীরের দরবারে পুলিশের একজন সর্বাধিনায়কের মর্যাদার মত।[৯]

হযরত আলীর দরবারেও তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। ইবন ইউনুস বলেনঃ তিনি মিসর বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন এবং সেখানে বাড়ী তৈরী করেন। তারপর আলী (রা) তাঁকে মিসরের আমীর নিয়োগ করেন।[১০] হযরত মুয়াবিয়া (রা) নানাভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেও মিসরে কোন রকম হাঙ্গামা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে কুফাবাসীদের ক্ষেপিয়ে তুলে আলী (রা) দ্বারা তাঁকে বরখাস্ত করাতে সক্ষম হন। তাঁর স্থলে আলী (রা) মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে ওয়ালী নিয়োগ করেন। এ সম্পর্কে ইবন সীরীন বলেনঃ আলী (রা) কায়স ইবন সা'দকে হিজরী ৩৬ সনে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন এবং হিজরী ৩৭ সনে বরখাস্ত করেন। কারণ, আলীর (রা) বন্ধুরা তাঁকে এ কথা বুঝায় যে, কায়স মুয়াবিয়ার (রা) সাথে গোপন আঁতাত করেছে। যখন তাঁকে অপসারণ করে তার স্থলে মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে নিয়োগ করা হয় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, আলীকে (রা) বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এরপরেও আলীর (রা) সাথে তাঁর সদ্ভাব বজায় থাকে এবং সকল ব্যাপারে আলী (রা) তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।[১১] মিসর শাসন করা মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত আমীর মু'য়াবিয়া (রা) ও আমর ইবনুল 'আসের (রা) কর্ম-কৌশল অশান্তির এক প্রবাহ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে যা খিলাফতের বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।[১২]

হযরত কায়স (রা) মিসর থেকে সোজা মদীনায় চলে আসেন। মারওয়ান তখন মদীনায়। তিনি কায়সকে ভয় দেখালে তিনি মদীনা ছেড়ে কুফায় চলে যান এবং সেখানে হযরত আলীর (রা) সাথে বসবাস করতে থাকেন।[১৩]

আলীর (রা) সাথে সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সিফ্ফীন যুদ্ধের দিনগুলিতে তিনি আলীর (রা) বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন। এ যুদ্ধের দিনগুলিতে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন। তার দু'টি পংক্তি নিম্নরূপঃ[১৪]

এ সেই ঝান্ডা যা আমরা নবীর সাথে বহন
করেছি। তখন জিব্রাইল ছিলেন আমাদের সাহায্যকারী।
আমরা সেই জাতি, যখন তারা যুদ্ধ করে
তখন দেশ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত
তাদের তরবারি ধরা হাতটি প্রলম্বিত হতে থাকে।

এর পূর্বে তিনি উটের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তিনি নিজের গোত্রের সকল লোকের সাথে যোগদান করেন। এ যুদ্ধের শুরুতে হযরত আলী (রা) নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি আহবান জানানোর জন্য আবু আইউব

আল-আনসারী ও কায়সকে (রা) খারেজী সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান। আবদুল্লাহ্ ইবন সানজার খারেজীর সাথে তাঁদের আলোচনা হয়। তিনি বলেন, আলীর আনুগত্য ও অনুসরণ আমাদের মনপূত নয়। 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) মত কেউ হলে আমরা তাঁকে খলীফা বলে মানতে রাজী হতাম। জবাবে কায়স (রা) বললেন, আমাদের মধ্যে আলী ইবন আবী তালিব (রা) আছেন। আপনাদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ থাকলে তাঁর নাম পেশ করুন। তিনি বললেন, না, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। কায়স বললেন, তাহলে আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত। অশান্তি ও বিশৃংখলা আপনাদের অন্তরে শিকড় গেড়ে বসেছে।

হযরত কায়স (রা) সর্ব অবস্থায় আলীর (রা) একজন বিশ্বাসভাজন বন্ধু ছিলেন। হিঃ ৪০ সনে আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব ইমাম হাসানের (রা) ওপর অর্পিত হয়। হযরত কায়স (রা) ইমাম হাসানকে সমর্থন জানান। এদিকে আলীর (রা) শাহাদাতের খবর পেয়ে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) এক বাহিনী পাঠান। হযরত কায়স (রা) পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী, যাঁদের প্রত্যেকের মাথা ছিল মুড়ানো এবং যাঁরা মৃত্যুর জন্য শপথ করেছিল— নিয়ে মু'য়াবিয়ার (রা) সিরীয় সৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্য 'আনবার' পৌঁছেন। আমীর মু'য়াবিয়ার বাহিনী 'আনবার' অবরোধ করেন। এর মধ্যে ইমাম হাসান (রা) ও মু'য়াবিয়ার মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। ইমাম হাসান (রা) 'আনবার' শহরটি মু'য়াবিয়া (রা) বাহিনীর হাতে অর্পণ করে মাদায়েনে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার জন্য কায়সকে (রা) লেখেন।

ইমামের চিঠি পেয়ে হযরত কায়স দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর সকল সদস্যকে একত্র করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেনঃ তোমরা কী চাও? তোমাদের ইচ্ছা হলে আমি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমরণ লড়বো। আর তোমরা যদি চাও তাহালে আমি আমীর মু'য়াবিয়ার নিকট থেকে তোমাদের জন্য আমান বা নিরাপত্তার অঙ্গীকার নিতে পারি। সৈনিকেরা বললো, আপনি আমাদের জন্য নিরাপত্তার অঙ্গীকার নিন। তিনি তাই করেন এবং সহযোদ্ধাদের নিয়ে মাদায়েন চলে যান।

মাদায়েন থেকে হযরত কায়স (রা) মদীনার দিকে যাত্রা করেন। পথে মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত প্রতিদিন সঙ্গীদের জন্য একটি করে নিজের উট জবেহ্ করতেন। মদীনায় এসে তিনি সম্পূর্ণ নির্জন বাস অবলম্বন করেন এবং আমরণ একাগ্রচিত্তে আল্লাহর জিকর ও ইবাদাতে মশগুল থাকেন।[১৫]

খলীফা ইবন খাইয়্যাত, ওয়াকিদী ও আরো অনেকের মতে হযরত কায়স হিজরী ৬০ সনে হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের শেষ দিকে মদীনায় ইনতিকাল করেন। ইবন হিব্বানের মতে তিনি মু'য়াবিয়ার ভয়ে মদীনা থেকে সরে অন্যত্র পালিয়ে থাকেন এবং হিজরী ৮৫ সনে খলীফা আবদুল মালিকের সময় মারা যান। ইবন হাজার আসকালানীর মতে প্রথমোক্ত মতটি সর্বাধিক সঠিক।[১৬]

মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। মদীনার বহু অধিবাসী তাঁর কাছে আর্থিকভাবে ঋণী ছিল। এ কারণে ঋণগ্রস্তরা তাঁকে দেখতে আসতে লজ্জিত হচ্ছিলো। একথা বুঝতে পেরে তিনি ঘোষণা দেন, আমি আমার সকল পাওনা মাফ করে দিলাম। এ ঘোষণা ছড়িয়ে পড়তেই তাঁকে এক নজর দেখার জন্য জনতার মিছিল শুরু হয়ে যায়। লোকের প্রচন্ড ভিড়ে তার বাড়ীর সিঁড়িটি এক সময় ভেঙে পড়ে।

হযরত কায়সের (রা) এক ছেলের নাম ছিল 'আমের।[১৭] তিনি পিতা কায়সের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত কায়স ছিলেন স্থুলকায় ও দীর্ঘ দেহী। 'আমর ইবন দীনার বলেন ঃ তাঁর ছিল বিশাল একটি দেহ ও ছোট্ট একটি মাথা। এত লম্বা ছিলেন যে, গাধার পিঠে সওয়ার হলে পা মাটিতে গিয়ে ঠেকতো।[১৮] মুখে তাঁর কখনও দাড়ি গজায়নি। আনসাররা রসিকতা করে বলতো, নিজেদের পয়সায় আমরা কায়সের জন্য কিছু পশম কিনতে চাই।[১৯]

তিনি ছিলেন 'আলিম সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রচার ও প্রসার। জীবনের কোন পর্যায়ে তিনি এ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। মিসরের আমীর থাকা কালেও সেখানের মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন।[২০] হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়। এ সকল হাদীস তিনি সরাসরি রাসূল (সা), পিতা সা'দ ইবন 'উবাদা, 'আবদুল্লাহ ইবন হানজালা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বয়সে কায়সের চেয়ে ছোট।[২১] তিনি মোট ১৬ (ষোল)টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একথা বলেছেন 'আল্লামা যিরিক্‌লী।[২২]

হযরত কায়সের নিকট থেকে বহু লোক হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনাও করেছেন। এখানে তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ আনাস ইবন মালিক, সা'লাবা ইবন আবী মালিক, আবু মায়সারা, 'আবদুর রহমান ইবন আবীলায়লা, আবু 'আম্মার আজ-জাহাবী, গুরাইব ইবন হুমাইদ হামাদানী, আশ-শা'বী, 'আমর ইবন শুরাহবীল, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, মায়মূন ইবন আবী শায়ব, মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান ও আবু তামীম আল-জায্‌শানী।[২৩]

হযরত কায়স ছিলেন একজন বড় মাপের চিন্তাশীল মানুষ। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গেলে অনেক ভেবে-চিন্তে দিতেন। ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে ছিল একটা পরিচ্ছন্ন মুক্ত চিন্তার ছাপ। যেমন একবার এক ব্যক্তি তাঁকে সাদাকায়ে ফিতরার ব্যাপারে প্রশ্ন করে বসলো। তিনি বললেন, যাকাতের হুকুমের পূর্বে রাসূল (সা) সাদাকায়ে ফিতরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যাকাত ফরজ হওয়ার পর সাদাকায়ে ফিতরের নির্দেশও দেননি, আবার নিষেধও করেননি। পূর্ববর্তী নির্দেশের ভিত্তিতেই আমরা এখনও আদায় করছি।[২৪]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আখলাক ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দারুণ প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত, পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি অনীহা, তাকওয়া, দানশীলতা, চিন্তা ও অনুধ্যান, বীরত্ব ও সাহসিকতা, উদারতা, সকলকে সমানভাবে ভালোবাসা ইত্যাদি ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ মাধুর্য।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমাত ও সেবার সুযোগ পাওয়া ছিল দ্বীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য। সকল সাহাবী এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করতেন। হযরত কায়সও (রা) এ গৌরব ও সৌভাগ্যের একজন অধিকারী। মুসনাদে ইমাম আহমাদে এসেছে ঃ

"তাঁর পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সেবায় নিয়োগ করেন।[২৫] ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে মারয়াম ইবন আ'সয়াদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি কায়স ইবন সা'দকে দেখেছি। তিনি দশ বছর রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করেছেন।[২৬]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল তাঁর অপরিমিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা। একদিন রাসূল (সা) গেলেন সা'দ ইবন 'উবাদার গৃহে। ফেরার সময় হলে সা'দ নিজের একটি গাধা আনালেন এবং পিঠে একটি চাদর বিছালেন। রাসূল (সা) গাধাটির পিঠে চড়ে বসলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যাওয়ার জন্য সা'দ কায়সকে বললেন। রাসূল (সা) গাধার ওপরে, আর কায়স তার পাশে হাঁটতে শুরু করলেন। রাসূল (সা) তাঁকে পিছনে উঠে বসতে বললেন। কিন্তু তিনি ইতস্তত ভাব প্রকাশ করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ হয় আমার বাহনের পিঠে উঠে বস, নয়তো ফিরে যাও। রাসূলুল্লাহর (সা) পাশাপাশি বসা আদবের খিলাফ মনে করলেন। তাই ফিরে গেলেন।[২৭]

উদারতা ও দানশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক। আসমাউর রিজাল শাস্ত্রকারগণ তাঁর চিত্তের প্রশস্ততার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। ইবনুল আসীর বলেন ঃ[২৮]

"তিনি ছিলেন অন্যতম জ্ঞানী ও মর্যাদাবান সাহাবী এবং আরবের অন্যতম চালাক ও দানশীল ব্যক্তি।" এ উদারতা ও দানশীলতা ছিল একান্তই তাঁর স্বভাবগত। কিন্তু এ স্বভাব গঠনে দেশের পরিবেশ-প্রকৃতি, মাতা-পিতা ও খান্দানের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের যে বড় প্রভাব ছিল তা অনস্বীকার্য। 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে পিতার কাছে যখন সৈনিকদের অনাহার ও খাদ্যাভাবের কথা বর্ণনা করছিলেন তখন পিতা তাঁকে বললেন, তুমি উট জবেহ করে আহার করাতে পারতে। তিনি বললেন, আমি তো তাই করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের খাদ্যাভাবের কথা বর্ণনা করলে পিতা একই কথা বললেন এবং পুত্রও একই উত্তর দিলেন। এভাবে তৃতীয় পর্যায়ের অনাহারের কথা বর্ণনা করা হলে পিতা তাঁকে একই কথা বললেন। তখন তিনি অভিযোগের সুরে বললেন, আমি তো তাই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে বিরত রাখা হয়েছে।[২৯] জাবির থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ যুদ্ধে তিনি মোট নয়টি উট জবেহ করেছিলেন।[৩০]

এই 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধে হযরত আবুবকর ও হযরত 'উমার (রা) কায়সের (রা) উট জবেহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) কানে পৌঁছুলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ছুটে যান এবং তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে বলেন, ইবন আবু কুহাফা ও ইবন খাত্তাব (আবু বকর ও উ'মার) কেন আমার ছেলেকে কৃপণ বানাতে চেয়েছে— একথার জবাব আপনি দিন।[৩১]

যে পিতা এমন দরিয়া দিল, তাঁর পুত্র কেমন দানশীল হতে পারেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। উসুদুল গাবা গ্রন্থকার বলেন ঃ তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। দীর্ঘ হয়ে যাবে তাই উল্লেখ করলাম না।[৩২] রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দানশীলতা এ বাড়ীর এক বৈশিষ্ট্য।[৩৩] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে দানশীল পরিবারের সন্তান।[৩৪]

দারুকুতনী ইয়াহইয়া ইবন আবদিল আযীয হতে বর্ণনা করেছেন। সা'দ ইবন 'উবাদা ও তাঁর ছেলে কায়স এক বছর এক বছর করে পালাক্রমে যুদ্ধে যেতেন। একবার সা'দ যুদ্ধে গেলেন, কায়স থাকলেন বাড়ীতে। সা'দ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে খবর পেলেন, মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বহু অতিথি এসেছে। তিনি সাথীদের বললেন ঃ কায়স যদি আমার ছেলে হয় তাহলে সে আমার খাদিম 'নিসতাস'কে বলবে ঃ নিসতাস, ভান্ডারের চাবি দাও। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য খাদ্যদ্রব্য নেব। তখন নিসতাস বলবে ঃ তোমার পিতার অনুমতিপত্র দেখাও। কায়স তখন তার নাকে ঘুষি মেরে চাবি ছিনিয়ে নেবে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজন মত জিনিস বের করে নেবে। বর্ণনাকারী বলেন, বাস্তবেই এমনটি ঘটেছিল। সেবার কায়স রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য এক শো ওয়াসাক খাদ্য নিয়েছিলেন।[৩৫]

হযরত কায়সের দানশীলতার আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অসংগত হবে না। কুসাইর ইবন সাল্‌ত নামে এক ব্যক্তি আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নিকট ঋণী ছিলেন। আমীর মু'য়াবিয়া (রা) মারওয়ানকে লিখলেন, আপনি কুসাইরের বাড়ীটি খরিদ করুন। যদি সে বিক্রী করতে না চায় তাহলে আমার পাওনা টাকার তাগাদা দিন। টাকা দিয়ে দিলে ভালো, অন্যথায় তার বাড়ীটি বিক্রী করে দিন। কুসাইরকে ডেকে মারওয়ান বিষয়টি জানালেন এবং তাকে তিন দিন সময় দিলেন। বাড়ীটি বিক্রীর ইচ্ছা কুসাইরের ছিলনা। তিনি টাকা দিয়ে দেওয়ারই চিন্তা করলেন। কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকার ঘাটতি দেখা দিল। এ অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন তা নিয়ে দারুণ ভাবনায় পড়লেন। হঠাৎ তাঁর কায়সের (রা) কথা স্মরণ হলো। তিনি কায়সের বাড়ী গিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা ধার চাইলেন। কায়স টাকা ধার দিলেন। কুসাইর টাকা নিয়ে মারওয়ানের নিকট উপস্থিত হলে সব কথা শুনে তাঁর অন্তরে দয়া হলো। তিনি বাড়ী ও টাকা সবই তাঁকে ফেরত দিলেন। কুসাইর সেখান থেকে উঠে কায়সের নিকট গেলেন এবং তাঁকে ত্রিশ হাজার টাকা ফেরত দিলেন। কায়স- যা আমি একবার কাউকে দিই তা আর ফেরত নিইনা— একথা বলে টাকার বান্ডিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।[৩৬]

একবার এক বৃদ্ধা কায়সের (রা) নিকট এসে তার চরম দারিদ্র ও অভাবের কথা জানিয়ে বললো, এখন আমার ঘরে কোন খাদ্য-খাবার নেই। কায়স বললেন, আপনি বাড়ী ফিরে যান। এখনই আপনার ঘরে শুধু খাবার বস্তু দেখতে পাবেন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধার বাড়ীটি তেল, আটা, ঘি, গোশ্‌ত, খেজুর ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ভরে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৩৭] জুয়াইরিয়া ইবন আসমা বলেন, কায়স তাদেরকে ঋণ দিতেন ও আহার করাতেন।[৩৮]

তাঁর পিতা হযরত সা'দের (রা) ছিল বিপুল বিষয়-সম্পত্তি। সা'দ (রা) সিরিয়া চলে যাওয়ার সময় যাবতীয় সম্পদ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্টন করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আর একটি ছেলের জন্ম হয়। তার জন্য কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না। আবু বকর ও 'উমার (রা) উভয়ে কায়সকে তাঁর পিতার বন্টন বাতিল করে নতুন করে সকল সম্পদ বন্টন করার পরামর্শ দিলেন। কায়স বললেন, আমার পিতা যেভাবে বন্টন করে গেছেন সেভাবেই থাকবে। তবে আমার অংশটি আমি তাকে দিলাম।[৩৯]

হযরত কায়স (রা) আল্লাহর কাছে সম্পদের প্রাচুর্য চাইতেন। তিনি একথা বিশ্বাস করতেন, ভালো কিছু করতে হলে সম্পদের প্রয়োজন হয়। সম্পদ ছাড়া কিছুই হয় না। তাই তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন ঃ 'হে আল্লাহ, আমাকে সম্পদ দান করুন। কারণ, সম্পদ ছাড়া কোন কাজ হয় না।[৪০]

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রাজনৈতিক কূট-কৌশলে তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম সেরা ব্যক্তি। ইবন শিহাব বলেন ঃ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সময়ে গোটা আরবে কূটচাল ও কৌশলী হিসেবে খ্যাত ছিলেন পাঁচ ব্যক্তি। তারা হলেন ঃ মু'য়াবিয়া, 'আমর ইবনুল 'আস, কায়স, মুগীরা ও 'আবদুল্লাহ ইবন বুদাইল। তাঁদের মধ্যে কায়স ও বুদাইল ছিলেন আলীর (রা) সাথে।[৪১]

তাঁর বুদ্ধি ও চাতুর্য এমন ছিল যে, যতদিন তিনি মিসরের ওয়ালী ছিলেন ততদিন সেখানে আমীর মু'য়াবিয়া ও 'আমর ইবনুল 'আসের (রা) যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল সফল হতে দেননি। তিনি বলতেন ঃ যদি ইসলাম না আসতো তাহলে আমি এমন ধোঁকাবাজি করতাম যে সমগ্র আরববাসীকে অক্ষম করে ছাড়তাম।[৪২] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'প্রতারক ও ধোঁকাবাজ দোযখী'— রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী যদি আমি না শুনতাম তা হলে আমি হতাম এ উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধোঁকাবাজ।[৪৩] ইমাম যুহরী বলেছেন, তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধূর্ত লোকদের একজন।[৪৪] তাঁর সমকালীন লোকেরা বলেছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, অব্যর্থ কৌশল অবলম্বনকারী, সাহসী ও বিচক্ষণ যোদ্ধা।[৪৫]

হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের সময়কালে খিলাফতের চতুর্দিকে যখন চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজমান তখন একদিন হাবীব ইবন মাসলামা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি এই ঘোড়ার পিঠে চড়ুন। এই বলে তিনি নিজের আসন থেকে একটু সরে তাঁকে সামনে বসার স্থান করে দেন। 'রাসূল

(সা) বলেছেন, বাহনের পিঠে সামনের দিকে মালিকের বসা উচিত'— একথা বলে তিনি সামনে বসতে অস্বীকার করেন। হাবীব বললেন, একথা আমিও জানি। তবে আপনাকে পিছনে বসিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনে।[৪৬]

হযরত কায়স (রা) ছিলেন একজন উদার ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি। এটা তাঁর জীবনের বিভিন্ন আচরণে ফুটে উঠেছে। একবার কাদেসিয়ায় সাহল ইবন হুনাইফের সাথে বসে আছেন। এমন সময় সামনে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যেতে দেখলেন। মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী তক্ষুণি মৃত ব্যক্তির সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা বললো, আপনি অহেতুক দাঁড়িয়ে গেছেন। মৃত ব্যক্তিটি তো একজন জিম্মী। কায়স (রা) বললেন, রাসূলও (সা) এক ইহুদীর লাশ দেখে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মৃত ব্যক্তিটি একজন ইহুদী— একথা বলা হলে তিনি বলেছিলেন, কোন ক্ষতি নেই। সেও তো একটি প্রাণী।[৪৭]

হযরত কায়স (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম। রাসূল (সা) তাঁকে খুবই আদর ও স্নেহ করতেন। আদর করে তাঁকে অনেক কিছু শিখাতেন। কায়স বলেন, একদিন আমি দু'রাকা'য়াত নামায শেষ করেছি। এমন সময় রাসূল (সা) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় পা দিয়ে আমাকে মৃদু আঘাত করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি প্রবেশ পথ বলে দেব না? বললাম ঃ জ্বী, বলে দিন। বললেন ঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ"।[৪৮]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বহুবার কায়সের পিতা সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) ও তাঁর বংশধরদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন। একবার বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সা'দ ইবন 'উবাদা ও তার পরিবার-পরিজনদের ওপর দয়া ও করুণা বর্ষণ করুন।[৪৯]

হযরত কায়সের (রা) মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি এমন রূপ ধারণ করে যে, হযরত হাসানের (রা) খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর একেবারেই নির্জনবাস অবলম্বন করেন। এরপর বেশীর ভাগ সময় ইবাদাত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করেন। তিনি সব সময় ফরজ ইবাদাত সমূহ যথাযথভাবে আদায়ের পর নফল ইবাদাত সমূহও অতি নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করতেন। 'আশূরা দিনের রোযা নফল। রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে সকল সাহাবী এ রোযা রাখতেন। রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পর এর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তা সত্ত্বেও হযরত কায়স সব সময় আশূরার রোযা রাখতেন।[৫০]

হযরত কায়স (রা) ছিলেন হযরত আলীর (রা) সমর্থক। আলী (রা) এবং তাঁর পরে হাসানকে (রা) তিনি খিলাফতের ব্যাপারে সত্যপন্থী মনে করতেন। তাই হাসান যখন মু'য়াবিয়ার (রা) সাথে চুক্তি করে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান তখন তিনি দারুণ মনঃক্ষুণ্ন হন। এরপর তিনি রাজনীতির ময়দান থেকে সরে গিয়ে নির্জনবাস অবলম্বন করেন। তা সত্ত্বেও তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছেন বলে

মনে হয় না। তাঁর বিভিন্ন কথা ও কাজ একথা প্রমাণ করে। এখানে একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করছি যা বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

একবার রোমান সম্রাট আমীর মু'য়াবিয়াকে আরব দেশের দীর্ঘতম ব্যক্তির একটি পায়জামা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠান। মু'য়াবিয়া (রা) কায়সকে (রা) ডাকিয়ে বলেন, আমার শুধু আপনার একটা পায়জামার প্রয়োজন। তিনি সাথে সাথে উঠে এক কোণে নির্জনে গিয়ে পরনের পায়জামাটা খুলে হাতে করে নিয়ে এসে মু'য়াবিয়ার দিকে ছুড়ে মারেন। মু'য়াবিয়া বলেন আপনি ঘরে ফিরে গিয়েও তো পাঠিয়ে দিতে পারতেন। হযরত কায়স (রা) তখন কবিতায় মু'য়াবিয়ার (রা) কথার জবাব দেন। তাতে তাঁর প্রবল আবেগ, আকুতি ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে সেই কবিতার কয়েকটি চরণ সংকলিত হয়েছে। তার কয়েকটি চরণের অর্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আমি এখনি পায়জামা এ জন্য দিয়েছি যে, লোকে জানুক এটা কায়সের পায়জামা, আর কায়জারের প্রতিনিধিরা সাক্ষী থাকুক।

২. তারা যাতে বলতে না পারে যে, কায়স রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং এ একটি সাধারণ পায়জামা।

৩. আমি তো ইয়ামনী গোত্রের একজন নেতা। আর মানুষ তো দু'প্রকারেরই হয়—নেতা ও অনুসারী।

৪. আমার মত মানুষ তাদের জন্য ভীতিকর। তবে আমার স্বভাব ও চরিত্র মানুষের মধ্যে প্রসারিত।

অতঃপর মু'য়াবিয়া (রা) তাঁর বাহিনীর দীর্ঘতম ব্যক্তিকে বলেন সেটি পরতে। সে পায়জামাটি তার নাকের ওপর ধরলে তা মাটিতে গিয়ে পড়ে।[৫১] ইবনুল আসীর, আবু 'আমরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মু'য়াবিয়ার দরবারে কায়সের পায়জামা বিষয়ক যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই।[৫২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৩; আল-ইসাবা-৩/২৪৯
২. উসুদুল গাবা-৪/২১৫; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/৩১১
৩. আল-ইসাবা-৩/২৪৯
৪. তারীখুল ইসলাম-২/৩১২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৫. বুখারী-২/৬২৫, ৬২৬; আল-বিদায়া-৪/২৭৬; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৪০
৬. উসুদুল গাবা-৪/২১৫; তারীখুল ইসলাম-২/৩১২
৭. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; আল-ইসতী'য়াব-২/৫৩৯
৮. আল-ইসতী'য়াব-২/৫৩৯; আল-ইসাবা-৩/২৪৯
৯. সহীহ বুখারী-২/১০৫৯; তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৩ আল-আ'লাম-৫/২০৬
১০. আল-ইসাবা-৩/২৪৯
১১. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/৩১২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫

১২. আল-ইসাবা-৩/২৪৯; উসুদুল গাবা-৪/২১৫
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. উসুদুল গাবা-৪/২১৫
১৫. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/৩১২
১৬. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; আল-ইসাবা-৩/২৪৯; আল-আ'লাম-৫/২০৬
১৭. মুসনাদ-৩/৪২২
১৮. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; তারীখুল ইসলাম-২/৩১২
১৯. উসুদুল গাবা-৪/২১৫; আল-ইসাবা-৩/২৪৯
২০. মুসনাদ-২/৪২২
২১. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪
২২. আল-আ'লাম-৫/২০১
২৩. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; আল-ইসাবা-৩/২৪৯; তারীখুল ইসলাম-২/৩১২
২৪. মুসনাদ-৬/৬
২৫. মুসনাদ-৩/৪২২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-৩/১০৪
২৬. আল-ইসাবা-৩/২২৯
২৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৫১৫
২৮. উসুদুল গাবা-৪/২১৫
২৯. সহীহ বুখারী-৩/৬২৬
৩০. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; আল-বিদায়া-৪/২৭৬
৩১. তারীখুল ইসলাম-২/৩১২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৩২. উসুদুল গাবা-৪/৩১৬
৩৩. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; হায়াতুস সাহাবা-২/২০৮
৩৪. হায়াতুস সাহাবা-২/২০৯
৩৫. আল-ইসাবা-৩/৫৫৩; হায়াতুস সাহাবা-২/২০০
৩৬. আল-ইসতী'য়াব-২/৫৩৯; আল-ইসাবা-৩/২৪৯
৩৭. তারীখুল ইসলাম-২/৩১২
৩৮. প্রাগুক্ত-২/৩১৩
৩৯. আল-ইসতী'য়াব-২/৫৩৯
৪০. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪
৪১. উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৪২. আল-ইসাবা-৩/২৪৯
৪৩. তারীখুল ইসলাম-২/৩১২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৪৪. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪
৪৫. উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৪৬. মুসনাদ-৩/৪২২
৪৭. প্রাগুক্ত-৬/৬
৪৮. আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব-৩/১০৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৯৮
৪৯. হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৬
৫০. মুসনাদ-৩/৪২২
৫১. তারীখুল ইসলাম-২/৩১৩
৫২. উসুদুল গাবা--৪/২১৫

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারাম (রা)

নাম আবু জাবির 'আবদুল্লাহ। পিতা 'আমর ইবন হারাম এবং মাতা আর-রাবাব বিনতু কায়স। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সুলামা শাখার সন্তান।[১] রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীস বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবিরের (রা) গর্বিত পিতা। বনু সুলামার একজন সম্মানিত নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি একজন 'আকাবী, বদরী ও উহুদের শহীদ।[২] বালাজুরী বলেন ঃ তিনি একজন আকাবী, বদরী ও নাকীব।[৩]

ইসলাম-পূর্ব সময়ের আরবের লোকেরা মক্কার কা'বায় গিয়ে হজ্জ ও 'উমরা আদায় করতো। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জ মওসুমে ইয়াসরিববাসীদের পাঁচ শো সদস্যের একটি বিরাট কাফিলা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় যায়। তখন পর্যন্ত ইয়াসরিবে মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের (রা) হাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারীরা ছাড়াও অনেক পৌত্তলিক এ কাফেলায় ছিল। আবদুল্লাহও ছিলেন এ কাফিলার একজন সদস্য। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।[৪] এ সফরে তাঁর ছেলে জাবিরও মুসলমান অবস্থায় অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আনসারী সাহাবী কা'ব ইবন মালিক বলেন ঃ[৫] "আমরা ইয়াসরিব থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মক্কায় পৌঁছে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আকাবা উপত্যকায় মিলিত হওয়ার কথা পাকাপাকি করলাম। হজ্জ শেষ করলাম এবং সাক্ষাতের নির্ধারিত রাতটিও এসে গেল। আমাদের সংগে ছিলেন আবু জাবির আবদুল্লাহ ইবন আমর। তিনি একজন নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁকেও আমরা সফরসঙ্গী করেছিলাম। পৌত্তলিক সফরসঙ্গীদের কাছে আমরা আমাদের প্লান-পরিকল্পনা গোপন রাখতাম। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কিছু আগে আমরা তাঁকে বললাম ঃ 'আবু জাবির! আপনি আমাদের একজন নেতা। আপনি একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। যে বিশ্বাস নিয়ে আপনি আছেন, তার ওপর মারা গেলে কালই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবেন। এভাবে এক পর্যায়ে আমরা তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আকাবায় নির্ধারিত সাক্ষাতের সময়ের কথাও জানালাম। তিনি তক্ষুণি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমাদের সাথে 'আকাবার বা'ইয়াতে শরীক হন। রাসূল (সা) তাঁকে বনু সুলামার নাকীব বা দায়িত্বশীল মনোনীত করেন।"

বালাজুরী বলেন ঃ[৬] তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের পরনের অপবিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে আল-বারা' ইবন মা'রূরের দেওয়া দু'খানি কাপড় পরেন। আকাবার এই শেষ শপথে তাঁরা পিতা-পুত্র অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন। 'আবদুল্লাহ বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। হিজরী তৃতীয় সনের উহুদ যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং শাহাদাতের অনন্ত গৌরবের অধিকারী হন। এটা হিজরাতের বত্রিশ মাসের মাথায় শাওয়াল মাসের ঘটনা।[৭]

উহুদ যুদ্ধে মুনাফিকদের (কপট মুসলমান) সরদার আবদুল্লাহ ইবন উবাই মদীনার বাইরে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করা ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে। রাসূল (সা) উহুদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে সে তার সমর্থকদের নিকট এসে বলে ঃ 'তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করে তাঁর ছোকরাদের কথা শুনলেন। আমরা জানিনে, কিসের জন্য আমাদের জীবন বিপন্ন করবো।'— এই বলে সে তার তিন শো সঙ্গীসহ ফিরে চললো।

এ সময় আবদুল্লাহ ইবন 'আমর কিছু মুসলমান সঙ্গীকে নিয়ে তার সাথে দেখা করে বলেন ঃ 'তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমাদের লজ্জা করে না? তোমাদের নারীদের এবং তোমাদের আবাসভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর।' বিশেষতঃ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে ভীষণ তিরস্কার ও গালমন্দ করে বলেন ঃ 'আল্লাহর নামে আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায় ও নবীকে এভাবে শত্রুর সামনে ছেড়ে দিয়ে অপমান করোনা।' উত্তরে তারা বলে ঃ 'আমরা যদি যুদ্ধে পারদর্শী হতাম, তোমাদের সাথে যেতাম। এভাবে তোমাদেরকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করতাম না।' যখন তারা রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে কোনভাবেই রাজী হলো না তখন তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ তার শত্রুদের দূর করে দিন। তোমাদের হাত থেকে আল্লাহ তাঁর নবীকে রক্ষার জন্য একাই যথেষ্ট।' এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আলে ইমরানের ১৬৭ নং আয়াতটি নাযিল করেন[৮]

উহুদ যুদ্ধের আগের দিন রাতে তিনি ছেলে জাবিরকে ডেকে বললেন ঃ বাবা, আগামীকালের প্রথম শহীদ আমি হতে চাই। রাসূলুল্লাহর (সা) পরে তুমিই আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আমি তোমাকে বাড়িতে রেখে যাচ্ছি। তোমার বোনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং আমার যে ঋণ আছে তা পরিশোধ করবে।[৯]

দিনের বেলা তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবদুল্লাহ দারুণ সাহসের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। তিনিই হলেন দিনের প্রথম শহীদ।[১০] উসামা ইবন 'উনাইদ তাঁকে হত্যা করে।[১১] বালাজুরী হত্যাকারী হিসেবে সুফইয়ান ইবন 'আবদি শাম্‌স আস-সুলামীর নাম উল্লেখ করেছেন।[১২] পৌত্তলিকরা তাঁর লাশ কেটেকুটে একেবারে বিকৃত করে ফেলে।

ছেলে জাবির বলেন ঃ আমার পিতার শাহাদাতের খবর শুনে ছুটে এসে দেখলাম, লাশ একটি চাদর দিয়ে ঢাকা। আমি মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে মুখে চুমু দিতে লাগলাম। রাসূল (সা) দেখলেন কিন্তু নিষেধ করলেন না। আমি কাঁদতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা নিষেধ করতে লাগলেন; কিন্তু রাসূল (সা) নিষেধ করলেন না। আমার ফুফু ফাতিমা বিনতু 'আমর কাঁদতে লাগলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কাঁদ বা না কাঁদ লাশটি তোমরা উঠিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশতারা ডানা দিয়ে তাঁকে ছায়া দিতে থাকবে। ফাতিমা এক চিৎকার দিয়ে ওঠেন। 'এটা কার চিৎকার'— রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন। উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ আবদুল্লাহর বোনের।[১৩]

তাঁকে উহুদে দাফন করা হয়। উহুদের শহীদদেরকে দু'জন অথবা তিনজন করে এক

কবরে দাফন করা হয়।[১৪] জাবির বলেনঃ উহুদের শহীদ আমার পিতা ও মামার লাশ মদীনায় আনা হচ্ছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘোষণা— শহীদদেরকে শাহাদাতের স্থলেই দাফন করা হবে— শুনে তাঁদেরকে আবার উহুদে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়। মালিক ইবন আনাস বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ও 'আমর ইবন আল–জামুহকে একই কাফনে ও একই কবরে দাফন করা হয়।[১৫] বুখারীর বর্ণনায় মামার স্থলে চাচা বর্ণিত হয়েছে।[১৬] আসলে 'আমর ইবন আল-জামূহ আবদুল্লাহর ভাই নন; বরং ভগ্নিপতি।[১৭] বনু সুলামার এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সূত্রে ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন ঃ উহুদের লাশ দাফনের সময় রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমরা 'আমর ইবন আল-জামূহ ও আবদুল্লাহ ইবন হারামের দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। তারা দু'জন দুনিয়াতে ছিল অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁদেরকে একই কবরে দাফন করবে।[১৮]

দাফনের ছয় মাস পর হযরত জাবির পিতার লাশটি কবর থেকে তুলে অন্য একটি কবরে দাফন করেন। তখন কেবল কান ছাড়া গোটা দেহ এমন অক্ষত ছিল যে, মনে হচ্ছিলো কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।[১৯] এর ৪৬ বছর পর লাশটি আবার কবর থেকে তোলা হয়। জাবির বর্ণনা করেছেন। কবরটি ছিল একটি পানির নালার ধারে। একবার প্লাবনের সময় তাতে পানি প্রবেশ করে। কবরটি খোড়া হয়। দেখা গেল, আবদুল্লাহর মুখে, যেখানে আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর একটি হাত সেই ক্ষতের ওপর। হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। হাতটি আবার সেখানে রেখে দিলে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল। জাবির বলেন ঃ 'আমি দেখলাম আমার পিতা যেন কবরে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর দেহে কম-বেশী কোন রকম পরিবর্তন হয়নি। জাবিরকে প্রশ্ন করা হলো ঃ তাঁর কাফনটি কেমন ছিল? বললেন ঃ কাফনেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। একই অবস্থায় ছিল। অথচ এর মধ্যে ৪৬টি (ছেচল্লিশ) বছর চলে গেছে।

জাবির (রা) পিতার মৃত দেহে কিছু সুগন্ধি লাগানোর পরামর্শ চাইলে সাহাবীরা অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন ঃ তাঁদের ব্যাপারে নতুন করে আর কিছুই করবে না। তারপর অন্য এক স্থানে দাফন করা হয়।[২০]

হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) মৃত্যুকালে ছেলে হযরত জাবির (রা) ছাড়া আরো নয়জন মেয়ে রেখে যান। তাদের মধ্যে ছয়জন ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক।[২১] তিনি অনেক ঋণের বোঝা রেখে যান। সহীহ বুখারীতে এর বিবরণ এসেছে। এসব ঋণ হযরত জাবির (রা) পরিশোধ করেন। হযরত জাবিরের (রা) জীবনীতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[২২] জাবির বলেন ঃ আমার পিতা অনেক দেনা রেখে যান। মৃত্যুর পর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললাম ঃ আমার বাবা অনেক দেনা করে গেছেন। কিছু খেজুর আছে। আপনি চলুন যাতে পাওনাদাররা সব নিয়ে না যায়। রাসূল (সা) গেলেন এবং খেজুরের স্তূপের ওপর বসে পাওনাদারদেরকে ডেকে ডেকে তাদের পাওনা পরিশোধ করেন। তার পরেও সমপরিমাণ খেজুর থেকে যায়।[২৩]

হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন অতি সম্মানিত ও অতি উঁচু মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের একজন। বনু সুলামা গোত্রে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি যে চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর রাহে যেভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেন, খোদ রাসূলে কারীম (সা) তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুনানু নাসাঈ গ্রন্থে এসেছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ গোটা আনসার সম্প্রদায়কে আমাদের পক্ষ থেকে ভালো প্রতিদান দিন, বিশেষ করে 'আমর ইবন হারামের বংশধর (আবদুল্লাহ ও তাঁর সন্তান) ও সা'দ ইবন 'উবাদাকে।[২৪]

জামে' তিরমিজী গ্রন্থে এসেছে। উহুদের ঘটনার পর একবার রাসূল (সা) জাবিরকে মলিন ও বিমর্ষ দেখে প্রশ্ন করলেনঃ কি হয়েছে?

জবাব দিলেন ঃ আব্বা শহীদ হয়েছেন এবং অনেকগুলি সন্তান রেখে গেছেন। তাদেরই চিন্তা আমাকে সর্বক্ষণ অস্থির করে রেখেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ একটি সুসংবাদ শোন,আল্লাহ আড়াল ছাড়া কারো সাথে সামনা-সামনি কথা বলেন না। কিন্তু তিনি তোমার আব্বার সাথে সামনা-সামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন 'আমর! তুমি কি পছন্দ কর? জবাবে তোমার আব্বা বলেছেন, আমার পছন্দ এই যে, আমি আবার পৃথিবীতে ফিরে যাই এবং আপনার রাস্তায় জিহাদ করে আবার শহীদ হই।[২৫] আল্লাহ বলেছেন, এ হয়না। পৃথিবী থেকে যে একবার আসে সে আর ফিরে যেতে পারে না। তখন তিনি বলেছেন, তাহলে আমার সম্পর্কে কিছু ওহী পাঠান। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

—যারা আল্লাহর পথে জীবন দেয় তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা আল্লাহর নিকট জীবিত। যাদেরকে আহার দেওয়া হয়।[২৬]

হযরত আবদুল্লাহর (রা) এর চেয়ে বড় গৌরব অহঙ্কারের আর কি আছে যে, আজ চৌদ্দ শো বছর পরেও আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। হয়তো আরো হাজার হাজার বছর পরেও এভাবে মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত ঃ ৩/৫৬১
২. আল-ইসাবা-২/৩৫০; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪৪, ৬৬৩, ৬৯৭
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮
৪. প্রাগুক্ত-১/২৪৯
৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪১
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮
৭. তাবাকাত-৩/৫৬১
৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৫; ইবন হিশাম-২/৬৪
৯. বুখারী-১/১৮০; তাবাকাত-৩/৫৬৪
১০. বুখারী-১/১৮০
১১. উসুদুল গাবা-৩/২৩৩

১২. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৩
১৩. বুখারী-১/১৬৬; ১৭২; মুসলিম-২/২৪৭; তাবাকাত-৩/৫৬১; আল-ইসাবা-২/৩৫০.
১৪. ইবন হিশাম-২/৯৮
১৫. তাবাকাত-৩/৫৬২
১৬. বুখারী-১/১৭৯
১৭. উসুদুল গাবা-৩/২৩২
১৮. ইবন হিশাম-২/৯৮,১২৬
১৯. বুখারী-১/১৮০
২০. তাবাকাত-৩/৫৬২, ৫৬৩; আল-ইসাবা-২/৩৫০
২১. বুখারী-১/১৮০
২২. দ্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩য় খন্ড।
২৩. তাবাকাত-৩/৫৭৪
২৪. আল-ইসাবা-২/৩৫০; সীয়ারুল আনসার-২/৭২
২৫. ইবন হিশাম-২/১২০
২৬. আল-ইসাবা-২/৩৫০

'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূল (রা)

'আবদুল্লাহ (রা) মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 'হুবলা' শাখার সন্তান। খান্দানটি খুবই সম্মানিত। এই খান্দানের উর্ধতন এক ব্যক্তি ছিলেন সালেম। তাঁর উপাধি ছিল 'হুবলা'। আর সেখান থেকেই এই খান্দানের নাম হয়েছে 'হুবলা'। সালেমের পেটটি ছিল খুব মোটা। এই কারণে লোকে তাঁকে 'হুবলা' বলতো। পরবর্তীকালে তাই তাঁর খান্দানের নামে পরিণত হয়।[১] 'আবদুল্লাহর (রা) মাতার নাম খাওলা বিনৃত আল-মুনজির। তিনি বনু নাজ্জার খান্দানের বনু মাগালা শাখার সন্তান।[২]

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহর (রা) পিতা 'রয়িসুল মুনাফিকীন' (মুনাফিকদের নেতা) 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূল। এই মুনাফিক নেতা ইতিহাসে ইবন উবাই ইবন সালূল নামে প্রসিদ্ধ। জাহিলী মদীনার খাযরাজ গোত্রের সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থের প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, ইসলাম-পূর্ব মদীনার অধিবাসীরা তাকেই তাদের রাজা বানানোর চিন্তা-ভাবনা করছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও তাকে রাজা করার ব্যাপারে কারো দ্বিমত ছিল না। এমন পিতারই ছেলে আবদুল্লাহ (রা)।[৩]

আবদুল্লাহর (রা) পিতা এই ইবন উবাই ইবন সালূল। সে বড় জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও কূটকৌশলী ছিল। তাসত্ত্বেও ঈমানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। রাসূলেকারীম (সা) মদীনায় এসে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করলে ঈর্ষা ও শত্রুতার এক বিস্ময়কর দৃশ্য তার মধ্যে দেখা যায়। ইবন উবাই ও তার অনুসারী মদীনার কিছু লোক ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিকে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মদীনার মাটি থেকে উৎখাতের জন্য একের পর এক নানা রকম ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে।

অবশেষে মুসলমানদের বিজয় ও শক্তির কাছে ইবন উবাই ও তার অনুসারীদেরকে বাহ্যতঃ মাথা নত করতে হয়। তারা কপটতার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের দলে ভিড়ে যায়। তার এই দলটির সদস্যরা মুনাফিক (কপট মুসলমান) এবং সে মুনাফিকদের নেতা হিসাবে ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যত মুনাফিক জন্মাবে তাদের নেতা এই ইবন উবাই ইবন সালূল। হিজরাতের পর মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) ওপর যত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ইবন উবাই ও তার দলবল কোন না কোনভাবে জড়িত ছিল। তার ও তার দলের কীর্তি-কলাপের বর্ণনায় কুরআনের বহু

আয়াত নাযিল হয়েছে। সূরা 'আল-মুনাফিকুন' তো তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ।[৪]

কথায় বলে ফির'আউনের ঘরে মূসা বা যেখানে ফির'আউন সেখানে মূসা। এক্ষেত্রেও তাই; এহেন কট্টর ইসলামের দুশমন ও চরম মুনাফিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন মহান সাহাবী 'আবদুল্লাহ (রা)। পিতার নাপাক আছর থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। এতবড় বুদ্ধিমান পিতা নিজের ছেলের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি।

এই মুনাফিক ইবন উবাই তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত সাধু আবু 'আমের আর-রাহিব-এর খালাতো ভাই। রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবের যে সকল সাধু পুরুষ তাঁর শীঘ্র আগমনের কথা বলতেন এবং তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন, এই আবু 'আমের তাঁদের একজন। জাহিলী আমলে তিনি পার্থিব ভোগ-বিমুখ সন্যাস ও বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন রাসূল (সা) নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তিনি স্বীয় বিশ্বাস থেকে সরে গেলেন। বদরে তিনি মুশরিকদের সাথে একাত্ম হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। এ কারণে রাসূল (সা) তাঁকে 'আল-ফাসেক' (পাপাচারী) অভিধায় চিহ্নিত করলেন।[৫]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার আগেই আবদুল্লাহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম-পূর্ব নাম ছিল আ-হুবাব। 'উরওয়া বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ছিল কারো খারাপ নাম শুনলে তা পরিবর্তন করে দেওয়া। একদিন তিনি আল-হুবাবকে বললেন ঃ এখন থেকে তোমার নাম হবে আবদুল্লাহ। কারণ, আল-হুবাব হচ্ছে শয়তানের নাম।[৬] এভাবে পিতা-পুত্রের নাম এক হয়ে যায়।

'আবদুল্লাহ (রা) একজন বদরী সাহাবী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদরে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তাঁর যোগদানের কথা জানা যায়।[৭] তিনি উহুদেও যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর সামনের দুটি দাঁত শহীদ হয়। যুদ্ধের পর রাসূল (সা) তাঁকে বলেন, তুমি দুটি সোনার দাঁত বানিয়ে লও। একথা 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবন মুন্দাহ উল্লেখ করেছেন যে, দাঁত নয়, বরং তাঁর নাক বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি সোনার একটি নাক প্রতিস্থাপন করেন। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়।[৮]

আবু সুফইয়ান উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে একটি পাহাড়ের ওপর উঠে চিৎকার করে বলে ঃ আগামী বছর বদরে আবার তোমাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রইলো। এ ঘোষণা শুনে রাসূল (সা) একজন সাহাবীকে বললেন ঃ তুমি বল, হাঁ, সেখানেই তোমাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলাম।[৯] ইবন ইসহাক বলেন ঃ আবু সুফইয়ানের সাথে এ অঙ্গীকার রক্ষার জন্য রাসূল (সা) হিজরী চতুর্থ সনের শা'বান মাসে দ্বিতীয়বার বদরে উপস্থিত হন। ইতিহাসে যা 'বদর আল-আখেরাহ' নামে পরিচিত। ইবন হিশাম বলেন ঃ এ যাত্রায় রাসূল (সা) তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধি হিসেবে 'আবদুল্লাহকে (রা) মদীনায় রেখে যান।[১০]

বনু আল-মুসতালিক মতান্তরে তাবুক যুদ্ধের এক পর্যায়ে উট-ঘোড়ার পানি পান

করানোকে কেন্দ্র করে একজন আনসার ও একজন মুহাজির ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়। এ ঝগড়ার এক পর্যায়ে মুনাফিক ইবন উবাই রাসূল (সা) ও মুহাজিরদের প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করে— 'মদীনায় পৌঁছাতে পারলে আমরা অভিজাতরা এই ইতরদেরকে বের করে দেব।'[১১] একথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেলে এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। 'উমার (রা) তো রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এসে বলেই ফেললেন ঃ যদি অনুমতি দান করেন তো এই মুনাফিকের 'মাথাটা ধর থেকে আলাদা করে ফেলি।' রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ 'বাদ দাও। তা করলে লোকে বলবে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের হত্যা করে।'[১২]

আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর বহু পরীক্ষিত মুহাজির সঙ্গী-সহচরদের সম্পর্কে উচ্চারিত ইবন উবাইর মহাআপত্তিকর মন্তব্যটি এক সময় ছেলে আবদুল্লাহর (রা) কানে গেল। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির হয়ে বললেন, আমার পিতা আপনাকে 'ইতর' বলে গালি দিয়েছেন। আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আপনি নন, তিনিই ইতর। তারপর যে কথাটি তিনি বললেন তা অতি চমকপ্রদ ও বড় বিস্ময়কর। বললেন, গোটা খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার চেয়ে বেশী পিতার বাধ্য ও অনুগত ছেলে দ্বিতীয়টি নেই। তবুও আপনি যদি তাঁকে হত্যা করাতে চান তো আমাকে হুকুম দিন। আমি তার মাথাটি আপনার নিকট হাজির করছি। কিন্তু অন্য কোন মুসলমান যদি আমার পিতাকে হত্যা করে তাহলে আমার পিতার ঘাতক হবে আমার চোখের কাঁটা। আমি তাকে সহ্য করতে পারবো না। তখন হয়তো তাকে হত্যা করবো এবং একজন মুসলমান হত্যার দায়ে জাহান্নাম হবে আমার ঠিকানা। তাঁর কথা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাকে হত্যা করানোর কোন উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা আমার নেই।[১৩]

'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা শেষ করে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। পিতাকে আসতে দেখে উটের পিঠ থেকে নেমে অসি উঁচু করে ধরে বললেন ঃ যতক্ষণ আপনি মুখ দিয়ে একথা উচ্চারণ না করবেন— 'আমি ইতর এবং মুহাম্মাদ অতি সম্মানীয়'—ততক্ষণ এ অসি কোষবদ্ধ হবে না। আপনি এক পাও এগুতে পারবেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে সে উচ্চারণ করলো- 'তোর ধ্বংস হোক! মুহাম্মাদ সম্মানীয় এবং আমি ইতর।' একটু পিছনে রাসূলে কারীম (সা) আসছিলেন। পিতা-পুত্রের সংলাপ কানে গেল। তিনি আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! যতদিন সে আমাদের মধ্যে আছে আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো।[১৪] 'উরওয়া বলেন ঃ হানজালা ইবন আবী 'আমের ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ— এ দুইজনের প্রত্যেকে নিজ নিজ পিতাকে হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে বিরত রাখেন।[১৫]

তাবুক যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ফেরার পর মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই মারা যায়।[১৬]

সাহীহ হাদীস সমূহের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, পবিত্র

কুরআনের সূরা তাওবার আশি ও চুরাশিতম আয়াত দুটি মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আশিতম আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন ঃ 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর (উভয়ই সমান)। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে।' সাহীহাইন (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তার জানাযায় রাসূল (সা) নামায পড়েন, তার কবরের পাশে দাঁড়ান এবং তার ছেলে আবদুল্লাহকে (রা) সান্ত্বনা দেন। নামায পড়ার পরই চুরাশিতম আয়াতটি নাযিল হয়। এ আয়াতে বলা হয় ঃ 'আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেনা এবং তার কবরে দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা না-ফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।' এ আয়াত নাযিলের পর রাসূলে কারীম (সা) আর কোন মুনাফিকের জানাযায় নামায পড়েননি।

সাহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)-এর বর্ণনায় এ আয়াত নাযিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা হলো এই যে, মুনাফিক ইবন উবাই যখন মারা যায়, তখন তার ছেলে নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে আরজ করলেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার একটি জামা দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরিণত করতে পারি। তারপর নিবেদন করলেন, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। তিনি তাও কবুল করলেন।

রাসূলে কারীমের (সা) গায়ে তখন দুইটি জামা ছিল। আবদুল্লাহ (রা) নীচের জামাটি পসন্দ করলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দেহের পবিত্র ঘাম তাতে লাগা ছিল। রাসূল (সা) আবদুল্লাহকে (রা) জামাটি দিয়ে বললেন, কাফন পরানো হলে আমাকে খবর দেবে, আমি জানাযায় নামায পড়াবো। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। লাশ কবরে নামানোর পর রাসূল (সা) আসেন। কবরে নেমে লাশ হাঁটুর ওপর রেখে তাকে জামা পরান এবং পবিত্র মুখের লালা লাগান। তারপর জানাযার নামাযের জন্য দাঁড়ান।

জানাযার নামাযে দাঁড়ালে 'উমার ইবন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাপড় টেনে ধরে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে নামায পড়তে বারণ করেছেন। রাসূল (সা) মৃদু হেসে বললেন ঃ যাও, নিজের স্থানে গিয়ে দাঁড়াও। এরপরেও 'উমার (রা) যখন একটু বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন— মাগফিরাতের দু'আ করবো অথবা করবো না। যদি সত্তর বারের বেশীও মাগফিরাত চাইলে সে ক্ষমা পায় তাহলে আমি তার জন্যও প্রস্তুত আছি।

অতঃপর রাসূল (সা) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের পরেই চুরাশিতম আয়াতটি নাযিল হয়। এ অহীর মাধ্যমে 'উমার (রা) স্বীয় কর্ম ও আচরণের সমর্থন লাভ করেন। তিনি নিজের এমন দুঃসাহসের জন্য দারুণ বিস্ময়বোধ করেন।[১৭]

খলীফা আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে আবদুল্লাহ (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এটা হিজরী ১২ সনের রবীউল আওয়াল মাসের ঘটনা।[১৮]

আবদুল্লাহ ছিলেন অতি মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। 'আয়িশা (রা) তাঁর সম্বন্ধে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখতে জানতেন। মাঝে মাঝে অহী লেখার দায়িত্বও পালন করেছেন।[১৯]

আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন মুনাফিক পিতার একজন সুসন্তান। পিতার কপটতাপূর্ণ জীবন সর্বদা তাঁকে পীড়া দিত। তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন।[২০] বিপথগামী পিতাকে সত্য ও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। পিতার এ বিপথগামিতা সত্ত্বেও সন্তান হিসেবে তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কখনও শৈথিল্য দেখাননি। ইসলামী বিধানের আওতায় থেকে সব সময় পিতার আনুগত্য করেছেন। তার মৃত্যুর পরেও মুক্তির আশায় সন্তান হিসেবে যা কিছু করার সবই করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৫৪০; আল-ইসতী'য়াব-২/৩৩৫,
২. তাবাকাত-৩/৫৪০
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৮৪-৫৮৫, আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৮
৪. আল-ইসতী'য়াব-২/৩৩৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫২৬, ৫৮৪-৫৮৫,
৫. তাবাকাত-৩/৫৪১
৬. প্রাগুক্ত-৩/৫৪১; আজ-জাহাবী-১/৩৭১; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৮.
৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৯৩: আল-ইসাবা-২/৩৩৬; তাবাকাত-৩/৫৪১.
৮. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : উসুদুল গাবা-৩/১৯৭, আজ-জাহাবী; তারীখ-১/৩৭১; আল-ইসাবা-২/৩৩৬
৯. আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৫৭৩
১০. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২০৯
১১.
১২. তাফসীরে ইবন কাসীর-৪/৩৭০; তায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৩-৪৭৪; আল-ইসতী'য়াব-২/৩৩৬.
১৩. উসুদুল গাবা-৩/১৯৭; হায়াতুস সাহাবা -২/৩১২; আল-বিদায়া-৪/১৫৮.
১৪. তাবাকাত-১/৪৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৩১২
১৫. তাফসীরে ইবন কাসীর-৪/৩৭২; হায়াতুস সাহাবা-২/৩১৩; আল-ইসাবা-১/৩১৬.
১৬. তাবাকাত-৩/৫৪১
১৭. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ বুখারী-১/১৬৯, ১৮০, ১৮৬; তাফসীরে ইবন কাসীর-২/৩৭৬-৩৮০; তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর। আল-ইসতী'য়াব-২/৩৩৬.
১৮. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৩৭১; তাবাকাত-৩/৫৪১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৯৮.
১৯. আল-ইসাবা-২/৩৩৬.
২০. তাবাকাত-৩/৫৪১.

রাফে' ইবন খাদীজ (রা)

রাফে' (রা) হিজরাতের বারো বছর পূর্বে ৬১১ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ, মতান্তরে আউস গোত্রের বনু আল-হারেসার সন্তান। পিতা খাদীজ ইবন রাফে' এবং মাতা হালীমা বিন্‌ত মাস'উদ। দাদার নামে তাঁর নাম রাখা হয়।[২] রাফে'-এর ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। ইমাম বুখারী বলেছেন আবূ খাদীজ।[৩] তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দুইজন নামকরা সাহাবী জহীর ও মুজহির ইবন রাফে'-এর ভাতিজা।[৪]

প্রাচীন মদীনার আবদুল্লাহ আশহাল ও আল-হারেসা গোত্র দুইটি শক্তি ও সামর্থের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের ছিল। তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এবং পরিণতিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবসময় লেগেই থাকতো। উসাইদ ইবন হুদাইরের (রা) দাদা সিমাক ইবন রাফে'কে এই গোত্রদ্বয়ের লোকেরা একটি যুদ্ধে হত্যা করে এবং তার বংশের লোকদের মদীনা থেকে বিতাড়িত করে। উসাইদের পিতা হুদাইর আল-হারেসা গোত্র অবরোধ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন এবং তাদেরকে পরাভূত করে খায়বারে তাড়িয়ে দেন। বনু আল-হারেসা খায়বারে বসবাস করতে থাকে। এর মধ্যে হুদাইরের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়। তিনি বনু আল-হারেসাকে আবার মদীনায় ফিরে এসে বসবাসের অনুমতি দান করেন।

রাফে' ইবন খাদীজের (রা) পূর্বপুরুষ এই বনু আল-হারেসার রয়িস বা নেতা ছিলেন। বাবা-চাচার মৃত্যুর পর এ নেতৃত্ব লাভ করেন রাফে' এবং আজীবন তা হাতছাড়া হয়নি।

রাসূলে কারীমের (সা) হিজরাতের সময় রাফে' অল্পবয়স্ক এক বালকমাত্র। তা সত্ত্বেও ইসলাম তাঁর অন্তরে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাঁর দুই চাচা জহীর ও মুজহির তখন মুসলমান।

বদর যুদ্ধের সময় রাফে'র বয়স চৌদ্দ বছর। যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির হলেন। যুদ্ধে যাওয়ার বয়স হয়নি দেখে অন্যদের সাথে তাঁকেও ফেরত দিলেন। এভাবে হযরত রাফে' বদরের যোদ্ধা হতে পারলেন না।[৫]

মদীনার ছোট ছেলেদের প্রতিবছর রাসূলে কারীমের (সা) সামনে হাজির করা হতো।[৬] তিনি তাদের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধে যাওয়ার যোগ্য মনে করতেন, তাদেরকে বাছাই করতেন। হিজরী ৩য় সনে উহুদ যুদ্ধে যাত্রার সময় রাফে'কে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে আনা হয়। তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং তিনি যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। এ সময় তাঁরই সমবয়সী সামুরা ইবন জুন্দুবের সাথে তাঁর একটি মজার ঘটনা ঘটে। 'রিজাল' শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে রাফে' বলেন ঃ "আমি সারিতে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করে দেখাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহকে (সা) পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, আমি একজন দক্ষ

তীরন্দায। অতঃপর রাসূল (সা) আমাকে অনুমতি দান করেন। তখন আমারই সমবয়সী সামুরা ইবন জুন্দুব তাঁর সৎ পিতা মুররী ইবন সাবিতকে বললো ঃ রাসূল (সা) রাফে' ইবন খাদিজকে অনুমতি দিলেন; কিন্তু আমাকে ফেরত দিলেন। মুররী তখন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাফে'কে অনুমতি দিয়েছেন, আর আমার ছেলে সামুরাকে ফেরত দিয়েছেন। সে কিন্তু কুস্তিতে রাফে'কে হারিয়ে দিতে পারে। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ'তোমরা দুইজন কুস্তি লাগো।'[৭] এভাবে তাঁরা দুইজন কুস্তি লাগেন এবং সামুরা রাফে'কে হারিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি লাভ করেন। ইবন হিশাম বলেন ঃ দুই জনেরই বয়স তখন পনেরো বছর।[৮]

এই উহুদ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর রাফে'র বুকে লাগে। তীরটি হাড় ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যায়। এ সম্পর্কে ইমাম আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। উহুদ অথবা হুনাইনের দিন রাফে' ইবন খাদীজের বুকে তীর বিদ্ধ হয়। তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আনা হলে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বুক থেকে তীরটি বের করে দিন। রাসূল (সা) বললেন ঃ'তুমি চাইলে আমি ফলাসহ তীরটি বের করে দিতে পারবো। আর তুমি চাইলে আমি শুধু তীরটি বের করে আনবো এবং ফলাটি থেকে যাবে। সে ক্ষেত্রে আমি কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেব যে তুমি একজন শহীদ।' তখন রাফে' বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাহলে তীরটিই বের করে আনুন, ফলাটি থাক। কিয়ামতের দিন আপনি আমার জন্য সাক্ষ্য দিন যে, আমি একজন শহীদ। এ অবস্থায় হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। অবশেষে ক্ষতস্থানে পচন ধরে মৃত্যুবরণ করেন।[৯]

উহুদ যুদ্ধে কিভাবে মুসলমানদের পরাজয় হয় রাফে' পরবর্তীকালে তা বর্ণনা করতেন। সেই বর্ণনার মধ্যে এ যুদ্ধের একটা চিত্র ফুটে ওঠে।[১০]

খন্দকসহ পরবর্তীকালে সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[১১] সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন।[১২]

তীরের যে আগাটি রাফে'র শরীরের ভিতরে ছিল, দীর্ঘদিন পর তা ক্ষতের সৃষ্টি করে, এবং সেই যন্ত্রণায় তিনি মারা যান। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে রিজাল শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। তবে একটি ব্যাপারে সকলে একমত যে, আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। ইমাম আল-বুখারী তাঁর তারীখে বলেছেন যে, তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে মারা যান। তিনি 'তারীখুল 'আওসাত' গ্রন্থে 'হিজরী ৫০-৬০ সনের মধ্যে যাঁরা মারা গেছেন' শিরোনামের অনুচ্ছেদে রাফে'র নামটি উল্লেখ করেছেন। আর ইবন কানে' নির্দিষ্ট করে হিজরী ৫৯ সনের কথা বলেছেন।[১৩] পক্ষান্তরে আল-ওয়াকিদী রাফে' ইবন খাদীজের কোন কোন সন্তানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হিজরী ৭৪ সনের প্রথম দিকে ৮৬

বছর বয়সে মদীনায় মারা যান।[১৪] আর তখন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান খিলাফতের মসনদে আসীন।

একথা প্রমাণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার তাঁর জানাযার নামায পড়ান। আর এটাও স্বীকৃত যে, তিনি হিজরী ৭৪ সনের প্রথম দিকে মক্কায় ছিলেন। তাই অনেকে বলেছেন, রাফে' ইবন খাদীজের ক্ষতে পঁচন ধরে আগেই এবং তিনি মারা যান হিজরী ৭৪ সনে ইবন 'উমার মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর। অথবা হিজরী ৭৩ সনে মারা যান ইবন 'উমারের (রা) মক্কা যাওয়ার আগে। ইবন 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ে মক্কায় যান। ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর বলেন ঃ তিনি হিজরী ৭৩ সনে মারা যান। আর এটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।[১৫]

মুসনাদে ইমাম আহমাদে এসেছে, 'তাঁকে কাফন পরিয়ে বাইরে আনা হয়েছিল এবং তাঁর ওপর একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'[১৬] লাশের সাথে বিপুল সংখ্যক লোক চলেছিল। ঘর থেকে মহিলারা কাঁদতে ও মাতম করতে করতে বের হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু ও জানাযা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা 'সীরাত ও রিজাল' শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়। এখানে তার কয়েকটি হুবহু নকল করা হলো ঃ

আবূ নুসরা বলেন ঃ আমি রাফে' ইবন খাদীজের জানাযায় যোগ দিয়েছিলাম। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইবন 'উমারও ছিলেন। মহিলারা চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে তিনি বললেন ঃ চুপ কর। এই বৃদ্ধের আল্লাহর আযাব (শাস্তি) সহ্য করার শক্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের মাতম ও কান্নার জন্য আযাব দেওয়া হয়।[১৭]

শু'বা ইউসুফ ইবন মাহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ বলেছেন ঃ আমি দেখেছি যে, ইবন 'উমার রাফে' ইবন খাদীজের লাশবাহী খাটিয়ার সামনের দুইটি পায়া ধরে স্বীয় কাঁধে রাখেন এবং আগে আগে হেঁটে কবর পর্যন্ত পৌছেন। এ সময় তিনি বলেন ঃ মৃতকে জীবিত লোকদের কাঁদার জন্য 'আযাব দেওয়া হয়।[১৮]

বিশর ইবন হারব থেকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাফে' ইবন খাদীজ মারা গেলে ইবন 'উমারকে বলা হলো, রাত পোহানো পর্যন্ত দাফন দেরী করা হোক। তাহলে শহরবাসীদেরকে জানিয়ে দেওয়া যাবে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এ সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার। হিশাম ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন 'উসমান ইবন 'উবাইদুল্লাহ থেকে। তিনি বলেছেন ঃ রাফে' মারা গেলে সূর্যোদয়ের পূর্বে লাশ আনা হলো জানাযার জন্য। ইবন 'উমার বললেন ঃ সূর্যোদয়ের আগে তার জানাযা পড়োনা।[১৯]

রাফে' ইবন খাদীজের (রা) দৈহিক গঠন ও আকৃতির তেমন বিবরণ পাওয়া যায় না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি চিকন করে মোঁচ রাখতেন এবং চুলে খিজাব লাগাতেন। মৃত্যুকালে তিনি দাস-দাসী, উট ও ভূ-সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান।[২০]

'আবদুল্লাহ, রিফায়া' 'আবদুর রহমান, 'উবাইদুল্লাহ, সাহল ও 'উবাইদ— তাঁর এই ছয়

ছেলের নাম জানা যায়। 'আবদুল্লাহ পিতার মসজিদের ইমাম ছিলেন। 'উবাইদ ছিলেন দাসীর পেটের সন্তান। আর অন্য ছেলেরা ছিলেন তাঁর লুবনা ও আসমা নাম্নী দুই স্ত্রীর পেটের সন্তান। তাঁর এই সন্তানদের বংশধারা বহুকাল যাবত মদীনা ও বাগদাদে বিদ্যমান ছিল।[২১]

রাফে' (রা) রাসূল (সা) ও চাচা জহীর ইবন রাফে' (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২২] হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর সনদে সর্বমোট ৭৮ (আটাত্তর)টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৩] তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেই সকল রাবীর মধ্যে সাহাবী ও তাবেঈ— উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা আছেন। এখানে তাঁদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হলোঃ

ইবন 'উমার, মাহমুদ ইবন লাবীদ, সায়িব ইবন ইয়াযীদ, উসাইদ ইবন জহীর, মুজাহিদ, আতা', শা'বী, 'আবাইয়া ইবন রিফায়া', 'উমরা বিন্ত আবদির রহমান, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, নাফে' ইবন জুবাইর, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান, আবু আন-নাজ্জাশী, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, 'ঈসা, 'উসমান ইবন সাহ্ল, হারীর ইবন 'আবদির রহমান, ইয়াহইয়া ইবন ইসহাক, সাবিত ইবন আনাস ইবন জহীর, হানজালা ইবন কায়স, নাফে' আল-'উমারী, ওয়াসি' ইবন হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হিব্বান, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'উসমান প্রমুখ।[২৪]

রাফে' ইবন খাদীজ (রা) ছিলেন মদীনার মুফতী সাহাবীদের অন্যতম। যিয়াদ ইবন মীনা বলেনঃ ইবন 'আব্বাস,ইবন 'উমার, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী, আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, রাফে' ইবন খাদীজ, সালামা ইবন আকওয়া', আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী, আবদুল্লাহ ইবন বুহাইনা এবং এঁদের মত রাসূলুল্লাহর (সা) আরো অনেক সাহাবী মদীনায় ফাতওয়া দিতেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করতেন। এ কাজ তাঁরা করতেন 'উসমানের (রা) মৃত্যু থেকে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত।[২৫] ইমাম জাহাবী বলেনঃ তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) সময় ও তার পরে মদীনায় যাঁরা ফাতওয়া দিতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[২৬] ইবন আব্বাস (রা) মারা গেলে রাফে' ইবন খাদীজ মন্তব্য করেছিলেনঃ আজ এমন এক ব্যক্তি মারা গেলেন যাঁর প্রতি মাশরিক ও মাগরিবের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল জ্ঞানী ব্যক্তি মুখাপেক্ষী ছিলেন।[২৭] তিনি ছিলেন একজন মরুচারী মানুষ। কৃষি ও সেচকাজে ছিলেন দক্ষ।[২৮]

ইতা'য়াতে রাসূল ও আমর বিল মা'রূফ— রাসূলের (সা) আনুগত্য ও সৎ কাজের আদেশ করা ছিল তাঁর চরিত্র ও স্বভাবের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট। একবার নু'মান আল-আনসারীর একজন দাস জনৈক ব্যক্তির বাগান থেকে খেজুরের ছোট গাছ উপড়ে ফেলে। বিষয়টি মারওয়ানের আদালতে উত্থাপিত হয়। তিনি চুরির অপরাধ আরোপ করে হাত কাটার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলেন। তখন রাফে' বললেনঃ রাসূল (সা) বলেছেনঃ ফলের জন্য হাত কাটা যাবেনা।[২৯]

একবার মারওয়ান ভাষণের মধ্যে বললেন ঃ মক্কা হারাম। সমাবেশে রাফে' উপস্থিত ছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, মক্কা হারাম, তা ঠিক আছে। তবে মদীনাও হারাম। মদীনাকে রাসূল (সা) হারাম ঘোষণা করেছেন। আমার কাছে হাদীসটি লেখা আছে। তুমি চাইলে দেখাতে পারি। মারওয়ান বললেন, হাঁ, হাদীসটি আমিও শুনেছি।[৩০]

রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর জীবনের বহু কথা, কাজ ও আচরণে তা ফুটে উঠেছে। একবার তাঁর চাচা জহীর (রা) এসে বললেন, আজ রাসূল (সা) একটি জিনিসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। অথচ এতে আমাদের কিছু সহজ হতো। রাফে' (রা) সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ চাচা! রাসূল (সা) যা কিছু বলেছেন তাই সত্য।[৩১]

একদিন তিনি স্ত্রী সম্ভোগে মগ্ন আছেন। আর ঠিক সেই সময় রাসূলে কারীম (সা) এসে ডাক দিলেন। আল্লাহর রাসূলের (সা) কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং পাকসাফ হয়ে বেরিয়ে আসেন।[৩২]

রাফে' (রা) একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে দেখলেন, সেখানে হাঁড়িতে টগবগ করে গোশত সিদ্ধ হচ্ছে। তাঁর খেতে খুব ইচ্ছে হলো। তিনি এক টুকরো মুখে দিয়ে গিলে ফেললেন। এরপর থেকে তাঁর পেটের পীড়া দেখা দিল। এক বছর পর্যন্ত ভুগতে লাগলেন। তারপর একদিন পেটের পীড়ার কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন। তিনি রাফে'র (রা) পেটে হাত বুলিয়ে দেন। এতে তাঁর সবুজ বর্ণের বমি হয়। এরপর থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।[৩৩]

রাফে' (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় যে সকল দু'আ পাঠ করতেন তার কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন। যেমন নতুন চাঁদ দেখা গেলে রাসূল (সা) যে দু'আ পড়তেন রাফে' তা বর্ণনায় করেছেন।[৩৪]

হাদীস ও সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে সন্ধান করলে রাফে'র (রা) জীবনের বহু ছোট ছোট কথা জানা যাবে। যা হবে একজন মুসলমানের জীবনে পথচলার জন্য আলোক বর্তিকাস্বরূপ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-আ'লাম-৩/৩৫
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮১; আল-ইসাবা-১/৪৯৬
৩. তাহজীবুত তাহজীব-৩/২৩০; আল-ইসাবা-১/৪৯৬
৪. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৫.
৫. আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮; আল-ইসাবা-১/৪৯৬
৬. উসুদুল গাবা-২/৩৫৪
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৬; তাবারী-১/১৩৯৪
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬
৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৩২; ৫০৭; আল-ইসাবা-/৪৯৬
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮

১১. আল-ইসাবা-১/৪৯৬
১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮২
১৩. তাহজীবুত তাহজীব-৩/২৩০
১৪. প্রাগুক্ত-৩/২২৯; শাজারাতুজ জাহাব-১/৮২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮৩.
১৫. আল-ইসাবা-১/৪৯৬; আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৫
১৬. মুসনাদ-৪/১৪১
১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮৩
১৮. প্রাগুক্ত-৩/১৮২; আল-মুসতাদরিক-৩/৫৬২
১৯. প্রাগুক্ত-৩/১৮২-১৮৩
২০. মুসনাদ-৪/১৪১
২১. সিয়ারে আনসার-২/৩৬৬
২২. আল-ইসাবা-১/৪৯৬
২৩. আল-আ'লাম-৩/৩৫
২৪. আল-ইসাবা-১/৪৯৬; আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮২
২৫. তাবাকাত-৪/১৮৭; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৪-২৫৫
২৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮২
২৭. তাবাকাত-৪/১৮৭; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৬১
২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/২৬১
২৯. মুসনাদ-৩/৪৭৪
৩০. প্রাগুক্ত-৪/১৪১
৩১. মুসলিম-১/৬১২
৩২. মুসনাদ-৪/১৪৩
৩৩. হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৪৯-৬৫০
৩৪. প্রাগুক্ত-৩/৩৬১।

'আমর ইব্‌ন সাবিত ইবন ওয়াক্‌শ (রা)

'আমর (রা)-এর উপাধি 'উসাইরাম'। আর এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি মদীনার আউস গোত্রের আবদুল আশহাল শাখার সন্তান। পিতার নাম সাবিত ইবন ওয়াক্‌শ এবং মাতার নাম লায়লা মতান্তরে লুবাবা বিন্‌ত ইয়ামান। প্রখ্যাত সাহাবী হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানের (রা) বোন। উহুদের শহীদ সালাম ইবন সাবিত (রা) 'আমরের ভাই।[১]

'আমর (রা) প্রথম দিকে ইসলামের প্রতি ভীষণ বিরূপ ছিলেন। তাঁর গোত্রের প্রায় সকল নারী-পুরুষ সা'দ ইবন মু'য়াজের (রা) চেষ্টায় মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তখনও তিনি নিজের পুরাতন বিশ্বাস ও ধর্মের ওপর অটল থাকেন। বালাজুরী বলেন ঃ 'তিনি ইসলামের ব্যাপারে দারুণ সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। উহুদের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং শহীদ হন। জীবনে কখনও নামায না পড়েও জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।'[২]

রাসূলে কারীম (সা) যখন উহুদ যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন তখন হঠাৎ করে 'আমরের (রা) অন্তরে সত্যের প্রতি প্রবল আবেগ সৃষ্টি হলো। সুনানে আবী দাঊদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। জাহিলী আমলে তাঁর সূদী কারবার ছিল। অনেকের নিকট তাঁর বকেয়া অর্থ পাওনা ছিল। তিনি এই বকেয়া অর্থ উসূল করে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ, ইসলাম সূদী লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। উহুদ যুদ্ধের সময় সম্ভবতঃ তাঁর বকেয়া পাওনা আদায় হয়ে গিয়েছিল। আর তখনই তিনি মুসলমান হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন।[৩]

উহুদে যাত্রার সময় 'উসাইরামের' খান্দান আবদুল আশহালের লোকেরা সহ সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। উহুদের যোদ্ধারা চলে যাওয়ার পর মদীনার প্রতিটি মহল্লায় একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা নেমে আসে। উসাইরাম চারদিকে এমন নীরব ও নির্জন অবস্থা দেখে ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের খান্দানের লোকেরা কোথায় গেছে? উত্তর পেলেন ঃ উহুদে।

যদিও তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাসত্ত্বেও যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলেন এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে উহুদের দিকে চললেন। সোজা উহুদে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি আগে যুদ্ধ করবো, না মুসলমান হবো? রাসূল (সা) বললেন ঃ দুইটিই করবে। আগে মুসলমান হও, পরে যুদ্ধে যাও। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবনে এক রাকা'য়াত নামাযও আমার পড়া হয়নি। এ অবস্থায় যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার জন্য কি ভালো হবে?' বললেন ঃ 'হাঁ, ভালো হবে।' অতঃপর তিনি কালেমা পাঠ করে মুসলমান হলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তরবারি হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে চললেন। তিনি যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, মুসলিম যোদ্ধাদের তা জানা ছিল না। তাই তাঁরা তাঁকে বললেন

ঃ 'তুমি এখান থেকে ফিরে যাও। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ 'আমিও মুসলমান হয়েছি।'

যুদ্ধ শুরু হলো। দারুণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়লেন। শত্রুবাহিনীর ভিতরে ঢুকে পড়লে বহু আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলেন। আঘাত এত মারাত্মক ছিল যে, রণক্ষেত্রে নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিলেন, উঠারও শক্তি ছিল না। যুদ্ধ শেষে আবদুল আশহাল গোত্রের লোকেরা শহীদদের খোঁজে বের হয়ে, দেখলেন তাঁদের উসাইরাম মৃতদের মধ্যে পড়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও চালু আছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি এখানে এভাবে কেন? সম্ভবতঃ গোত্রীয় টানে এখানে এসেছো? তিনি বললেন ঃ 'না। আমি ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেছি।'

রণক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে তাঁকে বাড়ীতে আনা হলো। গোটা খান্দানে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়লো। আবদুল আশহাল খান্দানের নেতা সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) খবর পেয়ে তাঁর বাড়ীতে ছুটে গেলেন এবং তাঁর বোনের কাছে কি ঘটেছে তা জানতে চাইলেন। মানুষের এ যাতায়াতের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে রাসূলে কারীম (সা) মন্তব্য করলেন ঃ 'অল্প শ্রমে প্রচুর বিনিময় লাভ করেছে।' কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ 'নিশ্চিত সে জান্নাতীদের অন্তর্গত।'

যেহেতু 'আমরের (রা) এ ঘটনাটি ছিল কিছুটা অস্বাভাবিক ধরনের। এ কারণে লোকেরা তাঁকে স্মরণ রাখার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। আবু হুরাইরা (রা) তাঁর শিষ্য-শাগরিদদেরকে প্রশ্ন করতেন ঃ 'সে আচ্ছা, তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তির নাম জান যিনি জীবনে কখনও নামায আদায় করেননি, অথচ সোজা জান্নাতে চলে গেছেন?' যখন কেউ উত্তর দিতে পারতো না তখন তিনি বলতেন ঃ 'তিনি আবদুল আশহালের উসাইরাম।'[৪]

উহুদে তাঁর ভাই সালামা ইবন সাবিত শাহাদাত বরণ করেন আবু সুফইয়ান ইবন হারবের হাতে এবং তিনি নিজে আঘাতপ্রাপ্ত ও পরে শাহাদাত বরণ করেন দাররার ইবনুল খাত্তাবের হাতে।[৫]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসতী'য়াব-২/৫০৬; আল-ইসাবা-২/৫২৬

২. আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৫

৩. আল-ইসাবা-২/৫২৬

৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৯০; আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৫; আল ইসাবা-২/৫২৬; কানযুল 'উম্মাল-৭/৮; আল-বায়হাকী-৯/১৬৭; হায়াতুস সাহাবা-১/৪৯৫। তাছাড়া বুখারী, আবু দাউদ, মুসলিম, নাসাঈ ও হাকেম তাঁর জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৮; ইবন হিশাম-১/১২২।

রিফা'য়া ইবন রাফে' ইবন মলিক আয-যারকী (রা)

রিফায়া (রা)-এর ডাকনাম আবূ মু'য়াজ।[১] তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের 'হুবলা' শাখার সন্তান। পিতা রাফে' ইবন মালিক (রা) এবং মাতা উম্মু মালিক বিন্‌ত উবাই ইবন সালূল। মাতা মুনাফিক (কপট মুসলমান) নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর বোন।[২]

রিফায়া'র (রা) সম্মানিত পিতা রাফে' (রা) ছিলেন খাযরাজ গোত্রের প্রথম মুসলমান। বাই'য়াতে আকাবার দুই বছর আগে পাঁচ/ছয়জন ইয়াসরিববাসীর সংগে মক্কায় যান এবং ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হতে বাই'য়াত হন। তাঁর সম্মানিতা মাও মুসলমান হয়েছিলেন। এই মহিলার ভাই আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল মদীনার কুফর ও নিফাকের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু তারই সহোদরা ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ। রিফায়া (রা) এমনি এক মহান পারিবারে বেড়ে ওঠেন। পিতার সাথে মক্কায় যেয়ে 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াতে অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র হাতে বাই'য়াত করেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন।[৩]

সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। তাঁর বদরে যোগদানের কথা সাহীহ আল বুখারীর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।[৪] এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর তাঁর চোখে আঘাত করে। রাসূল (সা) একটু থুথু দিয়ে দু'আ করলে তিনি সুস্থ হয়ে যান।[৫] এই যুদ্ধে তাঁর অন্য দুই ভাই খাল্লাদ ও মালিক অংশগ্রহণ করেন।[৬] 'উমাইর ইবন ওয়াহাব ছিল মক্কার কুরাইশদের এক নেতা। মক্কায় যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) নানাভাবে কষ্ট দিত সে তাদের অন্যতম। রিফায়া বদরে তার ছেলে ওয়াহাবকে বন্দী করেন।[৭]

জামাল ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে তিনি হযরত 'আলীর (রা) পক্ষে ছিলেন।[৮] জামালের যুদ্ধে 'আয়িশা (রা), তালহা (রা) ও যুবাইরের (রা) যোগদান বিষয়টি ভীষণ জটিল করে তোলে। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচী আব্বাসের (রা) স্ত্রী উম্মুল ফাদল বিনত আল-হারেস মক্কা থেকে আলীকে চিঠি মারফত জানান যে, তালহা ও যুবাইর বসরায় গেছেন। এ খবর পেয়ে আলী দারুণ দুঃখ পেলেন। আক্ষেপের সুরে বললেন ঃ তাঁদের আচরণে বিস্মিত হই। কারণ রাসূলে কারীমের ইনতিকালের পর আমরা নবী খান্দানের লোকেরা নিজেদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার মনে করতে থাকি। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যদেরকে খলীফা বানালো। ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তির কথা-বিবেচনা করে আমরা সব কিছু মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করি। আল্লাহর শুকরিয়া যে, তার ফলাফল অতীব শুভ হয়েছে। এরপর লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে খলীফা 'উসমানকে হত্যা করলো এবং কোন প্রকার জোর-জবরদস্তী ছাড়াই জনগণ আমাকে খলীফা নির্বাচন করলো। আমার

হাতে বাই'য়াতকারীদের মধ্যে তালহা ও যুবাইরও ছিলেন। এক মাসও যেতে পারলো না, এখন তাদের সসৈন্য বসরায় যাওয়ার খবর আসছে। হে আল্লাহ! আপনি এই ঝগড়া ও বিশৃংখলাকে দেখুন।

রিফায়া' ইবন রাফে' (রা) খলীফা 'আলীর (রা) ভাষণ শুনে বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকালের পর আমাদের মান-মর্যাদা ও দ্বীনের সাহায্য-সহায়তার প্রতি লক্ষ্য করে আমরা নিজেদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার মনে করেছিলাম। তখন আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নিকট সম্পর্ক, ঈমানের অগ্রগামিতা এবং হিজরাত ইত্যাদির মত দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদার দাবী করে আমাদের নিকট থেকে এই অধিকার চেয়ে নেন। আমরাও বিশ্বাস করলাম যে, সত্য ও ন্যায়ের বাস্তবায়ন হচ্ছে, কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। আপনাদের দাবী আমরা মেনে নিলাম এবং খিলাফত কুরাইশদের হাতে অর্পণ করলাম। মূলতঃ আমাদের তাই করা সঙ্গত ছিল। এখন আপনার হাতে বাই'য়াত হওয়ার পর কিছু লোক বিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, আপনি তাদের থেকে উত্তম এবং আমাদের দৃষ্টিতে আপনিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। এখন বলুন, আপনি কি চান? আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।"

রিফায়া'র (রা) ভাষণ শেষ হলে হাজ্জাজ ইবন গায়িয়্যা আল-আনসারী এগিয়ে বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! এই বিষয়টির এখন ফয়সালা করে নিন। এই পথে আমি জীবন দানের জন্য প্রস্তুত। তারপর তিনি আনসারদের সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা পূর্বে যেমন রাসূলুল্লাহকে (সা) সাহায্য করেছিলে, এখন তেমনি আমীরুল মুমিনীনকে সাহায্য কর। এই শেষের সাহায্য হুবহু প্রথম সাহায্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও প্রথম সাহায্য ছিল অধিকতর ভালো ও সম্মানীয়।[৯]

আলী (রা) এই বক্তৃতা-ভাষণের পর একটি বাহিনী নিয়ে ইরাক যান। রিফায়া' (রা)ও সঙ্গী ছিলেন।

রিফায়া'র (রা) মৃত্যু সন নিয়ে সামান্য মতপার্থক্য আছে। ইবন কানে' বলেন ঃ তিনি হিজরী ৪১, ৪২ অথবা ৪৩ সনে মারা যান। আর সেটা মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে।[১০] মৃত্যুকালে মু'য়াজ ও উবাইদ নামে দুই ছেলে রেখে যান।

রিফায়া' থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে তাঁর কয়েকটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। বুখারী তিনটি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

রিফায়া' (রা) রাসূলে কারীম (সা) ছাড়াও আবু বকর ও উবাদা ইবন সামিত থেকে হাদীস শুনেছেন, আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবন খালিদ, আলী ইবন ইয়াহইয়া এবং ছেলে মু'য়াজ ও উবাইদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১১]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৫
২. আল-ইসাবা-১/৫১৭; আল-ইসতী'য়াব-৫০১
৩. আল-ইসাবা-১/৫১৭
৪. বুখারী-২/৫৬৯; ইবন হিশাম-১/৭০০; আল-ইসাবা-১/৫১৭
৫. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৫৬
৬. আল-ইসতী'য়াব-১/৫০১
৭. ইবন হিশাম-১/৬৬১
৮. আল-ইসতী'য়াব-১/৫০১; আল-ইসাবা-১/৫১৭
৯. আল-ইসতী'য়াব-১/৫০১-৫০২; সিয়ারে আনসার-১/৩৬৬
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৫; আল-ইসাবা-১/৫১৭
১১. আল-ইসাবা-১/৫১৭।

'আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা)

'আবদুল্লাহর (রা) ডাকনাম আবূ মুহাম্মাদ এবং উপাধি 'সাহিবুল আযান'। তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের সন্তান। তাঁর পিতা-পিতামহের নাম বর্ণনার ক্ষেত্রে 'রিজাল' শাস্ত্রবিদরা বেশ এলোমেলো করে ফেলেছেন। ইবন সা'দ তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ইবন হাজার ও ইমাম আল-কুরতুবীও এই ওলট-পালটের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১] ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ তিনি একজন বদরী সাহাবী এবং যাঁকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল।[২] তিনি 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াতের (শপথ) একজন সদস্য। ইবন হিশাম 'আকাবায় বাই'য়াতকারীদের মধ্যে তাঁর নামটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি বদরে যোগদান করেছেন এবং তাঁকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল। ইমাম জাহাবীও একথা বলেছেন।[৩]

প্রথম হিজরী সনের আগ পর্যন্ত মানুষকে নামাযে সমবেত করার জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি চালু ছিল না। রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে মসজিদে নববী তৈরী করার পর নামাযের ঘোষণা দানের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ পেলেন। কেউ বললেন, নামাযের সময় হলে মসজিদের ওপরে একটি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হোক। কেউ প্রস্তাব করলেন, ঘন্টা বাজানো হোক। এভাবে শিঙ্গা ফুঁকানো, আগুন জ্বালানো ইত্যাদি প্রস্তাবও দেওয়া হলো। কিন্তু কোন প্রস্তাবই রাসূলুল্লাহর (সা) মনপূত হলো না। কারণ সেগুলো ইহুদী-নাসারাসহ কোন না কোন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তখন এই ঘন্টা বাজানোর প্রস্তাবটির ওপর সকলে একমত হলেন। রাসূল (সা) এই প্রস্তাব অনুযায়ী ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে নামাযে ডাকার জন্য অনুমতি দিয়ে বৈঠক শেষ করলেন।

সেদিন রাতেই 'আবদুল্লাহ (রা) স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি একটি ঘন্টা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিক্রী করবে? লোকটি প্রশ্ন করলো ঃ কি করবে? তিনি বললেন ঃ নামাযের সময় বাজাবো। লোকটি বললো ঃ এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি বলে দিচ্ছি। এই বলে 'আবদুল্লাহকে আযানের পদ ও বাক্যগুলি উচ্চারণ করে শিখিয়ে দিল। ঘুম থেকে জেগেই 'আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ এ স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। তুমি যাও, বিলালকে শিখিয়ে দাও। সে আযান দিক। আবদুল্লাহ বিলালকে স্বপ্নে প্রাপ্ত আযান শেখালেন এবং বিলাল আযান দিলেন। এটাই ছিল ইসলামের প্রথম আযান এবং এভাবে আযানের সূচনা হয়।

বিলালের (রা) কণ্ঠে আযানের ধ্বনি শুনে 'উমার (রা) গায়ের চাদর টানতে টানতে দ্রুত

ঘর থেকে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এসে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমিও স্বপ্নে এই বাক্যগুলি শুনেছিলাম। রাসূলে কারীম (সা) দুইজন মুসলমানের স্বপ্নের মিলের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।[৪] আযানের পর লোকেরা নামাযের জন্য সারিবদ্ধ হলো। বিলাল (রা) ইকামাত দিতে যাবেন, এমন সময় 'আবদুল্লাহ্ বললেন, ইকামাত আমি বলবো।

আযানের জন্য বিলালকে (রা) নির্বাচন করার কারণ হলো, 'আবদুল্লাহর চেয়ে তাঁর গলার আওয়ায ছিল বেশী বড়। সুতরাং সহীহ তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) যখন আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি বিলালকে তোমার স্বপ্নে পাওয়া বাক্যগুলি শিখিয়ে দাও তখন একথাও বলেন যে, তোমার গলার আওয়ায অপেক্ষা তার গলার আওয়ায বড়।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, আযান যা মূলতঃ নামাযের ভূমিকা স্বরূপ এবং ইসলামের একটি বড় প্রতীক, তা 'আবদুল্লাহর (রা) মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বপ্নে অদৃশ্য থেকে আযানের শব্দ ও বাক্য লাভ, রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক তা সত্যায়ন এবং সর্ব সম্মতভাবে মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হওয়া— এ সবকিছুই আবদুল্লাহর (রা) জন্য এক ঈর্ষণীয় সম্মান ও মর্যাদা ছিল। আযানের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন সম্পর্কে এখানে আরো কিছু কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আমরা মনে করি।

কিছু লোকের ধারণা 'উমার (রা) সর্বপ্রথম রাসূলকে (সা) আযানের প্রস্তাব দান করেন। সহীহ্ বুখারীর একটি বর্ণনা দ্বারা এমনটিই বোঝা যায়। কিন্তু আসল ঘটনা হলো সেখানে আযানের বাক্যগুলির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। শুধু এতটুকু আছে যে, 'উমার বললেন ঃ আপনাদের মধ্য থেকে একজন লোক পাঠান যে নামাযের ঘোষণা দেবে। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন ঃ বিলাল ওঠো, নামাযের ঘোষণা দাও।[৫]

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে 'উমার (রা) বিশ দিন পর্যন্ত স্বীয় স্বপ্নের কথা গোপন রাখেন। যখন বিলাল আযান দেন তখন তিনি নিজের স্বপ্নের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রকাশ করেন। রাসূল (সা) বললেন, তুমি আগে কেন বলনি? 'উমার (রা) বললেন ঃ আবদুল্লাহ্ আমার আগেই প্রকাশ করে দিয়েছে। এ কারণে আমার লজ্জা হচ্ছিল।[৬]

উপরোক্ত বর্ণনাটি যে 'উমারের (রা) স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী, সে কথা বাদ দিলেও ঘটনাটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিল খায় না। কারণ, আযান সম্পর্কে যতগুলি বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে যে বিষয়টি সকল বর্ণনায় এসেছে তা হলো, রাসূল (সা) দিনের বেলা পরামর্শ করেন। সেখানে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'আবদুল্লাহর (রা) হাদীস দ্বারা জানা যায়, ঘন্টা বাজানোর ব্যাপারে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মজলিস থেকে বাড়ী যান, রাতে স্বপ্ন দেখেন এবং ফজরে আযান দেওয়া হয়। এই হিসাবে 'আবদুল্লাহর (রা)

হাদীসটি বুখারী বর্ণিত ইবন 'উমারের (রা) হাদীসটির ব্যাখ্যা ও ভাষ্য। আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের (র) হাদীসটি ইমাম বুখারীর জানা ছিল। কিন্তু তাঁর নির্ধারিত শর্তের নিরীখে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেননি।[৭]

প্রকৃতপক্ষে এইসব বর্ণনা দ্বারা কারো আগে-পিছের ফয়সালা করা যায় না। সম্ভবতঃ ইমাম বুখারী এ কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তা না হলে তাবারানীর বর্ণনামতে আবু বকরও (রা) আযানের স্বপ্ন দেখেন। ইমাম আল-গাজালী 'আল-ওয়াসীত' গ্রন্থে লিখেছেন, দশজনেরও অধিক ব্যক্তি স্বপ্নে আযান দেখেছিলেন। 'শরহে তানবীহ' গ্রন্থে চৌদ্দ ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে। তবে মুহাদ্দিসীনের নিকট এ সকল বর্ণনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত নয়। শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ এবং কোন কোন সনদে ইবন 'উমারের (রা) বর্ণনাটি সঠিক ও প্রমাণের পর্যায়ে পৌঁছে। তার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের বর্ণনাটি একাধিক সনদে এসেছে এবং সাহাবীদের একটি দল এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক আযানের স্বপ্ন যে কেউ প্রথমে দেখুন না কেন, স্বপ্নটি ও তার ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এ কারণে তিনি 'সাহিবুল আযান' লকবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।[৮]

এত বড় গৌরবের অধিকারী হওয়ার পরেও আরো বহু সৌভাগ্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধ হয়। এতে তিনি এবং তাঁর ভাই হুয়াইরিস ইবন যায়িদ অংশগ্রহণ করেন।[৯] এর পরে খন্দক, উহুদসহ যত যুদ্ধ হয়েছে সবগুলিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয় অভিযানে তিনি শরীক ছিলেন এবং বনু আল-হারেস ইবন খাযরাজের পতাকাটি ছিল তাঁর হাতে। বিদায় হজ্জেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ সময় রাসূলে কারীম (সা) যখন ছাগল-উট বন্টন করছিলেন তখন তিনি নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁকে কিছুই দেননি। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে ছিল অন্য জিনিস। রাসূল (সা) মাথা ন্যাড়া ও নখ কাটার সময় তাঁকে কিছু কেশ ও নখ দান করেন। অবশিষ্ট কেশ ও নখগুলি অন্যদের মধ্যে বন্টন করেন। এই কেশ ছিল মেহেন্দী রঞ্জিত। আবদুল্লাহর বংশধরদের মধ্যে এ কেশ ও নখ বরকতের প্রতীক হিসেবে বহুকাল রক্ষিত ছিল।[১০]

তাবুক অভিযান থেকে মদীনায় ফেরার পর রাসূলে কারীমের (সা) নিকট হিমইয়ার রাজন্যবর্গের পত্রসহ দূত আসে। পত্রে তাঁরা ইসলাম গ্রহণের কথা জানান। রাসূল (সা) তাঁদের পত্রের জবাব এবং তাঁদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শেখানো ও যাকাত-সাদকা আদায়ের জন্য মু'য়াজ ইবন জাবালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। এই দলটির মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন যায়িদও ছিলেন।[১১]

'আবদুল্লাহর (রা) ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা হিজরী ৩২ (বত্রিশ) সনে ৬৪ (চৌষট্টি) বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। জানাযার নামায পড়ান খলীফা 'উসমান (রা)।[১২] তবে আল-হাকেমসহ অনেকের ধারণা, তিনি উহুদে শাহাদাত বরণ করেন। প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা এই ঘটনা উপস্থাপন করেন যে, একবার আবদুল্লাহ্‌র (রা) এক কন্যা 'উমারের (রা) নিকট এসে বলেন, আমার পিতা একজন বদরী সাহাবী এবং উহুদে শাহাদাত বরণকারী। 'উমার (রা) বললেন, এখন তোমার দাবী কি? তারপর তিনি কিছু সাহায্য প্রাপ্তির আবেদন জানালে তিনি তা দান করেন। এটা আল-হুলইয়ার বর্ণনা। তবে মুসনাদসহ রিজাল শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থে হিজরী ৩২ সনের বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া উহুদে শহীদ হওয়ার কথা হাকেম বললেও তিনি আবার 'আল-মুসতাদরিক' গ্রন্থে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।[১৩]

তাঁর সন্তানাদির মধ্যে এক ছেলে ও এক মেয়ের কথা জানা যায়। ছেলের নাম ছিল মুহাম্মাদ। তাঁর জন্ম হয় রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায়। তিনি বলেছেন, আমার পিতা না খাটো ছিলেন না লম্বা। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল মধ্যমাকৃতির।[১৪] তিনি আরবীতে লিখতে জানতেন।[১৫]

আবদুল্লাহর (রা) এক পৌত্র বিশর ইবন মুহাম্মাদ একবার 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের দরবারে যান এবং নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি একজন 'আকাবী বদরী ব্যক্তির পৌত্র-যাঁকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল। তখন 'উমার পাশে উপস্থিত শামবাসীদেরকে কবিতার একটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনান।[১৬]

ইমাম বুখারী লিখেছেন, আযান বিষয়ে তাঁর সূত্রে একটি মাত্র হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযীও এ কথা সমর্থন করেছেন। কিন্তু হাফেজ ইবন হাজার আল-আসকালানী তাঁর সূত্রে বর্ণিত ছয়টি হাদীস পেয়েছেন এবং তা তিনি একটি পৃথক অংশে সংকলন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] আল্লামাহ্ জাহাবী বলেছেন, তাঁর সনদে অল্প কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়।[১৮]

'আবদুল্লাহর (রা) মুখ থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ, পৌত্র 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, আবূ বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন হাযাম প্রমুখ।[১৯]

অভাব ও দারিদ্রের মধ্যেও আল্লাহর রাস্তায় সবকিছু দান করা আখলাকের এক উন্নততর বৈশিষ্ট। আবদুল্লাহর (রা) বিষয়-সম্পদ ছিল অতি সামান্য। যা দিয়ে তিনি পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। বর্ণিত হয়েছে, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই বাগিচাটি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা)

উদ্দেশ্যে সাদাকা করে দিলাম। এর পরেই তাঁর পিতা-মাতা রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বাগিচাটির আয় দিয়েই আমরা জীবন ধারণ করি। রাসূল (সা) তখন তাঁদেরকে বাগিচাটি ফেরত দেন। কিছু দিন পর তাঁরা মারা গেলে তাঁদের দুই ছেলে এই বাগিচাটির উত্তরাধিকারী হন।[২০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৫৩৬; তাহজীবুত তাহজীব-৫/২২৪; আল-ইসতী'য়াব-২/৩১১
২. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৯
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪
৪. তাঁর স্বপ্নে আযান দেখার হাদীসটি আবু দাউদ (৪৯৯), তিরমিযী (৩৭), আহমাদ-৪/৪৩, ইবন মাজাহ (৭০৮) ও আল বায়হাকী-১/৩৯০-৩৯১ সংকলন করেছেন।
৫. বুখারী-১/১৫৭; আনসাবুল আশরাফ-১/২৭৩
৬. ফাতহুল বারী-২/৬৬
৭. প্রাগুক্ত-২/৬৩
৮. আযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ ইবন কাসীর ঃ আস্-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৪১৭-৪১৯; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫০৮-৫০৯; হায়াতুস সাহাবা-৩/১১৫; কান্‌যুল 'উম্মাল-৪/২৬৩; ফাতহুল বারী-২/৬৩-৬৬
৯. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৯২
১০. তাবাকাত-৩/৫৩৬-৫৩৭ ; আল-ইসতী'য়াব-২/৩১২; মুসনাদ-৪/৪২
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৯২
১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬; তাবাকাত-৩/৫৩৭; আল-ইসতী'য়াব-২/৩১২
১৩. তাহজীবুত তাহজীব-৫/২২৪; আল-ইসাবা-২/৩১২
১৪. তাবাকাত-৩/৫৩৬
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬
১৭. তাহজীবুত তাহজীব-৫/২২৪
১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬; আল-ইসাবা-২/৩১২
১৯. তাহজীবুত তাহজীব-৫/২২৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬
২০. আল-মুসতাদরিক-৩/৩৩৬; হায়াতুস সাহাবা-২/১৬০; উসুদুল গাবা-২/২৩৩।

সাবিত ইবন কায়স (রা)

সাবিতের (রা) ডাকনাম আবু মুহাম্মাদ বা আবু 'আবদির রহমান। 'খতীবু রাসূলিল্লাহ' (রাসূলুল্লাহর বক্তা) তাঁর উপাধি।[১] মদীনার খাযরাজ গোত্রের সন্তান। পিতা কায়স ইবন শাম্মাস। মাতা তাঈ গোত্রের কন্যা হিন্দা, মতান্তরে কাবশা বিন্‌ত ওয়াকিদ। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও 'উমরা বিন্‌ত রাওয়াহা তাঁর বৈপিত্রীয় ভাই-বোন।[২]

সাবিত (রা) ছিলেন অতি মর্যাদাবান সাহাবীদের একজন। রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন ইসহাক বলেন ঃ একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সা) 'আম্মার ইবন ইয়াসিরের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[৩]

রাসূলে কারীম (সা) মক্কা থেকে ইয়াসরিবে পদার্পণ করলে গোটা শহরবাসী তাঁকে বরণ করার জন্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আনাস (রা) বলেন ঃ এই উপলক্ষে সাবিত একটি ভাষণ দান করেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন ঃ 'আমরা আপনাকে সেই সব জিনিস থেকে রক্ষা করবো যা থেকে আমরা নিজেদের জীবন ও সন্তানদের রক্ষা করে থাকি। কিন্তু বিনিময়ে আমরা কী পাব? জবাবে রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমরা জান্নাত পাবে। তখন সমবেত জনতা সমস্বরে বলে ওঠে ঃ আমরা এ বিনিময়ে রাজি।[৪]

মাগাযী শাস্ত্রবিদরা সাবিতকে (রা) বদরী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেননি। তবে ইবন হাজার আল-আসকিলানী 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে তাঁকে বদরী সাহাবী বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৫] মাগাযী শাস্ত্রবিদরা বলেছেন ঃ তাঁর সর্বপ্রথম যুদ্ধ হলো উহুদ। তারপর সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।[৬] বাই'য়াতে রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৭]

হিজরী ৫ম সনে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জার অবরোধ ও বিতাড়ন অভিযানে সাবিত (রা) অংশগ্রহণ করেন। বনু কুরায়জা অবশেষে তাদের পুরাতন বন্ধু সা'দ ইবন মু'য়াজের হাতে তাদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। সা'দ ইবন মু'য়াজের বিচারে তাদের অপরাধী পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। ইবন ইসহাক ইবন শিহাব আয-যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সময় সাবিত ইবন কায়স যান যাবীর ইবন বাতা আল-কুরাজীর সাথে দেখা করতে। এ যাবীর ছিল বনু কুরায়জার এক বৃদ্ধ ইহুদী। জাহিলী আমলের বু'য়াস যুদ্ধে সাবিত বন্দী হলে এই যাবীর তাঁকে ছেড়ে দেয়। এই ঋণ পরিশোধের আশায় এ বিপদের সময় সাবিত তার সামনে যান। যাবীর তখন এক বৃদ্ধ। সে সাবিতকে বললো ঃ আবু আবদির রহমান, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো? সাবিত বললেন ঃ আমার মত মানুষ কি আপনার মত মানুষকে ভুলতে পারে? আমি আজ এসেছি আপনার ঋণ পরিশোধের আশায়। যাবীর বললো ঃ মহৎ ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তিদের প্রতিদান দেয়।

এরপর সাবিত রাসূলুল্লাহ্র (সা) নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওপর যাবীরের একটি বড় অনুগ্রহ আছে। আমি তার প্রতিদান দিতে চাই। তার রক্ত আমাকে দান করুন। রাসূল (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে বলেন ঃ হাঁ, তাই হোক। সাবিত যাবীরের নিকট যেয়ে বলেন ঃ রাসূল (সা) তোমার রক্ত আমাকে দান করেছেন। আর আমি তা তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। যাবীর বললো ঃ এখন আমি একজন পরিবার-পরিজনহীন বৃদ্ধ, জীবন দিয়ে আমার কি হবে? সাবিত রাসূলুল্লাহ্র (সা) নিকট ফিরে গিয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যাবীরের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাকে দান করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ, তারা তোমার। সাবিত যাবীরের নিকট ফিরে গিয়ে বললেনঃ রাসূল(সা)তোমার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদেরকে আমাকে দান করেছেন। আমি তাদের সকলকে তোমাকে দিলাম। তখন বৃদ্ধ যাবীর বললো ঃ হিজাযের একটি পরিবার-যাদের কোন অর্থ-সম্পদ নেই, তারা বাঁচবে কেমন করে? সাবিত আবার রাসূলুল্লাহ্র (সা) নিকট এসে তাদের অর্থ, সম্পদ চেয়ে নিলেন এবং যাবীরের নিকট ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) যে তার সকল সম্পদ ফেরত দিয়েছেন, সে কথা তাকে জানালেন।

এরপর বৃদ্ধ বললা ঃ ওহে সাবিত! চীনা আয়নার মত যে যুবকের চেহারা, সেখানে গোত্রের সকল কুমারী মেয়ের চেহারা দেখা যেত, সেই কা'ব ইবন আসাদের পরিণতি কি হয়েছে? সাবিত বললো ঃ সে তো নিহত হয়েছে। যাবীর বললো ঃ আমাদের আনন্দ-বিপদে যে ব্যক্তি আগে আগে থাকতো, আমরা পালালে যে আমাদের রক্ষা করতো, সেই 'আযযাল ইবন সামায়াল-এর কি দশা হয়েছে? সাবিত বললেন ঃ সেও নিহত হয়েছে। যাবীর আবার জানতে চাইলো ঃ মজলিস দুইটি— অর্থাৎ বনু কা'ব ইবন কুরায়জা ও বনু 'আমর ইবন কুরায়জার পরিণতি কি হয়েছে? সাবিত বললো ঃ তাদেরকে হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাবীর বললো ঃ ওহে সাবিত! তোমার ওপর আমার যে অনুগ্রহ আছে, তার বিনিময়ে তুমি আমাকে আমার কাওমের পরিণতি বরণ করার সুযোগ করে দাও। আল্লাহর কসম! তাদের অবর্তমানে আমার বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। তাদের ছাড়া শুধু জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার ধৈর্য আমার নেই।[৮]

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে বনু আল-মুসতালিক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নেতার কন্যা জুওয়াইরিয়্যা রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাসূল (সা) তাঁর চুক্তিকৃত সোনা পরিশোধ করে চিরদিনের জন্য তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর তাঁর সম্মতিক্রমে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা দান করেন।[৯]

এই বনু আল-মুসতালিকের যুদ্ধের সময় 'ইফ্ক' বা মিথ্যা ও বানোয়াট কলঙ্ক আরোপের ঘটনা ঘটে। যা মূলতঃ উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) ও সাফওয়ান ইবনুল মু'য়াত্তালকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা রটনা করে। এই ঘটনা রাসূলে কারীম (সা) সহ গোটা মুসলিম

সমাজকে কিছুদিনের জন্য ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। কিছু সরলপ্রাণ মুসলমানও এ মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়। ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে দেখা যায় শা'য়িরুর রাসূল হাস্‌সান ইবন সাবিতও এর সাথে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তিনি সাফওয়ান ও তাঁর মুদার গোত্রের সমালোচনায় একটি কবিতাও রচনা করেন। যখন এই ঘটনার রহস্য উন্মোচন করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো তখন সাফওয়ান একদিন তরবারি হাতে নিয়ে হাস্‌সানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় সাবিত ইবন কায়স পাশেই ছিলেন। তিনি দ্রুত সাফওয়ানকে ধরে তাঁর হাত দুইটি গলার সাথে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেন। এ বাঁধা অবস্থায় তাঁকে বনু আল-হারেস ইবনুল খাযরাজের মহল্লায় নিয়ে যান। সেখানে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সাথে দেখা হয়। তিনি বলেন ঃ এ কি? সাবিত বলেন ঃ হাস্‌সানকে সে তরবারি দিয়ে মেরে ফেলুক তাতে কি তুমি খুশী হবে? আল্লাহর কসম! এই সাফওয়ান তো তাঁকে হত্যা করেই ফেলেছিল। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন ঃ তুমি যা করেছো তাকি রাসূল (সা) জেনেছেন? সাবিত বললেন ঃ না। আবদুল্লাহ বললেন ঃ তাহলে তুমি খুব দুঃসাহসের কাজ করেছো। তাকে ছেড়ে দাও। সাবিত তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর সবাই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলেন এবং পুরো ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। রাসূল (সা) তাঁদের মধ্যে একটা আপোষ করে দেন।[১০]

হিজরী নবম সনে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বনু তামীম গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল আসে। বেদুঈন কালচার অনুযায়ী তারা সোজা রাসূলুল্লাহর (ষা) ঘরের দরজায় এসে হাঁক দেয় ঃ 'মুহাম্মদ! বাইরে আসুন।' রাসূল (সা) বাইরে এসে তাদের সাথে আলোচনায় বসেন। এক পর্যায়ে আরবের প্রথা অনুযায়ী তারা তাদের তুখোড় বক্তা 'উতারিদ ইবন হাজিরকে দাঁড় করিয়ে দেয় তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তির কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তুলে ধরার জন্য। 'উতারিদ এক দীর্ঘ ভাষণে তার গোত্রের গৌরব ও কীর্তির কথা বর্ণনা করে। তার ভাষণ শেষ হলে রাসূল (সা) তার জবাব দানের জন্য সাবিত ইবন কায়সকে নির্দেশ দেন। সাবিত অতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। তার ভাষণ শেষে বনু তামীমের প্রতিনিধিদল মন্তব্য করে ঃ আমাদের বাবার শপথ! তাঁর খতীব (বক্তা) আমাদের খতীব অপেক্ষা উত্তম। রাসূল (সা) ও মুসলমানরাও তাঁর ভাষণ শুনে দারুণ খুশী হন।[১১]

এ প্রসঙ্গে ইবন হিশাম বলেন ঃ সাবিত দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ[১২] 'আকাশ ও পৃথিবী যে আল্লাহর সৃষ্টি, সকল প্রশংসা তাঁর। যিনি আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু নির্ধারণ করেছেন। যাঁর কুরসী তাঁর জ্ঞানের সমান প্রশস্ত। তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা ছাড়া কোন কিছুই হতে পারে না। এ তাঁরই কুদরাত যে, তিনি আমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন, তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টিকে রাসূল মনোনীত করেছেন। বংশের দিক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত এবং সত্যবাদী করেছেন। তাঁর নিকট কিতাব নাযিল করে সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ

পরিপূর্ণ করেছেন। সুতরাং তিনি সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম সত্তায় পরিণত হয়েছেন। তিনি মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানান। সে আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাওমের মুহাজিরগণ তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। তাঁরা বংশগতভাবে সর্বাধিক সম্মানিত, চেহারার দিক দিয়ে সর্বাধিক সুদর্শন ও কর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম মানুষ। তাঁদের পরে রাসূলের আহবানে সাড়া দানকারী জনগণ আমরা। আমরা আল্লাহর আনসার এবং তাঁর রাসূলের উযীর। আমরা মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে, সে আমাদের হাত থেকে তাঁর জীবন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আর যে অস্বীকার করবে তার বিরুদ্ধে আমরা চিরকাল জিহাদ করবো। তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ। আমার বক্তব্য এতটুকু। আমি আল্লাহর নিকট আমার নিজের এবং সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য ক্ষমা ও ইসতিগফার কামনা করি। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম।'

এই হিজরী নবম সনেই মুসায়লামা আল-কাজ্জাব বনু হানীফার একদল লোক সংগে করে মদীনায় আসে। খবর পেয়ে রাসূলে কারীম (সা) সাবিত ইবন কায়সকে সংগে করে মুসায়লামার অবস্থান স্থল আল-হারিস ইবন কুরায়েজের গৃহে যান। রাসূলে কারীমের (সা) হাতে ছিল একটি ছড়ি। আলোচনার এক পর্যায়ে মুসায়লামা বললো ঃ আপনি যদি আপনার পরে আমাকে খলীফা বানানোর প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমি আপনার অনুসারী হতে পারি। রাসূল (সা) বললেন ঃ খিলাফাত দূরে থাক, আমি আমার হাতের এই ছড়িটিও তোমাকে দেওয়ার উপযুক্ত মনে করিনে। আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হবেই। আমি তোমার পরিণতি স্বপ্নে দেখেছি। তোমার আর কোন কথা থাকলে এই সাবিত আছে, তাকেই বলো। আমি যাচ্ছি।[১৩]

রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর মদীনার আনসারগণ তাদের নেতা সা'দ ইবন 'উবাদাকে খলীফা নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যে সকীফা বনী সা'য়েদায় সমবেত হয়। এ খবর আবু বকরের (রা) কানে পৌঁছলে তিনি 'উমার (রা) ও অন্যদের সংগে নিয়ে সমাবেশে উপস্থিত হন। সেখানে অনেকের মত সাবিত ইবন কায়সও জনগণকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ 'আম্মা বা'দ! আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী আনসার এবং ইসলামের সৈনিক। আর আপনারা মুহাজিরগণ, একটি ছোট্ট সম্প্রদায়। এরপও কিছু লোক আমাদেরকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এটাই আশ্চর্য বিষয়।' জবাবে আবু বকর (রা) বলেন ঃ তুমি যা বলেছো, তা ঠিক। তবে খলীফা কুরাইশদের মধ্য থেকেই হতে হবে।

আবু বকর (রা) খলীফা হওয়ার পরেই ভণ্ড নবী তুলাইহার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)। আনসার মুজাহিদরা ছিলেন সাবিতের পরিচালনাধীন।[১৪]

হিজরী বারো সনে ভণ্ড নবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালিত

হয়। সাবিত (রা)ও অভিযানে শরীক ছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানদের পরাজয় হয় এবং মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এ সময় আনাস (রা) তাঁকে বলেন ঃ চাচা, যা হয়েছে আপনি দেখলেন তো। সাবিত তখন সুগন্ধি মাখছিলেন। তিনি বললেন ঃ এটা যুদ্ধের কোন পদ্ধতি নয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সময় মানুষ এভাবে যুদ্ধ করতো না। হে আল্লাহ! এই লোকেরা যা করেছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[১৫] তিনি আরও বলেন ঃ এই সকল লোক ও তারা যার পূজারী এবং তারা যা করেছে, সব কিছুর জন্য দুঃখ হয়। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং মুসায়লামার দূর্গের ফটকে দাঁড়ানো এক সৈনিককে হত্যা করেন এবং নিজেও শাহাদাত বরণ করেন।[১৬]

তাঁর দেহের বর্মটি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। একজন মুসলিম সৈনিক সেটি খুলে নেয়। এক রাতে অন্য একজন মুসলিম সৈনিক স্বপ্নে দেখেন যে, সাবিত (রা) তাকে বলছেন, অমুক মুসলমান আমার দেহ থেকে বর্মটি খুলে নিয়েছে। তুমি খালিদকে বল, তিনি যেন তার কাছ থেকে বর্মটি নিয়ে নেন এবং মদীনায় পৌঁছে আবু বকরকে বলেন ঃ সাবিত এত পরিমাণ ঋণী আছে। এই বর্মটি বিক্রী করে তা যেন পরিশোধ করে দেন। আর আমার অমুক দাসটিও যেন মুক্ত করে দেন। খালিদ (রা) সেই লোকটির নিকট থেকে বর্মটি নিয়ে নেন এবং আবু বকর (রা) সাবিতের অসীয়াত মত কাজ করেন। এ ঘটনা সহীহ বুখারীতে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। তবে তাবারানী আনাসের (রা) সনদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[১৭]

সাবিত (রা) বেশ কয়েকজন বংশধর রেখে যান। তাঁর এক মেয়ে ছিল; কিন্তু তার নাম জানা যায় না। ছেলেদের নাম ঃ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, কায়স আবদুল্লাহ, ইসমা'ঈল আবান মুহাম্মাদ, ইয়াহইয়াহ ও আবদুল্লাহ আল-হাররার দিন শাহাদাত বরণ করেন।[১৮] তাঁর এক পৌত্র আদী ইবন আবান কূফার একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন।[১৯]

সাবিতের স্ত্রীর নাম ছিল জামীলা। তিনি ছিলেন মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলের কন্যা।[২০] জীবনের এক পর্যায়ে সাবিতের (রা) সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ইমাম জাহাবী বলেন, সাবিত সেই ব্যক্তি যাঁর স্ত্রী জামীলা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে অভিযোগ করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর সাবিতের সঙ্গে নেই। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দিতে চাও? বললেন ঃ হাঁ। এরপর জামীলা সাবিতের নিকট থেকে খুলা' তালাক নেন।[২১] বর্ণিত হয়েছে, এ সময় জামীলা সন্তান সম্ভাবা ছিলেন। তালাক গ্রহণের কিছু দিন পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সন্তানটি কাপড়ে পেঁচিয়ে পিতা সাবিতের নিকট পাঠানো হয়। সাবিত শিশুটিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেলে তিনি তাহনীক করে মুহাম্মাদ নাম রাখেন। পিতা তার লালন-পালনের জন্য একজন ধাত্রী নিয়োগ করেন।[২২]

সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁর সন্তানরা। যেমন ঃ মুহাম্মদ, কায়স ও ইসমা'ঈল। তাছাড়া আনাস ইবন মালিক, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা প্রমুখ

ব্যক্তিবর্গ। সহীহ গ্রন্থে তাঁর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৩]

ইবন ইসহাক বলেন ঃ সাবিত (রা) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ও বিশুদ্ধভাষী, বাগ্মী পুরুষ।[২৪] মদীনার আনসার সম্প্রদায় তাঁকে তাদের খতীব (বক্তা) নির্বাচন করেন। রাসূলে কারীমও (সা) তাঁকে স্বীয় দরবারের খতীবের মর্যাদা দান করেন।[২৫] ইমাম আল-কুরতুবী বলেন ঃ তিনি ছিলেন আনসারদের খতীব। পরবর্তীকালে 'খতীবু রাসূলিল্লাহ' (রাসূলুল্লাহর খতীব) উপাধি লাভ করেন, যেমন হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) লাভ করেন 'শা'য়িরু রাসূলুল্লাহ' (রাসূলুল্লাহর (সা) কবি) উপাধি।[২৬]

সাবিতের (রা) চরিত্রের সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য হলো রাসূলে পাকের (সা) প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে না-জানি কোন বেয়াদবী হয়ে যায়, সব সময় তিনি এ ভয়ে থাকতেন। ইমাম মুসলিম আনাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যখন সূরা আল-হুজুরাত-এর দ্বিতীয় আয়াত—'মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলোনা। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।' —নাযিল হলো তখন হযরত সাবিত ঘরের দরযা বন্ধ করে বসে থাকলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ আমি একজন জাহান্নামের মানুষ। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যাওয়া আসাও ছেড়ে দিলেন। একদিন রাসূল (সা) সা'দ ইবন মু'য়াজকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু 'আমর! সাবিতের কি হয়েছে? সে কি অসুস্থ? সা'দ বললেন ঃ না, সে ভালো আছে। কোন অসুবিধের কথা তো আমি জানিনে। এরপর সা'দ সাবিতের নিকট এসে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা তাঁকে বললেন। তখন সাবিত বললেন ঃ সূরা আল-হুজুরাতের এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তোমরা তো জান আমি তোমাদের সকলের চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জোরে কথা বলি। আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি। সা'দ তাঁর একথা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালে তিনি বললেন ঃ না, সে জাহান্নামী নয়, সে জান্নাতের অধিকারী।[২৭] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, সাবিত (রা) বলেন ঃ আমি একজন উঁচু কণ্ঠস্বরের মানুষ। আমার ভয় হচ্ছে, আমার সব 'আমল বরবাদ হয়ে গেছে কিনা। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ সাবিত, তুমি তাদের কেউ নও! শুভ ও কল্যাণের সাথে এ পৃথিবীতে তুমি বাঁচবে এবং শুভ ও কল্যাণের উপর মৃত্যু হবে।[২৮]

যখন সূরা আন-নিসার ৩৬তম আয়াতের এই অংশ—'নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে'—নাযিল হলো তখন সাবিত (রা) ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। রাসূল (সা) তাঁকে না দেখে খোঁজে লোক পাঠালেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সুন্দরকে ভালোবাসি। আমি পছন্দ করি আমার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব। আমার ভয় হচ্ছে, আমি এ আয়াতের আওতায় পড়ে গিয়েছি কিনা। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। তোমার পার্থিব জীবন হবে প্রশংসিত। আর তোমার এ জীবনের সমাপ্তি হবে শাহাদাতের মাধ্যমে এবং আখেরাতে তুমি হবে জান্নাতের অধিবাসী।[২৯]

সাবিতের (রা) ছেলে মুহাম্মাদ বলেন ঃ একবার তার পিতা সাবিত রাসূলকে (সা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভয় হয়, আমি ধ্বংস হয়ে না যাই। রাসূল (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ কেন? সাবিত বললেন ঃ আমরা যে কাজ করিনি তার জন্য আমাদের প্রশংসা করা হোক, এমন ইচ্ছা পোষণ করতে আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। অথচ আমার মনে হয়েছে আমি প্রশংসা পছন্দ করি। আল্লাহ আমাদেরকে গর্ব ও অহঙ্কার করতে বারণ করেছেন। অথচ আমি সুন্দরকে ভালোবাসি। আপনার কণ্ঠস্বরের উপর আমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করতে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু আমি একজন উচ্চকণ্ঠের মানুষ। তাঁর কথা শেষ হলে রাসূল (সা) বললেন ঃ সাবিত! তুমি কি প্রশংসিত অবস্থায় জীবন যাপন, শহীদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ এবং আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করা পছন্দ কর না? সাবিত বললেন ঃ হ্যাঁ, করি ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যি, দুনিয়াতে তাঁর জীবনটি হয়েছে প্রশংসিত এবং মুসায়লামা আল-কাজ্জারের সাথে যুদ্ধে তিনি শহীদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[৩০] হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ সাবিত কতই না ভালো মানুষ।[৩১]

রাসূলে কারীম (সা) যে তাঁকে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। একবার সাবিত (রা) অসুখে পড়লে রাসূল (সা) তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁর সুস্থতা কামনা করে দু'আ করেন এই বলে ঃ 'হে মানুষের প্রভু! আপনি সাবিত ইবন কায়সের কষ্ট দূর করে দিন।[৩২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল ইতসী'য়াব ১/১৯২; আল-ইসাবা-১/১৯৫
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯; তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৬৮
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫০৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯
৪. আল-ইসাবা-১/১৯৫; আল-হাকেম-৩/২৩৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯
৫. তাহজীবুত তাহজীব-২/২২
৬. আল ইসাবা-১/১৯৫; আল ইসতী'য়াব-১/১৯৩
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৪২, ২৪৩
৯. আনসাবুল আশরাফ–১/৪৪১; ইবন হিশাম–২/২৯৪, ৬৪৫
১০. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩০৪-৩০৫
১১. তাবারী ৪/১৭১৬; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩১২
১২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৬২
১৩. বুখারী–৫/২১৬
১৪. তাবারী–৪/১৮৮৭
১৫. আল-ইসাবা-১/১৯৫
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩১০; আল-আ'লাম-২/৮২; আল হাকেম-৩/২৩৫; আল-বায়হাকী-৯/৪৪

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–১/৩১১-৩১৩; তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৬৮; আল-ইসতী'য়াব-১/১৯৩
১৮. তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৬৮; আল ইসতী'য়াব ১/১৯২
১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩১৩-৩১৪
২০. তাবাকাত–৫/৫৯
২১. বুখারী : খুলা' তালাক অধ্যায়, হাদীস নং ৫২৭৩, ৫২৭৭; ইবন মাজাহ–২০৫৬; নাসাঈ–৬/১৬৯; আবূ দাউদ–২২২৭; মুসনাদ-৪/৩
২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯, ৩১৩,
২৩. তাহজীবুত তাহজীব–২/১২-১৩
২৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯
২৫. বুখারী–৫/২১৬
২৬. আল-ইসতী'য়াব–১/১৯২
২৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (টীকা)-১/৩১০; তাফসীরে ইবন কাসীর–৪/২০৬-২০৭; বুখারী-৬/১৭১, তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৬৮
২৮. আল-ইসতী'য়াব-১/১৯৭
২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. সিয়ারু আ'লাম-আন-নুবালা-১/৩০৯; আল-হাকেম-৩/২৩৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৩৬৭
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩১২; আল-আ'লাম ২/৮২; তিরমিযী–৩৭৯৭
৩২. তাহজীবুত তাহজীব–২/১২; আল-আলাম-২/৮২।

খুবাইব ইবন 'আদী ইবন 'আমের (রা)

খুবাইব ইবন 'আদী মদীনার আউস খান্দানের সন্তান। একজন আনসারী সাহাবী।[১] হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম মুজাহিদদের জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২] এ যুদ্ধে তিনি মক্কার পৌত্তলিক আল-হারেস ইবন নাওফালকে হত্যা করেন।[৩] ইবন সা'দ বলেন, তিনি উহুদ যুদ্ধেও যোগদান করেন।[৪]

আল-ওয়াকিদী ও বালাজুরীর মতে হিজরী চতুর্থ সনের সফর মাসে 'আর-রাজী'র দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে।[৫] এতে রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। হযরত খুবাইব (রা) সেই মহান শহীদদের অন্যতম। ঘটনাটির যেভাবে সূত্রপাত হয় সে সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো।

ইবন শিহাবের সূত্রে আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে কারীম (সা) দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনীকে গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে পাঠান। তাঁদের আমীর নিয়োগ করেন আসেম ইবন সাবেত আল-আনসারীকে, তাঁরা যখন 'হাদয়া' (উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি) নামক স্থানে পৌঁছেন তখন সেখানে বসবাসরত হুজাইল গোত্রের 'বনু লিহইয়ান' শাখা টের পায়। তাদের প্রায় একশো দক্ষ তীরন্দায ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। এক স্থানে তারা এই বাহিনীর খাওয়া খেজুরের বীচি কুড়িয়ে পেয়ে বুঝতে পারে, এটা ইয়াসরিবের খেজুর এবং যারা এই খেজুর খেয়েছে তারা ইয়াসরিবের অধিবাসী। আসেম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একটি নিরাপদ টিলায় আশ্রয় নেন। বনু লিহইয়ান খুঁজতে খুঁজতে তাঁদের অবস্থান জেনে যায়। তারা চারদিক থেকে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে এবং জীবনের নিরাপত্তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মসমর্পণের আহবান জানায়।

ইবন ইসহাক, আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধের পর 'আদাল ও আল-কারা গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসে। তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গোত্রে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। আপনার কিছু সাহাবীকে আমাদের সংগে পাঠান যাঁরা আমাদেরকে কুরআন পড়াবেন, দ্বীনের তা'লীম ও শরীয়াতের বিধিবিধান শিক্ষা দেবেন। রাসূল (সা) তাদের কথা বিশ্বাস করে ছয়জন সাহাবীকে তাদের সংগে দিলেন। মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে তাঁরা যখন 'উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হুজাইল গোত্রের 'আর-রাজী' নামক জলাশয়ের নিকট পৌঁছেন তখন 'আদাল ও আল-কারা গোত্রের উক্ত লোকগুলি অহেতুক গলা ফাটিয়ে চিৎকার জানায়। ভাবখানা এমন দেখায় যে তারা আক্রান্ত হয়েছে। মূলতঃ তাদেরকে কোন রকম ভয়-ভীতি দেখানো হয়নি। হুজাইল গোত্রের লোকেরা তরবারি হাতে নিয়ে

বেরিয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) এই গুটিকতক অসহায় সাহাবীকে ঘিরে ফেলে। তাঁরাও তরবারি কোষমুক্ত করে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন। শত্রুরা তখন তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলে ঃ 'তোমাদের হত্যার কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের নিকট থেকে শুধু কিছু সুবিধা লুটে নিতে চাই। আল্লাহর নামে আমরা অঙ্গীকার করছি, তোমাদের আমরা হত্যা করবো না।' তখন দলটির তিনজন সদস্য—মারসাদ, খালিদ ইবন বুকাইর ও আসিম ইবন সাবিত (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমরা কোন পৌত্তলিকের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে পারিনে। তারপর তাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং উপরিউক্ত তিনজনই শাহাদাত বরণ করেন।

দলটির অপর তিনজন সদস্য খুবাইব ইবন 'আদী, যায়িদ ইবন আদ-দাসিনা ও আবদুল্লাহ ইবন তারেক (রা) জীবনের প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁরা রণেভঙ্গ দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। কাফিররা আত্মসমর্পণকারীদেরই ধনুকের সূতা খুলে তাঁদের হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেলে। তখন আবদুল্লাহ ইবন তারেক তাদের এ কাজের প্রতিবাদ করে বলেন, 'এটা হলো তোমাদের প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গ। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সংগে যাবনা।' অপর সঙ্গীদের উদ্দেশে বলেন, এই কাফিরদের ব্যাপারে আমার কাছে আদর্শ আছে। শত্রুরা তখন তাঁকে টানাহেঁচড়া করে নিতে থাকে। তিনি তাদের সাথে চলতে অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। এ অবস্থায় তাঁরা যখন মক্কার অদূরে 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে পৌছেন আবদুল্লাহ ইবন তারেক এক সুযোগে হাতের বন্ধন খুলে মুক্ত হয়ে যান এবং সাথে সাথে তরবারি উঁচিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। শত্রুরা তাঁর থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে তীর মেরে তাঁকে হত্যা করে। 'মাররুজ জাহরানে' তাঁর কবর আছে।

খুবাইব ইবন 'আদী ও যায়িদ ইবন আদ-দাসিনাকে নিয়ে তারা মক্কায় পৌছে। হুজাইল গোত্রের দুই ব্যক্তি মককার কুরাইশদের হাতে বন্দী ছিল। তারা এই দুই জনের বিনিময়ে তাদের দুই বন্দীকে মুক্ত করে।[৬] তবে বিভিন্ন বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, বন্দী বিনিময় নয়, বরং অতি উচ্চমূল্যে তারা এই দুই জনকে মক্কার কুরাইশদের নিকট বিক্রয় করে।

খুবাইকে কে বা কারা খরীদ করেছিল সে সম্পর্কে সামান্য মতভেদ আছে। একটি মতে 'উকবা ইবনুল হারেস তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে খরীদ করে। অন্য একটি বর্ণনামতে, আবু ইহাব, 'আকরামা ইবন আবী জাহল, আল-আখনাস ইবন শুরাইক, 'উবাইদা ইবন হাকীম ইবনুল আওকাস, উমাইয়্যা ইবন আবী আসমাহ, বনুল খাদারামী সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা প্রমুখ সম্মিলিতভাবে তাঁকে খরীদ করে বদরে নিহত তাদের প্রত্যেকের পিতার হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য।[৭] ইবন ইসহাক বলেন, হারেস ইবন আমেরের বৈপিত্রীয় ভাই হুজাইর ইবন আবী ইহাব আত-তামীমী খুবাইবকে খরীদ করে 'উকবা ইবন আল-হারেসের হাতে তুলে দেয়। যাতে সে বদরে নিহত পিতৃহত্যার বদলা হিসেবে তাঁকে হত্যা করতে পারে।[৮]

উল্লেখ্য যে, মদীনা থেকে রাসূল (সা) যে দলটি পাঠান তার সদস্য সংখ্যা কত ছিল এবং দলনেতাই বা কে ছিলেন, সে সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন বর্ণনায় দলটির সদস্য সংখ্যা ছয়, সাত ও দশ জনের কথা এসেছে। ইবন হিশাম পূর্বে উল্লেখিত ছয় জনের নাম বর্ণনা করে মারসাদকে দলনেতা (আমীর) বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় আসিম ইবন সাবিতকে দলনেতা বলা হয়েছে।[৯]
খুবাইবকে (রা) হাতকড়া পরিয়ে উকবা ইবন হারেসের গৃহে বন্দী করে রাখা হয়।[১০] 'মাওহাব' নামক এক ব্যক্তিকে পাহারায় বসানো হয়। উকবার স্ত্রী আহারের সময় তাঁর হাতকড়াটি খুলে দিত।[১১] বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে এই মহিলার নাম শাবিয়্যা বলে প্রতীয়মান হয়। কোন কোন বর্ণনায় যাকে হুজাইর ইবন আবী ইহাবের দাসীর বা কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন ইসহাক তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে এই মহিলা মুসলমান হন।
কয়েকমাস তারা খুবাইবকে বন্দী করে রাখে। পবিত্র হারাম মাসগুলি অতিবাহিত হওয়ার পর তারা তাঁকে হত্যার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। খুবাইব তাঁকে হত্যা করা হবে একথা বুঝতে পেরে পাহারায় নিযুক্ত 'মাওহাবের' নিকট তিনটি অনুরোধ করেন ঃ[১২]

১. তাকে মিষ্টি পানি পান করাবে।
২. তাদের দেব-দেবীর নামে জবেহকৃত জীবের গোশত খেতে দেবে না।
৩. হত্যার পূর্বে যেন তাঁকে অবহিত করে।

শেষের অনুরোধটি তিনি 'উকবার স্ত্রীকেও করেন। হত্যার সিদ্ধান্ত হলে সে অবহিত করে।[১৩] তিনি পাক-সাফ হওয়ার জন্য তার নিকট থেকে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন। খুবাইব (রা) যখন ক্ষৌরকার্য্য করছেন তখন, 'উকবার একটি শিশু সন্তান খেলতে খেলতে তাঁর নিকটে চলে যায়। তিনি শিশুটিকে আদর করে কোলে তুলে নেন। খুব শিগগির যাকে শূলী কাষ্ঠে চড়ানো হবে এমন বন্দীর হাতে ধারালো ক্ষুর এবং তার কোলে নিজের সন্তান— এ দৃশ্য দেখে শিশুর মায়ের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে। তার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বন্দী খুবাইব বললেন, তোমার ধারণা, এই শিশুকে হত্যা করে আমি আমার রক্তের বদলা নিব। এমন কাজ কক্ষণও আমি করবো না। এমন চরিত্র আমাদের নয়।[১৪] তারপর তিনি একটু রসিকতা করে বলেন, আল্লাহ এখন আমাকে তোমাদের উপর বিজয়ী করেছেন। শিশুটির মা বললো, তোমার কাছে আমি এমন আশা করিনি। একথার পর খুবাইব ক্ষুরটি মহিলার সামনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও, একটু মশ্‌কারা করলাম।[১৫]
এই মহিলার উপর খুবাইবের (রা) কথা ও কর্মের ভীষণ প্রভাব পড়ে। খুবাইবের হত্যার পর তিনি মুসলমান হন। ইবন ইসহাক খুবাইব (রা) সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি এই খুবাইবের চেয়ে ভালো কোন কয়েদী আর দেখিনি। আমি কয়েদখানার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতাম তাঁর হাতে মানুষের মাথার আকৃতির বড় বড় আঙ্গুর। তিনি সেই আঙ্গুর খাচ্ছেন। এমন আঙ্গুর পৃথিবীর কোথাও খাওয়া হয় তা আমার জানা নেই। মক্কায় তখন আঙ্গুরের বাগানও ছিলনা। তাছাড়া তিনি

তো লোহার হাতকড়া অবস্থায় বন্দী ছিলেন। এ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট থেকে আসা রিযক (খাদ্য)।[১৬]

মক্কার পৌত্তলিক শক্তি খুবাইবের হত্যার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। হারাম শরীফের অদূরে 'তান'ঈম' নামক স্থানে একটি গাছে শূলী কাঠ ঝোলানো হয়। ঢোল-শুহরত করে মক্কার নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সমাবেশ ঘটানো হয়। ব্যাপারটি ছিল তাদের নিকট এক মস্তবড় আনন্দ ও তামাশার। লোকেরা যখন তাঁকে উকবার গৃহ থেকে নেওয়ার জন্য এলো, তিনি তাদেরকে অনুরোধ করলেন, তোমরা একটু সময় দাও, আমি সংক্ষিপ্ত দুই রাকা'য়াত নামায আদায় করে নিই। নামায দীর্ঘ করলে তোমরা বলবে, আমি মরণ ভয়ে দীর্ঘ করছি। সংক্ষিপ্ত দুই রাকা'য়াত নামায শেষ করে তিনি বধ্যভূমির দিকে যাত্রা করেন। তিনি মৃত্যুর দিকে চলছেন, আর তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে ঃ[১৭]

اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

—হে আল্লাহ! তাদের সংখ্যা তুমি গুণে রাখ, এক এক করে তাদেরকে হত্যা কর এবং তাদের কাউকে তুমি ছেড়ে দিও না।

তান'ঈমের সেই গাছের নীচে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর মুখে একটি কবিতার আবৃত্তি শোনা গেল, যার দুইটি শ্লোকের অর্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আমি যদি মুসলমান অবস্থায় নিহত হই তাহলে আমার মৃতদেহ কোন পার্শ্বে পড়ে থাকবে সে ব্যাপারে আমার কোন পরোয়া নেই।

২. এ যা কিছু হচ্ছে, সবই আল্লাহর পবিত্র সত্তার প্রেমের পথে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ড-বিখণ্ড দেহের উপরেও করুণা বর্ষণ করতে পারেন।

এছাড়া তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উচ্চারিত আরও কিছু শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১৮]

শূলী কাঠে ঝোলানোর পূর্বে তিনি এই দু'আও করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূলের বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আপনি আমাদের সংবাদ আপনার রাসূলকে পৌঁছে দিন।'[১৯]

'উকবা ইবন হারেস ও আবু হুরাইরা আল-'আবদারী সম্মিলিতভাবে তাঁকে শূলীতে চড়ায়।[২০] পরবর্তীকালে 'উকবা ইবন হারেস খুবাইবের হত্যায় তার অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করে বলতেন, আমি মূলতঃ খুবাইবকে হত্যা করিনি। কারণ তখন কাউকে হত্যা করার মত বয়স আমার হয়নি। তাই আবু মায়সারা আমার হাতে একটি বল্লম ধরিয়ে দেয়। তারপর বল্লমটিসহ আমার হাতটি ধরে খুবাইবের দেহে বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করে। এই 'উকবা মুসলমান হন এবং দুধপান বিষয়ে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২১]

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, খুবাইবকে শূলীতে ঝুলিয়ে বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল।

মূসা ইবন 'উকবার মাগাযীতে বর্ণিত হয়েছে। খুবাইব ও যায়িদ ইবন আদ-দাসিনাকে একই দিন হত্যা করা হয়। আর যে দিন তাঁদেরকে হত্যা করা হয়, সেই দিন মদীনায় রাসূলকে (সা) বলতে শোনা যায় ঃ 'তোমাদের দুইজনের প্রতি সালাম।' তিনি তাঁদের হত্যার কথাটিও ঘোষণা করেন। ওহীর মাধ্যমে তিনি সবকিছু অবগত হন।[২২]

রাসূলে কারীম (সা) খুবাইব ও যায়িদের লাশ কাফিরদের হাত থেকে কৌশলে উদ্ধারের জন্য মদীনা থেকে কয়েকজন সাহসী ও দক্ষ লোক পাঠান। তাঁরা হলেন, 'আমর ইবন 'উমাইয়্যা, আল-মিকদাদ ও যুবাইর। 'আমর বলেন, আমি খুবাইবের শূলী কাঠের কাছে গিয়ে তাকে মুক্ত করে একটু দূরে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর নেমে এসে বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোন চিহ্ন পেলাম না। যমীন যেন তাকে গিলে ফেলেছে।

পক্ষান্তরে আবু ইউসুফ 'কিতাবুল লাতায়িফ' গ্রন্থে দাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী কারীম (সা) শূলী কাঠ থেকে খুবাইবের লাশটি নামিয়ে আনার জন্য আল-মিকদাদ ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামকে মদীনা থেকে পাঠান। তান'ঈমে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, লাশের আশেপাশে ৪০ জন নেশাগ্রস্ত মানুষ। তারা লাশ পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাঁরা লাশটি নামান এবং যুবাইর ঘোড়ার পিঠে উঠান। এতক্ষণে পাহারাদাররা টের পেয়ে যায় এবং তাঁদের পিছু ধাওয়া করে। যুবাইর লাশটি ফেলে দেন এবং যমীন তা গিলে ফেলে। এ কারণে খুবাইবকে 'বালী'উল আরদি' বলা হয়।[২৩] খুবাইবের কবরটি কোথায় দুনিয়ার মানুষ কোন দিন জানতে পারেনি। মূসা ইবন উকবা বলেছেন ঃ অনেকের ধারণা, 'আমর ইবন উমাইয়্যা তাঁকে কোথাও দাফন করেছেন।

হত্যার পূর্বে পৌত্তলিকরা তাঁর মুখটি কিবলার দিকে ফেরাতে চায়নি। কিন্তু যে মুখ একবার কিবলার দিকে ফিরে যায় তাকে অন্য দিকে ফেরায় কার সাধ্য। পৌত্তলিকরা বার বার মুখটি অন্য দিকে ফেরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।[২৪]

সা'ঈদ ইবন 'আমের আল-জামহী (রা) খুবাইবের হত্যা-অনুষ্ঠানে একজন দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেটা ছিল তাঁর ইসলাম-পূর্ব জীবন। পরবর্তীকালে তিনি মুসলমান হন। খলীফা উমার (রা) তাঁকে হিমসের গভর্ণর নিয়োগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে হিম্সবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করে। তার মধ্যে একটি ছিল এই রকম ঃ সা'ঈদ ইবন 'আমের মাঝে মাঝে এমনভাবে অচেতন হয়ে পড়েন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা হয়। সা'ঈদের নিকট খলীফা 'উমার এর কারণ জানতে চান। সা'ঈদ বলেন ঃ আমি মক্কায় খুবাইব আল-আনসারীর শূলীতে ঝোলানোর দৃশ্য দেখেছিলাম। কুরাইশরা তাঁর দেহ থেকে গোশত কেটে কেটে ফেলেছিল। তারপর তাঁকে গাছে ঝুলিয়ে জানতে চেয়েছিল! তুমি কি এটা পসন্দ করবে যে, তোমার এই স্থানে মুহাম্মদকে আনা হোক? তিনি বলেছিলেন ঃ আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করি এবং তার বিনিময়ে মুহাম্মাদের গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক, আল্লাহর কসম, আমি তা কক্ষণো পসন্দ করিনে।' আমার যখনই সেই দিনটির কথা মনে পড়ে তখন আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে।

আমি কেন সেদিন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাইনি। যদিও আমি সেদিন পৌত্তলিক ছিলাম, তবুও আমার মনে হয় আল্লাহ আমার এ অপরাধ কক্ষণো ক্ষমা করবেন না। আর তখনই আমার এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। একথা বলার পর তিনি মুহাম্মাদ বলে জোরে এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েন।[২৫]

মু'য়াবিয়া (রা) পরবর্তীকালে বলতেন ঃ খুবাইবের হত্যার অনুষ্ঠানে অন্যদের মত আমি আমার পিতা আবু সুফইয়ানের সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুবাইবের বদ-দু'আর ভয়ে আমাকে প্রায় মাটির সাথে ঠেসে ধরে রাখেন। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, কেউ যদি কোন ব্যক্তির উপর বদ-দু'আ করে, আর সে ভয়ে জড়সড় হয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ে তাহলে সে বদদু'আ তার উপর না পড়ে অন্যত্র পড়ে।[২৬] আল-হারেস বলেন ঃ আমি উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহর কসম! আমাদের কেউ বেঁচে থাকবে এমন ধারণা আমার ছিল না।[২৭]

খুবাইবের (রা) দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল। যে সকল নরাধম তাঁর হত্যায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল, এক বছরের মধ্যে তাদের সবাই অতি নির্দয়ভাবে নিহত হয়।[২৮]

ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এ ঘটনার পর মদীনার মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগলো, এই হতভাগ্যরা তাদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যেও থাকলো না, আবার তাদের বন্ধুর (নবী) অর্পিত দায়িত্বও পালন করতে পারলো না। তখন আল্লাহ পাক এই মুনাফিকদের স্বরূপ তুলে ধরে সূরা আল-বাকারার ২০৪-২০৬ নং আয়াত এবং খুবাইব ইবন 'আদী ও তাঁর সঙ্গীদের প্রশংসায় ২০৭ নং আয়াত নাযিল করেন ঃ[২৯]

"আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২০৪)

যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ধ্বংস ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পসন্দ করেন না। (২০৫)

আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২০৬)

আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে— যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জান বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান (২০৭)। (সূরা আল-বাকারা)

আর-রাজী'র এই হৃদয় বিদারক ঘটনা তৎকালীন আরবের মুসলিম কবিদের বোধ ও বিবেককে ভীষণ নাড়া দেয়। কবি হাস্‌সান সহ আরও অনেকে এই সকল শহীদের স্মরণে অনেক মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন। তাতে একদিকে যেমন শহীদদের প্রশংসা করা হয়েছে অন্যদিকে পৌত্তলিকদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। সীরাতে ইবনে

হিশাম পাঠ করলে তার কিছু চিত্র পাওয়া যায়।[৩০]

ইবন ইসহাক আসেম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ খুবাইবই সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য নিহত হওয়ার পূর্বে দুই রাক'য়াত নামায আদায়ের প্রথা চালু করেন। এটা তাঁরই সুন্নাত।[৩১]

ইমাম আস-সুহাইলী বলেছেন ঃ খুবাইব ইবন 'আদীর আদায়কৃত দুই রাকা'য়াত নামাযকে যে তাঁরই প্রবর্তিত সুন্নাত নামায বলা হয়েছে তা এই জন্য যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় আদায় করেছেন এবং রাসূল (সা) কাজটির প্রশংসা করেছেন। তাঁর পূর্বে যায়িদের জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটিও ঘটে রাসূলে কারীমের জীবদ্দশায়। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই রকম ঃ

যায়িদ ইবন হারেসা তায়েফ থেকে এই শর্তে এক ব্যক্তির একটি খচ্চর ভাড়া করেন যে, সে তাঁকে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং তাঁর ইচ্ছামত জায়গায় নামিয়ে দেবে। লোকটি তাঁকে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে একটি বিরান বধ্যভূমিতে নিয়ে পৌছে এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়। যায়িদ তখন তাকে বলেন ঃ আমাকে একটু সময় দিন, আমি দুই রাকা'য়াত নামায আদায় করে নিই। লোকটি বললো, ঠিক আছে, দুই রাকা'য়াত নামায আদায় কর। আর এই যে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা লাশগুলো দেখছো, তারাও তোমার মত নামায পড়েছিল। কিন্তু তাদের নামায কোন কাজে আসেনি। যায়িদ নামায আদায় করলেন। তারপর লোকটি তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে এলো। যায়িদ উচ্চারণ করলেনঃ ইয়া আরহামার রাহেমীন—হে পরম করুণাময়! সাথে সাথে— 'তাকে হত্যা কর না'—এই ধ্বনিটি শোনা গেল। ধ্বনিটি কোথা থেকে এলো তা দেখার জন্য লোকটি এদিক ওদিক তাকালো, কিন্তু কাউকে না পেয়ে আবার ফিরে এলো। যায়িদ আবারও ঃ 'ইয়া আরহামার রাহেমীন' উচ্চারণ করলেন। আবারও ঠিক একই ধ্বনি শোনা গেল এবং লোকটি একই কাজ করলো। এভাবে তিনবার একই ঘটনা ঘটে। তবে তৃতীয়বার যায়িদ একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেলেন, যার হাতে একটি বর্শা এবং মাথায় আগুনের শিখা। সে লোকটির দেহে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়ে হত্যা করলো। তারপর যায়িদের দিকে ফিরে বললো ঃ তুমি প্রথমবার যখন আল্লাহকে ডাক তখন আমি ছিলাম সপ্তম আকাশে, দ্বিতীয়বার ডাকার সময় ছিলাম পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে এবং তৃতীয়বার ডাকার সময় তোমার কাছে এসে হাজির হয়েছি।[৩২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাজরীদু আসমা' আস-সাহাবা-১/১৬৭
২. বুখারী- ২/৫৭৪
৩. বুখারী- ২/৫৬৮; আল-ইসাবা- ১/৪১৮
৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৬
৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৬২
৬. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ মুসনাদে ইমাম আহমাদ- ২/২৯৭, ৩১০; বুখারী-জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৪৫; মাগাযী অধ্যায়- হাদীস নং ৩৯৮৯, ৪০৮৬, ৭৪০২; ইবন হিশাম-

২/১৬৯-১৭১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৬, ২৪৮; **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৬২-**৬৩; ইবন কাসীর ঃ আস্-সীরাহ ০-১/৫৯৮-৬০০.

৭. আল-ইসাবা-১/৪১৯; আল-ইসতী'য়াব-১/৪২৯

৮. আল-ইসতী'য়াব-১/৪২৯, হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৩

৯. ইবন হিশাম-২/১৬৯; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ্-১/৫১৯

১০. বুখারী-৩/৫৮৫

১১. আল-ইসতী'য়াব-১/৪২৯

১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৯

১৩. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৩০

১৪. বুখারী-২/১৮৫;

১৫. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৩০

১৬. ইব হিশাম-২/১৭২; আল-ইসাবা-১/৪১৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৯; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৪, ৩/৬৪৪; বুখারী-২/৫৮৫.

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৭

১৮. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৩১; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ্-১/৬০৩; ইবন হিশাম-২/১৭২; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২২-৫২৫

১৯. ইবন হিশাম-২/১৭৩

২০. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৩১-৪৩২

২১. ইবন কাসী-১/৫৯৯, ৬০২; ইবন হিশাম-২/১৭৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৮

২২. আল-বিদায়া-৪/৬৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৫, ফাতহুল বারী-৭/২৯৫

২৩. ইবন কাসীর-১/৬০৭; আল-বিদায়া-৪/৬৭; আল-ইসাবা-১/৪১৯; আল-ইসতীয়াব-১/৪৩২, হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৬-৫৯৭.

২৪. আল-ইসাবা-১/৪১৯

২৫. ইবন হিশাম-২/১৭২; আল-বিদায়া-৪/৬৭; ইবন কাসীর-১/৬০২; হায়াতুস সাহাবা-২/১৪০, ৩২২.

২৬. হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৫; ইবন কাসীর-১/৬০২; ইবন হিশাম-২/১৭২

২৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৭

২৮. ফাতহুল বারী-৭/২৯৫

২৯. ইবন হিশাম-২/১৭৫

৩০. প্রাগুক্ত-২/১৭৬-১৮৩; আল-বিদায়া-১/৬৮-৬৯

৩১. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৫; ইবন কাসীর-১/৬০২

৩২. ইবন কাসীর-১/৬০২; আল-বিদায়া-৪/৬৫

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. আল-ইমাম আজ-জাহাবী ঃ (ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, (বৈরুত, আল-মুওয়াস্সাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০।)
(খ) তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ, (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাস আল-ইসলামী।)
(গ) তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, (কায়রো, মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হিঃ।)

২. ইবন হাজার ঃ
(ক) তাহজীবুত তাহজীব, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩২৫ হিঃ।)
(খ) তাকরীবুত তাহজীব, (লাখ্নৌ,)
(গ) আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, (বৈরুত, দার আল-ফিক্র, ১৯৭৮)।
(ঘ) লিসানুল মীযান, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩১ হিঃ।)
(ঙ) ফাতহুল বারী, (মিসর, ১৩১৯ হিঃ।)

৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী ঃ শাজারাতুজ জাহাব, (বৈরুত, আল-মাকতাব আত-তিজারী)।

৪. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মুযী ঃ তাহজীব আল-কামাল ফী আসমা আর-রিজাল, (বৈরুত, মুওয়াসসাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮।)

৫. আবু ইউসুফ ঃ কিতাবুল খিরাজ, (বৈরুত, দার আল-মা'রিফা, ১৯৭৯।)

৬. ইবন কাসীর ঃ
(ক) আত-তাফসীর, (মিসর, দারু ইহ্ইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা।)
(খ) আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা।)
(গ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুত, মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ।)

৭. ইবনুল জাওযী ঃ
(ক) আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন, (দিল্লী, আশরাফুল মাতাবি', ১৩১৩ হিঃ।)
(খ) কিতাবুত তানবীহ ওয়াল ইশরাফ, (মিসর, মাতবা'য়াতুল হাসানিয়্যা, ১৩২৩ হিঃ।)
(গ) কিতাবুল আজকিয়া, (সম্পাদনা ঃ আবদুর রহমান ইবন আলী, ১৩০৪ হিঃ।)
(ঘ) সিফাতুস্ সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩৫৭ হিঃ।)।

৮. ইবন সা'দ ঃ আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরুত, দারু সাদির)।

৯. ইবন আসাকির ঃ আত-তারীখ আল-কাবীর, (শাম, মাতবায়াতুশ শাম, ১৩২৯ হিঃ)।

১০. ইয়াকূত আল-হামাবী ঃ মু'জামুল বুলদান, (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী)।

১১. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী ঃ কিতাবুল আগানী, (মিসর, ১৯২৯)।

১২. ইবন হাযাম ঃ জামহারাতু আনসাবুল 'আরাব, (মক্কা, দারুল মা'য়ারফ, ১৯৬২)।

১৩. ইবন খাল্লিকান ঃ ওফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর, মাকতাবাতু আন-নাহদাতুল মিসরিয়্যা, ১৯৪৮।)

১৪. মুহাম্মাদ আল-আলুসী ঃ বুলুগুল আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আরাব, (১৩১৪ হিঃ)।

১৫. ইবনুল আসীর ঃ (ক) উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত, দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী)।

(খ) আল-কামিল ফিত তারীখ, (বৈরুত)।

(গ) তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩১৫)।

১৬. আল-বালাজুরী ঃ

(ক) আনসাবুল আশরাফ, (মিসর, দারুল মা'য়ারিফ)।

(খ) ফুতুহুল বুলদান, (মিসর, মাতবায়াতুল মাওসূয়াত, ১৯০১)।

১৭. আয্-যিরিক্লী ঃ আল-আ'লাম, (বৈরুত, দারুল 'ইল্ম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৯)।

১৮. ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাহ্ (বৈরুত)।

১৯. ইউসুফ আল-কান্ধালূবী ঃ হায়াতুস সাহাবা, (দিমাশ্ক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩)।

২০. সা'ঈদ আনসারী' মাওলানা ঃ সিয়ারে আনসার, (ভারত, ১৯৪৮)

২১. ইবন আবদিল বার ঃ আল-ইসতী'য়াব, ('আল-ইসাবা' গ্রন্থের পার্শ্ব টীকা)।

২২. ইবন সাল্লাম আল-জামহী ঃ তাবাকাত আশ শু'য়ারা, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮০)।

২৩. ইবন কুতায়বা ঃ আশ-শি'রু ওয়াশ শু'য়ারাউ, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)।

২৪. ডঃ আবদুর রহমান আল-বাশা ঃ সুওয়ারুন মিন হায়াতুস সাহাবা, (সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ)।

২৫. খালিদ মুহাম্মদ খালিদ ঃ রিজালুন হাওলার রাসূল, (বৈরুত, দারুল ফিক্র)।

২৬. ডঃ শাওকী দাঈফ ঃ তারীখুল আদাব আরাবী, (কায়রো, দারুল মা'য়ারিফ, ৭ম সংস্করণ)।

২৭. ডঃ 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখুল আদাব আল-আরাবী, (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫)।

২৮. জুরযী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যা, (বৈরুত, দারু মাকতাবাতুল হায়াত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৮)।

২৯. আহমাদ আবদুর রহমান আল বান্না ঃ বুলূগুল আমানী মিন আসরার আল-ফাতহির রাব্বানী, (কায়রো, দারুশ শিহাব)।

৩০. 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী ঃ কানযুল 'উম্মাল, (বৈরুত, মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৫)।

৩১. ডঃ মুস্তাফা আস্-সিবা'ঈ ঃ আস্-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী' আল-ইসলামী, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬)।

৩২. হাজী-খলীফা ঃ কাশফুজ জুনূন 'আন আসামী আল-কুতুব ওয়াল ফুনূন, (বৈরুত, দারুল ফিক্র, ১৯৯০)।

৩৩. মুহাম্মদ আল-খাদারী বেক ঃ তারীখুল উমাম আল-ইসলামিয়া, (মিসর, আল-মাকতাবাতু তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)।
৩৪. মুহাম্মদ আলী আ-সাবুনী ঃ (ক) রাওয়ায়ি 'উল কুরআন, তাফসীরু আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন, (বৈরুত, মুওয়াস্সাসাতু মানাহিলিল 'ইরফান, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮১)।
(খ) আত-তিবইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন, (বৈরুত)।
৩৫. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন-নাওবী ঃ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, (মিসর, আত-তিবায়া' 'আল-মুগীরিয়্যা)।
৩৬. ইমাম আহমাদ ঃ আল-মুসনাদ
৩৭. R.A. Nicholson : A Literary History of the Arabs, (Cambridge, University Press, 1969.)
৩৮. পবিত্র কোরআনুল করীম ঃ অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।
৩৯. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ।
৪০. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)।
৪১. কুদামাহ ইবন জা'ফর ঃ নাকদুশ শি'র (বৈরুত)।
৪২. ইবন রাশীক ঃ কিতাবুল 'উমদাহ, (কায়রো- ১৯৩৪)।
৪৩. আবু তাম্মাম ঃ আল-হামাসা, (বৈরুত)।
৪৪. আল-বাকিল্লানী ঃ ই'জাযুল কুরআন, (বৈরুত-১৯৯১)।
৪৫. আল-জুরজানী ঃ দালায়িলুল ই'জায, (কায়রো-১৯৭৬)।
৪৬. বুটরুস আল-বুসতানী ঃ উদাবাউল আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সাদরিল ইসলাম (বৈরুত-১৯৮৯)।
৪৭. 'আবদুর রউফ দানাপুরী ঃ আসাহ আস-সীরাহ (করাচী)।